বিরোধ তাঁহাদের মনে মনে যতই ঘটুক, বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না ত কিছু ।

প্রথম খিটিমিটি বাধিতে আরম্ভ হইল মমতার শিক্ষাদীক্ষা লইয়া । সুরেশ্বর চান মেয়ে ঠিক বড়মানুষের মেয়ের উপযুক্ত ভাবে পালিত হয়, যামিনী বেশী বড়মানুষী ফলাইবার মোটেই পক্ষপাতী নহেন । সুরেশ্বর খুঁজিয়া-পাতিয়া চওড়া লাল পাড়োকি শাড়ী পরা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা একটি মাদ্রাজী আয়া জোগাড় করিয়া আনিলেন । তাহার নাকে, কানে, গলায় বেশ মোটা মোটা সোনার গহনা, পায়ে মল । মাহিনা গেল চল্লিশ টাকা ।

দুই-তিন দিন পরে সুরেশ্বরের চোখে পড়িল যে মমতা আয়ার কোলে না বেড়াইয়া, এক [illegible] থান-পরা বাঙালী ঝিয়ের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছে । তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, সেই আয়া কোথায় গেল ?"

যামিনী বসিয়া খুকির একটা ফ্রকে রেশমের কাজ করিতেছিলেন । স্বামীর দিকে চাহিয়া বেশ শান্তভাবেই বলিলেন, "তাকে জবাব দিয়েছি ।"

সুরেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন ? জবাব দেবার আগে আমাকে কি একবার জানানও যেত না ।"

যামিনী বলিলেন, "ঝি-চাকর রাখা না-রাখার কোনওদিনই ত তুমি ব্যবস্থা কর না, আমাকেই করতে হয়, কাজেই তোমাকে জানাতে যাই নি ।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "বেশ, কিন্তু তার অপরাধটা কি তাও কি আমার শুনতে নেই ?"

যামিনী ফ্রকটা একদিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। তাঁহারও মেজাজে একটু বিরক্তির সঞ্চার হইতেছে বোঝা গেল। বলিলেন, "বাঙালীর মেয়ে প্রথমে বাংলা ভাষা না শিখে ভুল হিন্দী আর ইংরিজী শিখুক, এটা আমি চাই না। তা ছাড়া আয়ার কথাবার্ত্তা ভাল না, বড় বেশী গালাগালি করে। চুরুট খায়, আমি নিজের চোখে দেখেছি। খুকি গোড়ার থেকে এই সব [illegible] আমি চাই না।"

সুরেশ্বর স্ত্রীকে একটু খোঁচা [illegible] বলিলেন, "নিজেও ত মানুষ হয়েছ খোট্টানি আয়ার হাতে। তারা চুরুট না খাক, হুঁকোয় ক'রে তামাক খায়। তোমার বেলা যা চল্‌ল, এর বেলা তা চলবে না কেন?"

যামিনী বলিলেন, "আমার শিক্ষাদীক্ষায় যেগুলি ত্রুটি হয়েছে, আমার মেয়ের বেলাতেও সেগুলি ঘট্‌তে হবে, এমন কিছু আইন আছে নাকি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোমার মা-বাবার চেয়ে, আমার চেয়ে তুমিই বেশী বোঝ, এটা মনে করবার কারণ?"

যামিনীর মুখখানা অত্যন্তই গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বেশী বোঝা কম বোঝার কোনও প্রশ্ন উঠছে না। আমার মেয়েকে আমি নিজে যে-রকম ভাল মনে করি, সেই ভাবে মানুষ করব। মা বাবা যা ভাল মনে করেছেন, তাঁরাও তাই-ই করেছেন।"

সুরেশ্বর কথাটা শেষ হইতে দিতে চান না। বলিলেন, "তাঁদের শিক্ষার ফল ভাল হয় নি, এই তবে তুমি বলতে চাও?"

যামিনী বলিলেন, "এ-বিষয়ে এত মাথা ঘামাবার কি [illegible] দরকার তা ত আমি বুঝতে পারছি না। খুকির ভালমন্দ কি সত্যিই আমি তোমার চেয়ে কম বুঝি? তা'হলে ত আমার উপর কোনও ভার না থাকাই উচিত।"

এতদূর অগ্রসর হইতে অবশ্য সুরেশ্বর রাজী নন। যামিনী বিশেষ কর্ম্মিষ্ঠা নহেন, কিন্তু সুরেশ্বর একেবারেই অকর্ম্মণ্য। কোনও-কিছুর ভার লইতে হইবে এ কথা মনে করিতেই তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের বিবাহ এখনও খুব বেশীদিন হয় নাই, যামিনীর সৌন্দর্য্যের ও স্বভাবের মাধুর্য্যের নেশাও এখন পর্য্যন্ত একেবারে ছুটিয়া যায় নাই। তাঁহাকে পাকাপাকি রকম চটাইয়া দিতে সুরেশ্বরের মন উঠিল না। তবু স্ত্রীর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময়, শেষ বাণ নিক্ষেপের মত কয়েকটা কথা না বলিয়া যাইতে তাঁহার পৌরুষে আঘাত লাগিল। বলিলেন, "তবে ওসব ফ্রক, জুতো মোজাটোজা খুলে নিয়ে, কোমরে একটা ঘুন্‌সী বেঁধে ছেড়ে দাও। ফিডিং বোতলটা আছড়ে ভেঙে ফেল, ঝিনুকে ক'রে দুধ খাওয়াও। দিশী শিক্ষা দিতে চাও ত পূরো দিশী শিক্ষাই দাও।"

যামিনী বলিলেন, "ফিরিঙ্গী বানাতে চাই না ব'লে আমি ধাঙড়ও বানাতে চাই না। সভ্যতা বা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে দিশী শিক্ষার কিছু বিরোধ নেই।"

খুকি চার বৎসরের যখন, তখন তাহার ভাই সুজিত জন্মগ্রহণ করিল। সুরেশ্বর বলিলেন, "খুকিকে এবার লোরেটোতে দিয়ে দিই না? তোমারও একটু রিলিফ্ হবে।"

যামিনী তাহাতেও সম্মতি দিলেন না। বলিলেন, "মেয়ে এখনও অ, আ, পড়তে শিখল না, এরই মধ্যে ওকে ইংরিজী বুকনি, আর গালাগালি শিখতে যেতে হবে না। আগে ঘরে বাংলাটা শিখুক।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "নিজে যে যেমন, সেই রকমটাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ

বোধ হয় ব'লে জানতাম। তুমি দেখি সকল দিকেই উল্টো। নিজে ত ছিলে পুরো ফিরিঙ্গী, মমতার বেলা এত গোঁড়ামী কেন?"

যামিনী বলিলেন, "ফিরিঙ্গী শিক্ষা পেয়েছিলাম ব'লেই সেটা যে কতখানি ভুয়ো তা বুঝতে পেরেছি। তোমরা সেটা পাও নি, কাজেই তার মোহে এখনও মুগ্ধ হয়ে আছ।"

সুরেশ্বর এবং যামিনীর স্বভাবের এক জায়গায় মাত্র একটা মিল ছিল। দু-জনেরই ইচ্ছা-শক্তি কিঞ্চিৎ দুর্বল। নিজের ইচ্ছা গায়ের জোরে ফলাইয়া তুলিবার মত জোর তাঁহারা সব সময় মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। বিশেষ সুরেশ্বর। তর্ক করিতেন, স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতেন, তাহার পর বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া সে-সব কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার তাসপাশা খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সিনেমা যাওয়া, প্রভৃতিতে প্রায় সব সময় চলিয়া যাইত। ঘর-সংসারের ব্যবস্থা করিবার সময় কোথায়? তিনি যদি সব করিবেন, তাহা হইলে লোকজন এবং স্ত্রী আছেন কি করিতে? অতএব সমালোচনা করিবার কাজটুকু মাত্র করিয়া তিনি সরিয়া পড়িতেন। যামিনীর এ-সব বিরোধ-বিসংবাদ ভাল লাগিত না বটে, তবু মনে ক্রমেই যেন তাঁহার দৃঢ়তার সঞ্চার হইতেছিল। মমতাকে ভাল ভাবে মানুষ করিবার সঙ্কল্পটা তাঁহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছিল। তিনি জীবনে যদিও কোনওদিন ঝগড়া করেন নাই, ইহার জন্য দরকার হইলে তাহা করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং মমতা লোরেটোতে ভর্তি না হইয়া ঘরেই এক বাঙালী শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। মায়ের কাছে বাজনা শিখিতে লাগিল, ছবি আঁকা শিখিতে লাগিল।

সুজিত যখন চার বৎসরের হইল, তখন তাহাকেও ইংরেজী স্কুলে

দিবার জন্ত সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিজে তাঁহাকে অনেক কষ্ট করিয়া ইংরেজী আদবকায়দা শিখিতে হইয়াছে, অনেক জায়গায় ঠকিয়াছেন, অনেক জায়গায় অপ্রস্তুত হইয়াছেন। এখনও মাঝে মাঝে ঠেকিয়া যাইতে হয়। খোকার যাহাতে এ-বিষয়ে গোড়াপত্তনটা ভাল করিয়া হয়, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। বড়মানুষ জমিদারের ছেলে, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা ত দিতে হইবে। সুতরাং এ-বিষয়ে বেশ লড়িবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াই তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু যামিনী মোটেই এক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না দেখিয়া সুরেশ্বর রীতিমত অবাক্ হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এর বেলা বুঝি তোমার কিছুই বক্তব্য নেই? ছেলের [illegible] কি মেয়ের শিক্ষার চেয়ে কম দরকারী ব'লে তোমার ধারণা?"

যামিনী বলিলেন, "সব মানুষেরই [illegible]কার, কিন্তু ছেলেকে তুমি যেমন বোঝ তাই শিক্ষা দাও। [illegible]জীবন যে কেমন হবে, তা আমি অনেকটাই অনুমানে বুঝি, তাকে সেই জীবনের জন্যে প্রস্তুত করতেও চেষ্টা করি। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা তত পরিষ্কার ক'রে আমি দেখতে পাই না, তোমার পক্ষেই সেটা বেশী পারা সম্ভব। তুমিও বুঝে দেখ, তাকে কি ভাবে মানুষ করা দরকার।"

অত ভাবিতে আবার সুরেশ্বর নারাজ। ভাবিবার ক্ষমতাও তাঁহার খুব বেশী আছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রী একটা কিছু ব্যবস্থা করিলে তাহার খুঁৎ বাহির করা খুবই সহজ, তাহার ঠিক উল্টাটা বলিলেই হইল। কিন্তু নিজে ব্যবস্থা করা ভারি হাঙ্গামের ব্যাপার, কত ভাবনাই যে ভাবিতে হয় তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু স্ত্রীর কাছে হার মানাই

যা চলে কি করিয়া? কাজেই সুরেশ্বর উঠিয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পরেই খোকা সুজিত ইংরেজী স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল।

মমতা স্কুলে যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত, বাড়ীতে পড়ার ধাক্কায় কোনও সময়েই সে ছুটি পাইত না। পড়াশুনা ত আছেই, তাহার উপর দেশী এবং বিলাতী বাজনা শেখা, সেলাই ও শিল্পকাজ শেখা, এমন কি একটু একটু করিয়া গৃহকর্ম্ম শেখা, এও সে ইহারই মধ্যে আরম্ভ করিয়াছে। যামিনী নিজে যখন যাহা-কিছুর জন্য ঠেকিয়াছেন, কন্যাকে সে-সব কিছুর জন্য ঠেকিতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাড়ীর লোকে হাসাহাসি করে, সেটা বুঝিয়াও তিনি নিজের সঙ্কল্প ছাড়েন না। সুজিতের পড়াশুনার বিশেষ বালাই নাই। রোজ বাড়ী ফিরিয়া নিত্যনূতন বিলাতী উচ্ছ্বাস এবং গালাগালি শুনাইয়া সে মাকে বিরক্ত এবং বাপকে চমৎকৃত করিয়া তোলে। তাহার আজ নূতন পোষাক চাই, কাল ব্যাগ চাই, পরশু টুপি চাই। চাঁদা চাওয়ার অন্ত নাই। পোষাক পরিচ্ছদ জুতা-মোজার ঘটায় সে বাপকেও হার মানাইতে বসিয়াছে। যামিনী মনে মনে জ্বলিয়া যান, কিন্তু মুখে স্বামীকে কিছুই বলেন না।

২

মমতা স্কুলে প্রথম যখন ভর্ত্তি হইল তখন তাহার প্রায় তেরো বৎসর বয়স। এই প্রথম এক রকম তাহার বাহিরের সংসারের সহিত পরিচয়। তাহারা থাকে এমন জায়গায় যেখানে বাঙালী-পাড়া নাই, কাজেই সারাক্ষণ প্রতিবেশিনী-সমাগম হয় না। নিজের বয়সের মেয়েদের এ-পর্য্যন্ত সে দূর হইতে চোখে দেখিয়াছে মাত্র, আলাপ-পরিচয়ের সুবিধাটা পায় নাই। উৎসব, নিমন্ত্রণাদিতে মায়ের আঁচল ধরিয়া গিয়াছে, তেমনই ভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার রকম দেখিয়া যামিনীর নিজের কৈশোরকাল মনে পড়িয়া যাইত। তিনিও সর্ব্বত্র এই রকম মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মা জ্ঞানদা ইহাই অবশ্য পছন্দ করিতেন। মেয়েকে পুতুলের মত সুন্দরভাবে, সাজাইয়া-গুজাইয়া লইয়া বেড়াইতে এবং সকলের মুখে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। কিন্তু মেয়ে স্বাধীন মানুষের মত চলাফেরা করিবে, যাহার সঙ্গে খুশী কথা বলিবে, ইহা ভাবিলেই তাঁহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া যাইত। নিজে ছিলেন তিনি অতিমাত্রায় প্রভুত্বপরায়ণ, তাই নিজের ধারে কাছে স্বাধীন মতের আঁচ সহ্য করিতে পারিতেন না।

যামিনীর স্বভাবে প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাটা একেবারেই ছিল না।

বাল্যে ও প্রথম যৌবনে অনেক ঘা খাইয়া এই জিনিষটির প্রতি তাঁহার একটা মারাত্মক রকম ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। মেয়ে যেন কাহারও হাতের খেলার পুতুল না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কামনা। সে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ুক, দুঃখ ভোগ করুক, কোনও কিছুতেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতাটুকু যেন না হারায়, নিজের ভাবনা নিজে ভাবিতে পারে, নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইতে পারে। তাই মেয়ের এই আঁচলধরা ভাব দেখিলেই তিনি তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তবে বাহিরে যাওয়া তাঁহাদের এতই কালেভদ্রে ঘটিত যে মমতার এই স্বভাবটা সংশোধিত হইবার কোনই সুযোগ পায় নাই।

স্কুলে যখন যামিনী তাহাকে প্রথম রাখিয়া চলিয়া আসিলেন, মমতা ত তখন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। ক্লাসের মেয়েরা এত বড় মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া বেশ খানিকটা কৌতুক অনুভব করিল, কিন্তু একেবারে প্রথম দিন বলিয়া কেহ আর তাহার পিছনে লাগিল না। বরং নানারকম গল্পগাছা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। টিফিনের সময় প্রকাণ্ড বড় চাতালটায় যেন মেয়ের মেলা বসিয়া গেল। চেঁচামেচি, গল্প, খেলা, খাবার কিনিয়া খাওয়া, সে এক মহা ফুর্তির ব্যাপার। মমতা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। মোটা মোটা গোল গোল থামগুলির সামনে পিছনে লুকাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়ের দল মহা হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিয়াছে। মমতাকেও ক্লাসের মেয়েরা খেলিতে ডাকিল, কিন্তু সে লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিল না।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া যাইতেই সুরেশ্বর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, স্কুল কেমন লাগল ?"

মমতা সংক্ষেপে বলিল, "ভাল না।"

সুরেশ্বর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল লাগল না কেন?"

মমতা বলিল, "বাড়ী ছেড়ে সারাদিন বাইরে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

সুরেশ্বর যেন মহা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনছ গো, তুমি ত ভাল শিক্ষা দেবার জন্যে মেয়েকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখলে, এখন এই বয়সেও স্কুলে গিয়ে তার মন টিঁকছে না। আরও বছর পাঁচ-ছয় পরে পাঠালে পারতে।"

যামিনী বিদ্রূপটা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "তা পাঠাতে পারলে সত্যিই ভাল হ'ত। স্কুলে সুশিক্ষা যত হোক-না-হোক, পাঁচ রকম পরিবারের পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশে কুশিক্ষা তার চেয়ে বেশী হয়। তবে কুণো হওয়ার দোষ ঢের, সেটা কাটানোর জন্যেই স্কুলে যাওয়া দরকার।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "সুজিতকে দেখ দেখি। একদিনও স্কুলে যেতে তার আপত্তি দেখেছ?"

যামিনী বলিলেন, "না, স্কুলে যেতে তার আপত্তি দেখি নি বটে, তবে পড়াশুনা করাতে তার মারাত্মক আপত্তি। সেখানে যত লক্ষ্মীছাড়া ফিরিঙ্গী ছেলের সঙ্গে মিশে হুড়োহুড়ি করতে পায়, সেখানে যেতে আপত্তি হবে কেন?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "ফিরিঙ্গী, ফিরিঙ্গী ক'রেই তুমি গেলে। ওদের ওপর তোমার এত ঝাল কেন বল দেখি? ওরা কি তোমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে? নিজেও ত আগাগোড়া ফিরিঙ্গী-শিক্ষাই পেয়েছ।"

যামিনী বলিলেন, "কেন যে অত বিতৃষ্ণা সে বলতে গেলে ঢের কথা বলতে হয়। অত বলবারও আমার সময় নেই, শুনবারও তোমার সময় নেই। তবে খোকার শিক্ষা ভাল হচ্ছে না, এটা তুমি জেনে রেখো।"

"সে ত জেনে রেখেছি। আমি যখন ব্যবস্থাটা করেছি, তখন তার ফল ভাল হবে কোথা থেকে?" বলিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলেন। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তা বেশীর ভাগ এই রকমই চলিত। একটা কিছু বিষয়ে তর্ক করিয়া কথা সুরু হইত, এবং তর্কের মীমাংসা হইবার আগেই হয় যামিনী না-হয় সুরেশ্বর অসহিষ্ণু ভাবে সরিয়া পড়িতেন। সেটা অবশ্য এক দিক্ দিয়া ভালই হইত। দু-জনের মতামত ছিল একেবারে উল্টারকম, কাজেই তর্ক বেশীক্ষণ ধরিয়া চালাইলে লাভের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যাইত। মাঝপথে সব কথা থামিয়া থাকায় রীতিমত ঝগড়াটা খুব কমই হইত।

যাহা হউক, মমতা ইহার পর রীতিমত স্কুলে যাইতে সুরু করিল। পড়াশুনায় সে ভালই ছিল, শেলাই, আঁকা, গানবাজনা, সবই সে বাড়ীতে অনেকখানি শিখিয়াছে, স্কুলে কিছুর জন্য তাহাকে ঠেকিতে হইল না। বরং শীঘ্রই ভাল মেয়ে বলিয়া তাহার নাম রটিয়া গেল। অতএব মমতারও ইহার পর স্কুল ভাল লাগিতে আরম্ভ করিল। তবে সারাটা দিনই মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইত বলিয়া এখনও মধ্যে মধ্যে তাহার মন কেমন করিত।

সুরেশ্বর মেয়েদের খুব বেশী পড়াশুনা পছন্দ করিতেন না। নিজে যদিও শিক্ষিতা মেয়েই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা সত্য সত্যই শিক্ষার প্রতি কোনও আকর্ষণ বশতঃ নয়। যামিনীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে

অতিশয় অভিভূত করিয়াছিল, ইহাই সে বিবাহের প্রধান কারণ। অন্য একটা কারণ, শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাক্ বা নাই থাক্, চালচলনে, বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, খুব কায়দা-দুরস্ত এবং আধুনিক হওয়ার দিকে তাঁহার একটা প্রগাঢ় রকম ঝোঁক ছিল। স্ত্রীও চাহিয়াছিলেন তিনি সেই রকম। তাঁহাদের বাড়ীতে তিনি যে-সব বধূ আসিতে দেখিয়াছেন, তাহারা আসিয়াছে লাল বেনারসী শাড়ীর পুঁটলির মত, আগাগোড়া অবশ্য হীরামুক্তাখচিত। তাহাদের মুখ কাহাকেও দেখাইতে হইলে একজন মানুষকে ঘোমটা খুলিয়া দিতে হইত, আর একজনকে মুখ তুলিয়া ধরিয়া, এবং ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরাইয়া দর্শককে দেখাইয়া দিতে হইত। পাছে বধূর মানবত্ব চোখের দৃষ্টিতেও ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে চোখও বন্ধ রাখিত। ঠিক যেন মানুষকে পুতুল সাজাইয়া রাখা। এই সব বধূর মত একটি বধূ নিজের ঘর আলো করিতে আসিবে মনে করিলেই সুরেশ্বর চটিয়া যাইতেন। তাঁহার পুতুল খেলায় কোনও উৎসাহ ছিল না, বরং ঘরসাজানোতে উৎসাহ ছিল। যামিনীকে দেখিয়া ঘরে বাহিরে সকলে যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, তখন গর্ব্বে সুরেশ্বরের বুক দশ হাত হইল। এই ত চাই!

কিন্তু স্ত্রী ত শুধু গৃহসজ্জার উপকরণ নহেন, তিনি সজীব সজ্ঞান মানুষ। এইখানেই বাধিল গোলমাল। আগেকার কালের স্ত্রীগুলির ব্যবহারে আর যারই অভাব থাক, বাধ্যতার অভাব ছিল না। তাহাদের সাধ্য ছিল না স্বামীর কোনও কথার একটা প্রতিবাদ করিবার। ডাহিনে চলিতে বলিলে ডাহিনে চলিত, বাঁয়ে চলিতে বলিলে বাঁয়ে চলিত। কিন্তু এই আধুনিক মেয়েগুলি কথা ত শুনিতে চায়ই না, তদুপরি প্রমাণ করিতে বসিয়া যায়, যে, এই রকম কথা বলিবারই স্বামীদের কোনও

অধিকার নাই। এতটা সহ্য করিতে সুরেশ্বর একান্তই নারাজ ছিলেন। বাহিরের দিকে যতই আধুনিকতা ফলান, মনের ভিতরটা তাঁহার এই স্থানে একেবারে খাঁটি সনাতনপন্থী ছিল। যতই লেখাপড়া শিখুক, স্ত্রীলোক সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে হীন, ইহা তিনি ভুলিতে পারিতেন না। যামিনী উগ্ররকম আধুনিক ছিলেন না, তাই বিবাহ হইবা মাত্রই বিরোধ বাধিয়া যায় নাই। প্রথম বৎসর দুই-তিন তিনি সত্যই সুরেশ্বরের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে পাথরে গড়া প্রতিমা বলিয়াই ভ্রম হইত। রাগ বা অনুরাগ, কিছুরই লীলা তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না। নিজের ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেই তিনি যেন বাঁচিয়া যাইতেন।

কিন্তু মমতার মা হইয়াই যামিনী বদ্‌লাইয়া গেলেন। স্বামীর সঙ্গে ছোট-বড় নানা বিষয়েই তাঁহার বিরোধ বাধিতে লাগিল এবং সুরেশ্বরের দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি ও অসহিষ্ণুতা প্রত্যেকবারেই তাঁহার পরাজয় ঘটাইতে লাগিল। সুরেশ্বরের ইচ্ছা ছিল, খানিকটা পোষাকী শিক্ষা দিয়াই তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়া দিবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্ত্রীর বিরুদ্ধতা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। যামিনী বলিলেন, "ঐটুকু মেয়ের বিয়ে আমি কিছুতেই দিতে দেব না। সংসারের কি বোঝে ও, বিয়েরই বা কি বোঝে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তবে কবে বিয়ে দিতে হবে? চল্লিশ বছর বয়সে?"

যামিনী বলিলেন, "চল্লিশ আর বারোর ভিতর আরও অনেকগুলি বছর আছে, তার যে-কোনও একটাতে দিলেই হবে।" স্বামীর ভয়েই এক রকম তিনি মেয়েকে তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। মমতার সম্বন্ধ নিয়ম মত আসিতে লাগিল এবং ভাঙিতে লাগিল, সে এদিকে একটার পর একটা করিয়া ক্লাস ডিঙাইয়া ম্যাট্রিক্যুলেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখন আর স্কুল তাহার খারাপ লাগে না, বরং অনেকগুলি বন্ধু জোটাইতে পারায় বেশ ভালই লাগে। বাড়ীতে ত কথা বলিবারই মানুষ নাই। মা এমন চুপচাপ মানুষ যে তাঁহার সঙ্গে দুইটার বেশী তিনটা কথা বলিতে পারা যায় না। সুজিত নিজের মহিমায় এমন বিভোর যে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গেলে বিরক্তিই আসে। বাড়ীতে আরও আত্মীয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অবশ্য গল্প করিতে সদাই প্রস্তুত, তবে যামিনী মেয়েকে তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে দেন না। কবে কাহার বিবাহ হইয়াছে, কত অল্প বয়সে কে সন্তানবতী হইয়াছেন, কাহার শাশুড়ী ননদ কেমন, কে কত রূপবতী এবং স্বামীসোহাগিনী ছিলেন, এ-সব গল্প মমতার খুব বেশী শোনা তিনি পছন্দ করেন না।

তাহার চেয়ে স্কুলে থাকা ভাল। মমতা দেখিতে ভাল, পড়ায় ভাল, বড় মানুষের মেয়ে, তবু তাহার অহঙ্কার নাই, এই সব কারণে সে সকলেরই খুব প্রিয়। ক্লাসে আরও একটি বড়মানুষের মেয়ে আছে, তাহার নাম অলকা। পড়াশুনার দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও নজর নাই, তবে গানবাজনায় ভাল। সাজসজ্জা করিতে তাহার বোধ হয় সারা সকালটাই কাটিয়া যায়। স্কুলে আসে এমন বেশে, ঠিক যেন বিবাহ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে। মাথার ফিতা হইতে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত তাহার এক রঙের এবং মানানসই হওয়া চাই, না হইলে জগৎ তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। হাতে, গলায়, কানে, চুলে তাহার দশ রকম গহনা, তাও দুই দিন অন্তর বদল হয়। মুখে পাউডার স্নোর

চাকচিক্য, পরিচ্ছদে এসেন্সের গন্ধ। বই পড়ুক বা নাই পড়ুক, সেগুলির যত্ন খুব। বই রাখিবার ব্যাগ, পেন্সিল রাখিবার চামড়ার কেস, ঘটা কত রকম। টিফিনের সময় অন্য মেয়েরা যখন খাইতে এবং খেলা করিতে ব্যস্ত থাকে, অলকা তখন বোর্ডিঙের কাপড় পরিবার ঘরে ঢুকিয়া আবার চুল ঠিক করে, মুখে পাউডার দেয়, শাড়ী ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঠিক করে। অন্য মেয়েরা প্রায়ই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে অলকার ভাল লাগে না। মমতা খুব বড়লোকের মেয়ে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু মমতার চালচলনে যথোপযুক্ত আভিজাত্যের অভাব দেখিয়া সে আবার পিছাইয়া গিয়াছে। অলকা বেচারী জাত বাঁচাইবার জন্য একলাই ঘোরে, মমতার এদিকে বন্ধুর ভীড়ে কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিবারই অবসর হয় না।

ছায়া বলিয়া একটি মেয়ে নূতন আসিয়াছে। সে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। ইহার আগে সেও নাকি ঘরেই পড়িয়াছে। পড়াশুনায় বেশ ভাল। প্রথম দিনই মমতার তাহাকে বড় ভাল লাগিয়া গেল, হয়ত তাহার করুণ মুখখানি দেখিয়াই। নিজের প্রথম স্কুলে আসার দিনটা মনে পড়িয়া গেল বোধ হয়। এমনিতে সে বড় অগ্রসর হইয়া কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে সে যাচিয়া গিয়া ভাব করিল, সমস্ত দিন তাহার পাশে বসিয়া রহিল, টিফিনের সময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইল। ছায়ার বাড়ী এখানে নয়, সে দূরসম্পর্কের এক মাসীর বাড়ী আসিয়া উঠিয়াছে। সেখানে যদি থাকিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে।

সেকেণ্ড ক্লাস হইতে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিতে-না-উঠিতেই মমতার

বয়স পনেরো ছাড়াইয়া ষোলয় গিয়া পড়িল। সুরেশ্বর একেবারে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এবার কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়। সম্বন্ধ আসার ঘটা মাঝে কমিয়া গিয়াছিল। আবার ঘটক-ঘটকীর ভীড় লাগিল, নিত্যনূতন বরের খবর শোনা যাইতে লাগিল। যামিনী গম্ভীর মুখে খালি শুনিতে লাগিলেন, ঝগড়া করিবারও চেষ্টা করিলেন না। সুরেশ্বর তাহাতে আরও চটিতে লাগিলেন, একটু ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি হইলে তবু নিজের উৎসাহটাকে জিয়াইয়া রাখা যায়। এমনিতে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হয়।

মমতা একদিন স্কুল হইতে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে? কাঁদছিস্ কেন?"

মমতা বলিল, "কি তোমরা সব আমার নামে যা-তা রটাচ্ছ? ও রকম করলে আমি বোর্ডিঙে চ'লে যাব, একেবারে বাড়ী আসব না।"

যামিনী কিছু বলিবার আগেই সুরেশ্বর ঘরে ঢুকিয়া মমতার পাশে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এ্ কি, কান্নাকাটি কেন? তুমি ওকে বকেছ বুঝি গো?"

যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। স্কুলে কার কাছে কি শুনে এসে কাঁদতে বসেছে!"

সুরেশ্বর কথাটা কি না-শুনিয়াই চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এরকম হওয়া ত ঠিক নয়, আমি চিঠি দেব। ছেলেমানুষ মেয়েকে যা-তা বলবে কেন?"

মমতা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "না বাবা, তোমায় চিঠি দিতে হবে না। আমাকে কেউ ত গালাগালি দেয় নি?

কে একটা ছাই গুজব রটিয়েছে, তাই সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা করছিল।"

ব্যাপারটা কি তাহা এতক্ষণে সুরেশ্বর বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "ছাই গুজব কেন? হিন্দুসমাজের মেয়েদের বিয়ে ত এই সময়েই হয়? তাতে অত চট্‌ছিস্ কেন বুড়ী?"

মমতা রাগের চোটে খাট ছাড়িয়া উঠিয়াই পড়িল। বলিল, "ছাই না ত কি? একেবারে পচা। আমায় পড়াশুনো করতে হবে না বুঝি? আমি কক্ষনো ও সব শুনব না। আমি পরীক্ষা দেব, কলেজে পড়ব।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখ, যে কালের যা ছাঁদ তা যাবে কোথায়! এত ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী ক'রে তুমি লাফাও, মেয়ের ত সেই ফিরিঙ্গী-আদর্শই পছন্দ দেখি। তোমার স্বদেশী শিক্ষায় লাভ হ'ল কি?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ লাভ হয়েছে। যাও ত মা তুমি এখান থেকে।" নিজেদের ভিতরের মতভেদটা ছেলেমেয়ের চোখের উপর তুলিয়া ধরিতে তিনি একান্তই আনিচ্ছুক ছিলেন। মমতার যদিও অনেক কথা আরও বাবা-মাকে শুনাইবার ছিল, তবু মায়ের কথার অবাধ্য না হইয়া সে বাহির হইয়াই গেল।

যামিনী তখন বলিলেন, "লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটা আদর্শ হিসেবে খারাপ কিসে হল শুনি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "আমাদের ঘরে অত কলেজে পড়ার রেওয়াজ নেই বাপু। মেয়েদের আসল শিক্ষা ঘরের শিক্ষা।"

যামিনী বলিলেন, "সেটা ত শুনছি জন্মাবধি, কিন্তু বাড়ীতে শিক্ষার ব্যবস্থা কই? কোথাও ত দেখলাম না। বাড়ীতে ব'সে ব'সে খুব শিক্ষালাভ ক'রে উঠেছে এমন একটা মেয়ের নাম কর ত তুমি?"

সুরেশ্বর কথা ঘুরাইয়া বলিলেন, "মেয়ে কি পাশ ক'রে উকীল হবে নাকি? ঘর-সংসারই যারা করবে তারা ঘর-সংসারের কাজ শিখুক।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার মত বদলাতে পারে খুব শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর। এই তুমি ওকে লোরেটোতে দেবার জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলে। ঘর-সংসারের সব কাজই সে শিখেছে, তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু লেখাপড়াটাও ঠিক তার সমান প্রয়োজনীয়।"

"যত সব আঁজগুবি কথা। মেয়েছেলেকেও এর পর পি-এইচ-ডি হ'তে হবে।" বলিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনটা তাঁহার দমিয়া গেল। এতকাল খালি স্ত্রীই বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, এখন যদি আবার মেয়েও সঙ্গে সুর ধরে, তাহা হইলে আর কিছু করিবার থাকে না। তাঁহার বাড়ীর মানুষগুলিও তেমনই, কেহ যদি একবার উঁকি মারিয়া দেখে। দলে ভারি হইলে মানুষের কত জোর বাড়ে। এদিকে কিন্তু মমতার পড়াশুনা আগের মতই চলিতে লাগিল। বিবাহের সম্বন্ধ আসাটা অবশ্য একেবারেই থামিয়া গেল না।

৩

যামিনীর বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার মায়ের মৃত্যুর মাসখানেক পরে। [স]ুবে ধুমধাম বা আমোদ-আহ্লাদ যে তাহাতে হয় নাই, তাহা বলাই [ব]াহুল্য। সুরেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে বিবাহ করায় তাঁহার পরিবারেরও [ক]েহ খুশী হয় নাই, কেহ যোগও দেয় নাই বিবাহে। সুতরাং বৌভাতও [ক]রা হয় নাই। ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনও তেমন [কি]ছু ঘটা করিয়া করা [হ]য় নাই, কারণ যামিনীর উৎসব-কোলাহল ভাল লা[গি]ত না, একলা [অ]পটু হাতে বড় কাজ গুছাইয়া করাও শক্ত। সুরেশ্বরের ছোটভাই শশির মায়ের মন রাখিয়া ঘোরতর সনাতন হিন্দু পরিবারের মেয়ে বিবাহ [ক]রিয়াছিল। তাহারা পারতপক্ষে তাঁহার বাড়ীর ছায়া মাড়াইত না। [স]ুতরাং এ বাড়ীতে বড় উৎসব এতদিন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। [ম]মতা এবং সুজিতের জন্মদিনে আত্মীয়-স্বজন এবং ছেলেমেয়ের বন্ধু-বান্ধব [দ]ুই-চারিজন আসিত, এই পর্য্যন্ত।

পাস করার পর এবার কিন্তু মমতা মাকে জোর [ক]রিয়া ধরিয়াছে, [ত]াহার সকল বন্ধুবান্ধবকে খুব ঘটা করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যামিনীও [র]াজীই হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার যেন খানিকটা উৎসাহই বোধ [হ]ইতেছে। সুরেশ্বর উৎসবের কারণটাকে মোটেই আমল দিতেছেন

না—মেয়ে পরীক্ষায় পাস করিয়াছে, তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন ; তবে আমোদ-আহ্লাদ, লোকজন আসা, তাঁহার খুব ভালই লাগে, কাজে ব্যাপারটাতে তিনি বাধা দেন নাই। সুজিত খুব সকরুণ অবজ্ঞা ভরে ব্যাপারটাকে দূর হইতে দেখিতেছে।

মমতার সঙ্গে যাহারা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাদের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে। স্কুলের অন্য যে-সব মেয়ের সঙ্গে তাহার ভাব আছে তাহাদেরও সে বাদ দেয় নাই। শিক্ষয়িত্রীরাও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আত্মীয়-বন্ধু যে যেখানে আছেন, সুরেশ্বর ও যামিনী মিলিয়া সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছেন।

খাওয়া হইবে রাত্রিতে, কারণ গুমোট গরমের দিন, দুপুরবেলা এত খাটুনি খাটা বাড়ীর লোকের অসাধ্য। ছাতের উপর লাল শামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে, অবশ্য বৃষ্টির ভয়ে তাহার উপর তেরপল চাপাইতে হওয়ায় শামিয়ানার সৌন্দর্য্য বেশ খানিকটা কমিয়া গিয়াছে। দেবদারু পাতা, ফুল, রঙীন লণ্ঠন দিয়া সমস্ত ছাত সাজানো হইয়াছে। মমতা মায়ের সাহায্যে সারা ছাত জুড়িয়া আলপনা দিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে রঙীন কাঁচের এবং জয়পুরী মীনার কাজ-করা ফুলদানীতে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম। ধূপের সুগন্ধে স্থানটি আমোদিত। নীচে বসিবার ঘরটিও গোলাপ ফুল ও নানা রকম ফার্ণ দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজানো। মমতা উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, পাছে বৃষ্টি আসিয়া তাহার এত সাধের আয়োজন সব মাটি করিয়া দেয়। খাওয়াইবার জায়গার অবশ্য অভাব হইবে না, এত বড় বাড়ীতে ঘর আছে অনেক। কিন্তু ছাদটি সাজাইতে তাহাকে ও তাহার মাকে পরিশ্রম অল্প করিতে হয় নাই, সেটা একেবারে ব্যর্থ হইলে মমতা বেচারীর মনে অত্যন্তই লাগিবে।

সমস্ত কাণ্ডটাই মমতার মনের মত করিয়া যামিনী করিতেছেন। মেয়ের আনন্দের উপর কোনও ছায়াপাত যাহাতে না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মমতাকে তিনি মায়ের পক্ষেও যেন একটু অতিরিক্ত রকম ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের ব্যর্থ কৈশোর ও প্রেম যৌবনে যত সাধ, যত আকাঙ্ক্ষা এই কন্যাটির জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক, এই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা। সুজিত দিদিকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়া এমন কড়া বকুনি খাইয়াছে যে রাগ করিয়া সে নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। অবশ্য শেষ অবধি সেখানে থাকিতে সে পারিবে না, একবার লোকজন আসিতে আরম্ভ হইলে হয়। সুজিত বোধ হয় মানুষের মুখ আর গল্পগাছা যতখানি ভালবাসে, এত আর জগতে কোনও জিনিষ ভালবাসে না। সুতরাং অতিথি-অভ্যাগতের দল দেখা দিতে আরম্ভ করিবামাত্রই যে সে বাহির হইয়া আসিবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কাজকর্ম্ম সারিয়া মমতা এখন মায়ের ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সাজসজ্জা করিতেছে। পরীক্ষায় পাস করার জন্য মা তাহাকে নূতন সোনালী রঙের বেনারসী শাড়ী ও জামা কিনিয়া দিয়াছেন, বাবা দিয়াছেন এক জোড়া হীরার দুল। মেয়ে পরীক্ষার পাস করায় তাঁহার কোনও আনন্দ হয় নাই, অন্ততঃ মুখে তিনি তাহাই বলিতেছেন। কিন্তু মমতার আনন্দটা অত্যন্ত সংক্রামক জিনিষ, তাহা সারা বাড়ী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া সুরেশ্বরও আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মেয়ে হয়ত তাঁহার চেয়ে মাকে ভালবাসে বেশী, এই একটা ধারণা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে ঈর্ষ্যান্বিত করিয়া তুলিত। তাই যামিনীর উপহারের পাঁচগুণ দামী

একটা উপহার মেয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজের মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মমতার নিজের গহনাগাঁটি খুব বেশী ছিল না। সুরেশ্বর থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড রকমের হিসাবী হইয়া উঠিতেন। মমতার গহনা গড়াইয়া টাকা নষ্ট করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। বিবাহের সময় ত গহনা দিতেই হইবে, তখন বরপক্ষ কি রকম কি আবদার ধরিবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। শুধু শুধু এখন আর তাহা হইলে কেন টাকা খরচ করা? সুতরাং মমতার জন্য গহনা গড়ানো হইল না। যামিনীর এ-সব দিকে ঝোঁক বেশী ছিল না, তিনিও ইহা লইয়া বিশেষ তর্কাতর্কি করিলেন না। মেয়ে ত সারাদিন স্কুলেই কাটায়, তাহার অত গহনা-পরিবার অবসর কোথায়?

কিন্তু আজ মমতার ক্ষীণ তনুলতাটিকে বেষ্টিত করিয়া হীরকের দ্যুতি জ্বলিতেছে। যামিনীর বিবাহের পর সুরেশ্বর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া তাঁহাকে এক প্রস্থ হীরার অলঙ্কার কিনিয়া দেন। উহা বেশীর ভাগ সময় ব্যাঙ্কেই পড়িয়া থাকিত, যামিনী বধূজীবনের প্রথম বৎসর উহা বার-দুই অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার পর আর পরেন নাই। আজ সবগুলি আনাইয়া মনের মত করিয়া মেয়েকে সাজাইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার নিজের স্বর্গগতা জননীর কথা মনে পড়িতেছে। যামিনীকে সাজাইবার কি আগ্রহই না তাঁহার ছিল! পুতুলখেলার মত তিনি যামিনীকে লইয়া খেলিতেন যেন। তাঁহার সাধ তিনি অনেকটাই মিটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই খেলার ফলভোগ করিতে রাখিয়া গিয়াছেন হতভাগিনী কন্যাকে। যামিনীর বাহিরের ঐশ্বর্য্যের অভাব যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য জ্ঞানদা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ

করিয়াছেন। কন্যার অন্তরের দারুণ রিক্ততা দেখিবার জন্য আছেন শুধু ভগবান্। নিজের মেয়ের অলক্ষ্যে যামিনী একবার মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

যামিনীর দিকে চাহিয়া মমতা একবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, তোমার কি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?"

যামিনী তাড়াতাড়ি মেয়ের মুখটা নিজের দিক্ হইতে ফিরাইয়া দিয়া তাহার খোঁপায় সোনার ফুল পরাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কই, না ত? যা গরম, তাই মুখ শুক্‌নো দেখাচ্ছে বোধ হয়।"

মমতা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, এত যে সাজিয়ে দিলে, ওরা আমায় অহঙ্কেরে মনে করবে না ত?"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "না মা, তা কেন ভাববে? আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপারের মানুষ ত সাজেই। পরিবেষণ করবার সময় খুলে ফেলো এখন, তাহলেই হবে।"

সাজিতে অবশ্য মমতার খুবই ভাল লাগিতেছিল। আর কোনও কারণে না হউক, অলকাটাকে খানিক তাক লাগাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার দিন রাত রাজা-উজীর মারা শুনিতে শুনিতে মমতার ত দুই কান পচিয়া গিয়াছে। অন্য লোকের ঘরেও যে টাকা আছে তাহা সে একবার দেখুক, এবং টাকা থাকিলেই যে অমন অভদ্রের মত জাঁক করিতে নাই, তাহাও একটু সে শিখুক। অলকা এই প্রথম মমতাদের বাড়ী আসিতেছে।

যামিনী কি কাজে বাহির হইয়া গেলেন। মমতা খানিক ক্ষণ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল। যেখানে যা ত্রুটি ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিল,

তাহার পর পাখা এবং বাতি বন্ধ করিয়া দিয়া বাবার ঘরের দিকে চলিল।

সুরেশ্বর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িয়া ঘুমাইয়াছেন। যত গরম বাড়ে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তাঁহার দিবানিদ্রার পরিমাণ। রাত্রির ঘুমের সময়ও ততই পিছাইতে থাকে। যামিনীর রাত জাগা সহ্য হয় না, [illegible] মেয়েকে লইয়া সকাল-সকাল অন্য ঘরে ঘুমাইয়া পড়েন। সুরেশ্বরের শুইতে আসিতে প্রায়ই সাড়ে বারোটা কি একটা বাজিয়া যায়।

তিনি খাটে উঠিয়া বসিয়া নিজের খাস ভৃত্যটিকে হাঁকডাক করিতেছিলেন। চাকরবাকর আজ সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত, এক ডাকে কাহারও সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। বেশ চটিয়া একটা গর্জ্জন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় মেয়েকে সামনে দেখিয়া সুরেশ্বর থামিয়া গেলেন। মমতার কাছে ধরা-পড়ার লজ্জাটা কেন জানি না তাঁহার অত্যন্ত বেশী ছিল। স্ত্রীর নীরব অবজ্ঞা বা সরব নিন্দা, কোনও কিছুকে তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না, ও-সব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। সুজিতকে ত তিনি মানুষের ভিতরই এখনও গণ্য করিতেন না। কেবল মমতার মতামতকে কথায় না হউক কাজে তিনি যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। নিজের স্বভাবচরিত্রের যেগুলি বড় বড় ত্রুটি ছিল, তাহা যাহাতে কন্যার চোখে ধরা না পড়ে, সেদিকে তাঁহার যথেষ্ট সাবধানতা ছিল। মমতাকে লইয়া সকল দিক্ দিয়াই তাহার পিতামাতার ভিতর একটা রেষারেষির ভাব ছিল।

মমতা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "দেখ বাবা, নূতন দুলটা পরেছি।"

সুরেশ্বর নিদ্রাবিহ্বল দুই চোখ ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন, "বাঃ, বেশ খাসা দেখাচ্ছে। একটা ছবি তুলে রাখ।"

মমতা বলিল, "কি যে তুমি বল বাবা, তার ঠিক নেই। সন্ধ্যেবেলা কখনও ছবি তোলা যায়? তুমি কিন্তু এখনও উঠলেও না, কাপড়ও ছাড়লে না, লোকজন এসে পড়লে অপ্রস্তুতে পড়বে।"

"এই যে, যাই মা," বলিয়া সুরেশ্বর খাট ছাড়িয়া সোজা স্নানের ঘরে চলিয়া গেলেন। মমতা ফিরিয়া মায়ের ঘরে চলিল। সুজিতের রুদ্ধ দুয়ার খানিকটা ফাঁক হইয়াছে দেখিয়া আপন মনে একটু হাসিয়া গেল।

মায়ের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, তিনি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছেন। মমতা পিছন হইতে গিয়া দুই হাতে তাঁহার চুলের রাশ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি সুন্দর এখনও তোমার চুল মা। আমার কেন এমন হল না?"

যামিনী একটু হাসিয়া মেয়ের হাত হইতে চুলের গোছা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমারও ত বেশ চুল মা? আরও বাড়বে এখন।"

"হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেলাম, আবার নাকি বাড়ে?" বলিয়া মমতা একখানা চামড়ার গদী-আঁটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। পাশে আর একটি চৌকির উপর যামিনী সন্ধ্যায় পরিবার কাপড়-জামা বাহির করিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "বাবা, দুই আলমারি ভর্ত্তি তোমার কাপড়, একটাও তবু পরবে না। সেদিন মামীমা ত ঠিক কথা বলেছিলেন?"

যামিনী চুলের বিনুনী শেষ করিতে করিতে বলিলেন, "কি আবার ঠিক কথা বললেন তোমার মামীমা?"

"ঐ যে সেদিন বল্লেন, তোমার বুঝি মনে নেই? নিশ্চয় মনে আছে! ঐ যে এর আগের রবিবারে।"

কথাটা এমন বিষম কিছুই নয়। যামিনীর ছোট ভাই মিহিরের

স্ত্রী একদিন বলিয়াছিল, "মাগো মা, কাপড়ের যেন দোকান! সব ক'খানাই ত নূতন দেখছি। দিদি একদিনও বুঝি একখানা পাট ভেঙে পর না? মেয়ে বিয়েতে তোমায় আর কাপড়চোপড় কিনতে হবে না।" এই কথাটাই মমতা কিছুতেই মায়ের সামনে বলিয়া উঠিতে পারিল না।

যামিনীর কথাটা মনে পড়িল। একটু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষের ব্যাপারে আমি বেশী সাজগোজ করলে ভাল দেখাবে? তাছাড়া আমায় ত সারাক্ষণ উপর, নীচ, ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে ছুটোছুটি করতে হবে? তুমি এবার নীচে যাও, লোকজন আসবার সময় হ'ল। ড্রয়িংরুমের পাশের ঘরে আমি অনেকগুলি গোলাপ আর শ্বেতপদ্ম জলে ভিজিয়ে রেখেছি। নিত্যকে বল গিয়ে, যে দুটো বর্মার কাঠের ট্রে আছে, তাতে গুছিয়ে তুলতে, তোমার বন্ধুদের গোলাপ দিও হাতে হাতে। বড়দের পদ্ম দিও। আমি একবার রান্নাঘর তদারক ক'রে আসি।"

মমতা পাকা বুড়ীর মত বলিল, "তুমি যেয়ো না মা আগুনের আঁচে, তোমার মাথা ধ'রে যাবে। মামীমা ত আছেন সেখানে, বিন্দু-পিসীমাও আছেন।"

যামিনী তবু রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মমতা ফুল গুছাইবার জন্য নিত্য-ঝিকে ডাকিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল। ফুল-ভরা ট্রে দুটি পাশে রাখিয়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে সজোরে হর্ণ দিয়া একখানা গাড়ী তাহাদের গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। মমতা অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই রে, অলকা মুটকিই সবার আগে হাজির।"

অলকা একলা আসে নাই, অনুগ্রহ করিয়া ছায়াকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সে না আনিলে ছায়ার হয়ত আসাই হইত না, কারণ

এখানে সে থাকে পরের বাড়ীতে, কে তাহাকে গরজ করিয়া এতদূর পৌঁছাইয়া দিতে আসিবে? সুতরাং মনে মনে অলকার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ না হইয়াও মমতা থাকিতে পারিল না।

অলকা গাড়ী হইতে নামিয়াই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, কি চমৎকার মানিয়েছে ভাই তোকে! ঠিক যেন ইন্দ্রাণী। এত থাকে, তবু কেন ভূত সেজে স্কুলে যাস্ বল্ ত।"

তাহার পিছন পিছন নামিল ছায়া। নিতান্ত সাদাসিধা পোষাক, ছিটের জামা আর কালাপেড়ে একখানি পুরাতন দেশী শাড়ী। গহনার ছিটাফোঁটাও গায়ে নাই। হাতে খালি বাঁধানো দু-গাছি শাঁখা। মমতা আর অলকার মধ্যে পড়িয়া তাহাকে যেন একান্তই ম্লান আর হতশ্রী দেখাইতেছে। তবু তাহার মুখের হাসিটি মমতার চোখে বড়ই মিষ্টি লাগিল।

অলকার কথার উত্তরে মমতা বলিল, "আহা, কি কথাই বল্‌লে। এমনি ক'রে গেলে আমায় কেউ স্কুলে ঢুকতে দেবে?"

অলকা বলিল, "ঠিক এমনি ক'রেই কি আর? তবে যেরকম যাও, তার চেয়ে কি আর একটু ভাল কাপড়, কি গহনা দুখানা বেশী পরা যায় না?"

ছায়ার সামনে এত কাপড়-গহনার গল্প করিতে মমতার লজ্জাই করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "তোমরা দাঁড়াও না ভাই এখানে, আমার একলা একলা এত লোককে রিসীভ্ করতে কেমন যেন লজ্জা করে।"

অলকা তৎক্ষণাৎ রাজী। মমতা তাহার হাতে একটি আধফোটা লাল গোলাপ গুঁজিয়া দিতেই সে চট্ করিয়া তাহা নিজের ব্রোচে গাঁথিয়া

লইয়া বলিল, "বেশ ত। আমাকে একটা ট্রে দে, আর একটা তুই ে
ভাই। ছায়া কি করবে? ঘরে গিয়ে বস্‌বে?" অলকার ইচ্ছা নয়।
তাহাদের উজ্জল সজ্জায় সত্যই ছায়াপাত করিয়া ছায়া তাহাদের পাে
দাঁড়াইয়া থাকে। মমতা কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিল, "ওমা, ও এক
গিয়ে ঘরে ব'সে থাকবে কেন? ও দাঁড়াক আমাদেরই সঙ্গে, লোকজ
অনেক এসে গেলে তার পর ঘরে গিয়ে বসবে।"

ইহার পর একটি একটি করিয়া ক্রমাগত মানুষ আসিতে লাগিল
সুরেশ্বরও স্নান সারিয়া সুসজ্জিত হইয়া মেয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন
ভদ্রলোকদের তিনি অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, বসাইতে লাগিলেন
ভদ্রমহিলাদের অন্দরমহলে যামিনীর কাছে চালান করিয়া দেওয়া হইতে
লাগিল। মমতার বন্ধুর দল তাহাকে ছাড়িয়া নড়িতে রাজী হইল ন
তাহারই চারধারে রূপ ও রঙের তরঙ্গের মত দোল খাইতে লাগিল
সুজিতের দলের মানুষ খুব বেশী আসে নাই, তবু সেও কিছু পরে যথাসা
সাজিয়া-গুজিয়া নামিয়া আসিল। দিদির বন্ধুদের সামনে দাঁড়াই
থাকিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সেখান ছাড়িয়া নড়িতেও তাহা
মন উঠিল না।

এদিকে খাওয়ার জায়গা করা হইয়া গিয়াছে। ঈশানকোণে মেে
কালিমা দেখা দিয়াছে, ঝড় হইলেও হইতে পারে। তাই যামি
তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিতে চান।

ছাদ জুড়িয়াই খাওয়ার জায়গা, তবে মাঝে লেসের পরদা দি
মেয়েদের আর ছেলেদের দিক্ দুইটিকে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে
ইহা সুরেশ্বরদের বাড়ীর নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।

মমতা ছুটিয়া গিয়া বেনারসী ছাড়িয়া একখানি ঢাকাই শাড়ী পরিয়

আসিল, হীরার গহনাগুলিও খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গিনীরা তাহাকে টানাটানি করিতে লাগিল নিজেদের সঙ্গে বসাইবার জন্য। মমতার কিন্তু ভারি ইচ্ছা, সে পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইবে। যামিনীও সেই মত প্রকাশ করায় সে মহা উৎসাহ সহকারে ঝক্‌ঝকে পিতলের বাল্‌তি লইয়া পোলাও দিতে আরম্ভ করিল। যামিনী ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূ প্রভা মেয়েদের দিকের খাওয়া তদারক করিতে লাগিলেন। ছেলেদের দিকে সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, কাজটা অন্য পাঁচজনে করিয়া দিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার চুকিতে বেশ খানিক রাত হইয়া গেল। শেষ অভ্যাগতটিকে বিদায় করিয়া যামিনী যখন নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। মমতা ইহারই মধ্যে কখন আসিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখে তাহার স্পষ্ট ক্লান্তির চিহ্ন, এলোখোঁপা ধ্বসিয়া কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যে-ঢাকাই শাড়ীখানা পরিয়া পরিবেশন করিয়াছিল সেখানাও ছাড়ে নাই, গহনাগাঁটিও সব খোলে নাই। আলুথালু ভাব যামিনী মোটেই দেখিতে পারিতেন না, একবার ভাবিলেন মমতাকে তুলিয়া দিবেন, যাহাতে সে কাপড় বদ্‌লাইয়া চুল বিনুনী করিয়া তবে আবার শোয়। কিন্তু মেয়ের ক্লান্তি যথেষ্ট হইয়াছে, আর তাহার ঘুম ভাঙাইয়া কাজ নাই, মনে করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আর তাহাকে জাগাইলেন না। মশারিটা ফেলিয়া, বাতি নিবাইয়া দিয়া, নিজের কাপড় ছাড়িবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

দরজার কাছ হইতে বিন্দু-ঠাকুরঝি ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ত কিছুই খেলে না বড়বৌ? তোমার জন্যে দই-মিষ্টি এনে দেব কি?"

যামিনী বলিলেন, "এত রাতে আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে

না, ঠাকুরঝি। তোমরা খাও গে, আমাকে নিত্যর হাতে এক গেলাস ঘোলের সরবৎ পাঠিয়ে দিও।" বিন্দু-ঠাকুরঝি চলিয়া গেলেন।

রাত বেশ অনেকখানি হইয়াছে, তবু অসহ্য গুমোট্ গরম। যামিনী জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, মেঘ কাটিয়া গিয়া মুক্ত আকাশে তারা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইলেন; মানুষের জীবনাকাশের মেঘ কোনওদিনই বুঝি কাটে না। তবু ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা দেখা যায় বই কি? এই যে ছেলেমেয়ে দুটি ভগবান্ তাঁহার কোলে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহারা না আসিলে তিনি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এতদিন বাঁচিয়া থাকিতেন? মমতাকে ভাল করিয়া মানুষ যদি করিতে পারেন, তাহার নারীত্বকে সকল দিক্ দিয়া সার্থক হইতে যদি চোখে দেখিয়া যান, তাহা হইলে যামিনী সুখে মরিতে পারিবেন না কি? হৃদয়ের যে নিদারুণ ব্যথা আজও তিনি ভাল করিয়া ভুলিতে পারেন নাই, তাহা তখন ভুলিবেন কি? সুজিতকে মানুষ করিবার ভার ত তিনি পাইলেন না, হয়ত মানুষ সে হইবেও না। যা তাহার বংশের ধারা, সেই মতেই সে চলিবে বোধ হয়। সন্তানের দুর্গতি দেখার যে বেদনা, তাহার জন্যও তাঁহাকে এখন হইতে প্রস্তুতই থাকিতে হইবে।

নিত্য আসিয়া শ্বেত পাথরের গেলাসে ঘোলের সরবৎ রাখিয়া গেল। যামিনী পাশের ঘরে গিয়া এত রাত্রে আর একবার গা ধুইয়া আসিলেন। কাপড়-জামা সব বদলাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর সরবৎটুকু পান করিয়া একটু যেন সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ এই ঘরে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। লোহার সিন্ধুকটা ঠিক বন্ধ আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার

পর বাহির হইয়া সুজিতের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। চাকরকে হাজার বার বলা সত্ত্বেও সে এ-ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দেয় নাই, দেখা গেল। জানালার ভিতর তিনটিই বন্ধ। সুজিত এবং তাহার বাবার ধারণা, বন্ধ ঘরে পূর্ণ বেগে পাখা চালাইলে তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না, তবে ঝড়-ঝাপ্টার দিনে সব দরজা-জানালা বন্ধ না করিয়া দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। যামিনী বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন।

আর রাত করা চলে না, শ্রান্তিতে তাঁহার শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। একবার স্বামীর শয়নকক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। সুরেশ্বর হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নয় এখনও উপরে আসেন নাই। কোন্‌টা ঠিক তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া যামিনী ফিরিয়া গিয়া মমতার পাশে শুইয়া পড়িলেন। এত যে শ্রান্তি, তবু ঘুম সহজে আসিতে চায় না। মনের উপর বেদনার পাষাণ-ভার দিনরাত যেন চাপিয়া বসিয়া আছে, ঘুমকেও সে ঠেকাইয়া রাখে।

ভোরবেলা অভ্যাসবশে ঘুম তাঁহার একবার ভাঙিল, কিন্তু শরীরের জড়তা তখনও এত বেশী যে, তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া যামিনী উঠিতে পারিলেন না। আবার পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন। অন্য দিন এই সময় হইতেই বাড়ীর চাকর-বাকরের সাড়া পাওয়া যায়, আজ সারা বাড়ী নিঝুম। ঝি-চাকরেরা বোধ হয় তিন প্রহর রাত্রি পার হইয়া যাইবার মুখে শুইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত কেহ আর চোখ মেলে নাই।

কিন্তু যামিনীর ঘুম আর ভাল করিয়া আসিল না। পূর্ব্বাকাশে আলোকচ্ছটা প্রথম দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। আলো দেখিলে আর তিনি শুইয়া থাকিতে পারেন

না, আজও উঠিয়া পড়িলেন। অন্য দিন নিত্য-ঝি আসিয়া তাঁহার মুখ ধুইবার সরঞ্জাম গুছাইয়া দেয়, চুল খুলিয়া দেয়, তাঁহার কাপড়-জামা সব লইয়া গিয়া স্নানের ঘরে ঠিক করিয়া রাখে। যামিনীর এ-সব ভাল লাগে না, কিন্তু জমিদারের গৃহিণী তিনি, সুরেশ্বরের এই সব বনিয়াদী চাল অত্যন্ত ভাল লাগে, ক্রমেই বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে। কাজেই বাধ্য হইয়া যামিনী এ-সব সহ্য করেন, খানিকটা উৎপাত সহ্য করার ভাবে। তবে সুবিধা পাইলেই নিত্যকে তিনি অন্য কোনও কাজে লাগাইয়া দিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। আজ সে নিজেই আসিয়া পৌঁছায় নাই দেখিয়া খুশী হইয়া যামিনী স্নানের ঘরে চলিয়া গেলেন। মমতা প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে, আজ কিন্তু সে এখনও গভীর ঘুমে অচেতন।

যামিনী স্নান সারিয়া চুল আঁচড়াইতেছেন, এমন সময় নিত্য পড়ি-কি মরি গোছের ভাবে ছুটিতে ছুটিতে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যামিনীর স্নানটা তাহার বিনা সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে একবার জিব বাহির করিয়া গালে হাত দিল, তবে যামিনীকে কিছু বলিতে ভরসা পাইল না। যামিনী চুলের জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "খুকীকে তুলে দে গিয়ে নিত্য, রোদ উঠে পড়ল ব'লে।"

নিত্য একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চুলের গোছাটা ভাল ক'রে মুছিয়ে দিয়ে যাব মা? বড় জল গড়াচ্ছে।"

যামিনী বলিলেন, "দরকার নেই, ও এখুনি ঝ'রে যাবে। তোকে যা বলছি তাই কর্।" নিত্য অগত্যা চলিয়া গেল।

উপর তলায় পাঁচ-ছয়খানি বড় বড় ঘর। সামনের দিকে গাড়ী-বারান্দার ছাদ, ভিতরের দিকেও একটি চতুষ্কোণ বারান্দা। নীচে প্রকাণ্ড

ডাইনিং-রুম থাকা সত্ত্বেও যামিনীর খাওয়া-দাওয়া বেশীর ভাগ এই বারান্দাটিতেই হয়। বর্ষাকালে ইহার সামনে ঝোলে সবুজ তেরপলের পরদা জলের ছাট আটকাইবার জন্য, আর ঘোর গ্রীষ্মে ঝুলিতে থাকে খশখশের টাট। কালে-ভদ্রে নীচে তিনি খাইতে যান যদি অতিথি-অভ্যাগতের আবির্ভাব হয়, নয়ত কোনও কারণ বশতঃ সুরেশ্বর যদি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। মমতা সর্ব্বদা মায়ের সঙ্গেই খায়, সুজিতের কিছু ঠিক নাই। সে মায়ের সঙ্গেও খায়, নিজের ঘরেও খায়, আবার নীচে বাবার সঙ্গেও খায়।

নিত্যর ডাকে মমতাও বার-দুই আলস্য ভাঙিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল। রোদ উঠিলে শুইয়া থাকিতে তাহারও ভাল লাগে না, তবে যামিনীর মতন এ-বিষয়ে অতটা মতের দৃঢ়তা তাহার নাই। মাঝে মাঝে জাগিয়া বিছানায় শুইয়া আল্‌সেমি করিতে তাহার বেশ ভালই লাগে, তবে মায়ের ডাকাডাকির চোটে এ-সুখটা সে কোনও দিনই পূরাপূরি উপভোগ করিতে পায় না। মায়ের স্নান করাও শেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে তখন নিত্য আর রেবতী-ঝি মিলিয়া শ্বেত-পাথরের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিতেছে। যামিনী আসিয়া বসিতে-না-বসিতেই তাঁহাদের প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কালকের খাবার অনেক বাঁচিয়াছে, তাই আজ আর সকালে কিছু তৈয়ারি করা হয় নাই। লুচি, মাংস, সন্দেশ, পান্তুয়া, দরবেশ মিঠাই বোঝাই করিয়া মস্ত বড় ট্রে বিন্দু-ঠাকুরঝি উপরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লুচিগুলি ও মাংসটা বেশ করিয়া আবার গরম করিয়া লওয়া হইয়াছে।

যামিনী খাবারের পরিমাণ দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "থাম্,

থাম্, অতগুলো নামাস্ নে, কে অত খাবে? উনি আর খোকা উঠ্‌লে পর তাঁদের দিস্।"

নিত্য ট্রে-সুদ্ধ নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আরও ত মেলা রয়েছে পিসীমা আমাদের-সুদ্ধ লুট গড়তে মানা ক'রে দিয়েছেন।"

যামিনী বলিলেন, "মেলা আছে ব'লেই কি ঐ দু-সের ময়দার লুচি আমি আর খুকি খেতে পারব? আমি যা দরকার তুলে নিচ্ছি, বাকি ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যা।" তিনি দুটি প্লেটে খান-চার করিয়া লুচি ও একহাতা করিয়া মাংস তুলিয়া লইলেন। মিষ্টি নিজের জন্য কিছুই লইলেন না, মমতার প্লেটে একটা সন্দেশ আর একটা পান্তুয়া তুলিয়া দিলেন। নিত্য আবার খাবার-বোঝাই ট্রে-খানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মমতা মুখ হাত ধুইয়া চুল আঁচড়াইয়া আসিয়া মায়ের সামনের চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। বলিল, "মা, রাত্রেও কিছু খেলে না, এখনও কিছু খাচ্ছ না যে? বা রে, আমার পাসের খাওয়া তুমি কিছুই খাবে না নাকি?"

যামিনী বলিলেন, "এক গাদা বাসি জিনিষ খেলে অসুখ করবে না গরমের দিনে? তবু রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল ব'লে মাংসটা এখনও খাওয়া যাচ্ছে, না হ'লে ত তাও যেত না। এখন খোকা না গণ্ডেপিণ্ডে গেলে তাহলেই হয়।"

মমতা খাইতে খাইতে বলিল, "খোকার আবার বাসি খাবার খুব পছন্দ, ঠিক বাবার মত কাকাও বাসি মাংসটাংস খুব ভালবাসেন, না মা?"

যামিনী বলিলেন, "তা ত ঠিক জানি না মা, হতে পারে।"

মমতা বলিল, "অনেক ত খাবার বেঁচেছে, ওঁদের কিছু পাঠিয়ে দাও না মা? মামাবাড়ীতেও ত দিতে পার? লুসি আর বেট্টু খুব খুশী হবে।"

যামিনী বলিলেন, "মামার বাড়ীতে ত দিতেই পারি। তবে তোমার কাকীমা আবার যা গোঁড়া হিন্দু, এসব খাবেন কিনা কে জানে? মিষ্টি খানিকটা পাঠিয়ে দেব।"

রেবতীকে দিয়া বিন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "দেখ ঠাকুরঝি, মিহিরদের ওখানে কিছু লুচি মাংস আর মিষ্টি পাঠিয়ে দাও, আর ঠাকুরপোদের ওখানে মিষ্টি খানিকটা পাঠিয়ে দাও। হরি-ঠাকুরকে ব'লো ঠাকুরপোর ওখানে যেতে, নইলে আবার ছোঁয়া-ছুঁয়ি নিয়ে গোলমাল বেধে যাবে।"

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই দেব কি?"

যামিনী বলিলেন, "হাঁ, এখনই দাও, তাহলে সকালে খেতে পারবে, না হ'লে মাংসটা হয়ত খারাপ হয়ে যাবে।"

যামিনী আর মমতার খাওয়া শেষ হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। মমতা টেবিল ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "বাবা বোধ হয় আজ বারোটার আগে উঠবেনই না। কাল কত রাত্রে তিনি শুয়েছিলেন মা?"

যামিনী বলিলেন, "কি জানি মা, ঠিক বলতে পারি না। বারোটা একটার আগে নয় নিশ্চয়ই।" স্বামীর বন্ধুর দল তিনি চিনিতেন, রাত্রি তিন প্রহর অতীত না হইলে তাঁহাদের উৎসব কখনও সাঙ্গ হয় না। কিন্তু ছেলেমেয়ের সামনে সে-সব কথা তিনি সহজে অলোচনা করেন না।

সুজিতও বোধ হয় বারোটা পর্য্যন্ত ঘুমাইত, কিন্তু মায়ের তাড়ায় তাহাকে সাড়ে নয়টার সময়ই উঠিয়া বসিতে হইল। স্নান না করিয়াই

খাইতে বসিবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা তাহাও করিতে দিলেন না। কাজেই সুজিতের দিনটা বিশেষ ভাল ভাবে আরম্ভ হইল না। তবে সুরেশ্বর উঠিলেন বেলা বারোটায় এবং স্নান করিয়া অল্প কিছু খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, তাঁহার শরীর ভাল নাই, এবং তিনি কোথাও বাহির হইবেন না। সুজিত বাবার গাড়ীখানা লইয়া কাকার বাড়ী বেড়াইতে চলিল, মাকে জানাইয়া গেল যে সন্ধ্যার আগে সে বাড়ী ফিরিবে না।

মমতার আজ বড় আলস্য ধরিয়াছিল, ভাত খাওয়ার পর একটু গড়াইয়া লইবার ইচ্ছায় শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল। যামিনীর দিবানিদ্রা অভ্যাস ছিল না, দিনে ঘুমাইলে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইত। ৮

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ তিনি কতকগুলি নূতন বাংলা মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করিয়া সময় কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর সেলাই করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন লাগিল না। ছেলে বাহির হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বাড়ী আছেন বটে, কিন্তু সুরেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছে। একজন না ডাকিলে আর একজন বড় কাছে ঘেঁষেন না। ডাকটা বেশীর ভাগ সুরেশ্বরের দিক্ হইতেই আসে, কারণ পত্নীকে বাদ দিয়া এখনও তাঁহার দিন চলে না। যামিনীর জীবনে হয়ত স্বামীর কোনও প্রয়োজনই নাই, অন্ততঃ তাঁহার বাহিরের ব্যবহারে তাহাই মনে হয়। আজ এখন পর্য্যন্ত সুরেশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। বাবুর খাসভৃত্য নিতাই তাঁহাকে খবর দিয়া গিয়াছে যে বাবুর শরীর ভাল নাই, তিনি নীচে যাইবেন না, স্নান করিয়া উপরেই মাছের ঝোল ভাত খাইবেন। একবার

খোঁজ নেওয়া দরকার কিনা, যামিনী তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর যদি খাইয়া দাইয়া ঘুমাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনর্থক তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া লাভ নাই। বিনা প্রয়োজনেও যে-মনের টানে দুইটি মানুষ সারাক্ষণ পরস্পরকে কাছে চায়, সে মনের টান এই দুইটি মানুষের ভিতর নাই। সুরেশ্বরের অবশ্য নিজের দরকার হইলেই আসেন বা যামিনীকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু যামিনী সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইবার আগে চুল চিরিয়া বিচার করিতে বসেন, তাঁহার যাইবার প্রয়োজন পুরাপুরি আছে কিনা।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া তিনি অবশেষে উঠিয়া পড়িলেন। গরমে পায়ের তলা জ্বালা করিতেছিল, চটিজোড়া ছাড়িয়া রাখিয়া খালি পায়েই স্বামীর ঘরের দিকে চলিলেন। ঘরের দরজা ভেজানো, তবে ভিতর হইতে খিল বন্ধ নাই। পাখা চলার শব্দ বাহির হইতে শোনা যাইতেছে। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবামাত্র সুরেশ্বর চব্বিশটা ঘণ্টাই প্রায় পাখার তলায় কাটাইতে আরম্ভ করেন। মমতা বলে, "বাবা পারলে হাঁটা-চলার সময়ও একটা পাখা মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখেন।"

সুরেশ্বর বলেন, "বিজ্ঞানের আর একটু উন্নতি হোক, তখন এ দুঃখটাও আমার যাবে।"

যামিনী দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলিয়া একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন। সুরেশ্বর শুইয়া আছেন, তবে তাঁহার পিঠ দরজার দিকে, ঘুমাইতেছেন কিনা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যামিনী ধীর পদক্ষেপে খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেশ্বর ঘুমাইয়াই আছেন।

একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া যামিনী ঘরখানার চারি কোণে চোখ বুলাইয়া লইলেন। রোজ এখানে তিনি আসেন না, কাজেই চাকরবাকরা ফাঁকি

দিবার বেশ সুবিধাই পায়। নানা স্থানে ঝুল জমিয়া আছে, কেহ তাহা ঝাড়ে নাই, জানালার ও দরজার পর্দ্দাগুলিও বেশ হপ্তা-কয়েক ধোপার মুখ দেখে নাই বোধ হয়। সুরেশ্বর নিজের পরিবার কাপড়টি ঠিক-মত কোঁচানো হইলেই এবং খাওয়াটি মুখরোচক হইলেই সন্তুষ্ট, ঘরের পরিচ্ছন্নতা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান না। নিতাইকে ডাকিয়া ধমক দিতে হইবে। যামিনী যেমন নীরবে আসিয়াছিলেন, তেমনই নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

৪

দারুণ গরমে বাড়ীসুদ্ধ সকলে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশ্বরও দশটা বাজিবার আগে ঘরে খিল দেন, এবং সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিলে পর তবে দরজা খুলিয়া নীচে যান। রাত্রিটাকেই দিন করিবার চেষ্টায় আছেন যেন মনে হয়। ফলে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় না। ক্রমেই যেন বাড়াইতেছেন। যামিনীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। একেই তিনি স্বল্পভাষিণী, এখন কথাবার্ত্তা বলা একেবারেই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। মমতার ইহাতে ভারি অস্বস্তি লাগে ; মা আর কাহারও সঙ্গে কথা বলুন বা নাই বলুন, তাহার সঙ্গে ত সর্ব্বদাই বলিতেন ? হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন কেন ?

শেষে থাকিতে না পারিয়া বলিল, "মা, তুমি কি মৌনব্রত নিয়েছ নাকি, গান্ধী-মহারাজের মত ? আমার সঙ্গেও কি আড়ি ক'রে দিয়েছ দেখছি।"

যামিনী একটুখানি ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না মা, মৌনব্রত আর নেব কি করতে ? যা গরম, শরীর মন কিছুই ভাল নেই, কথাবার্ত্তা বলতে ইচ্ছা করে না।"

মমতা বলিল, "বাবা ত সারাদিন দরজা এঁটে ঘুমোবেন আর তুমি থাকবে চুপ ক'রে। খোকাটা ত কোথায় যে ঘোরে, তার ঠিকানাই নেই। বাবাঃ, কলেজটা আমার খুল্‌লে বাঁচি, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে একেবারে।"

যামিনী বলিলেন, "তোর মামীমা সেদিন এত ক'রে যেতে ব'লে গেল, যা না, দিন-দুই-চার থেকে আয়। সে এত কথা বল্‌বে যে তুই উত্তর দেবার সময় পাবি না।"

মমতা বলিল, "বারে, আমাকে একলা যেতে ত মামীমা বলেন নি? তুমি, খোকা, আমি, সবাই মিলে যাই চল।"

যামিনীর বাপের বাড়ী যাইতে মন কিছুতেই ওঠে না। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মনের এই বাধাকে জোর করিয়া কাটাইয়াই তাঁহাকে যাইতে হইত, না হইলে বৃদ্ধ মনে করিবেন কি? বাস্তবিক পত্নীর মৃত্যুর পর যামিনীর পিতা নৃপেন্দ্র-বাবু একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাসে নিজের জন্য কোনও কিছু একেবারে না করাটা তাঁহার দিব্য আয়ত্ত হইয়াছিল। সাংসারিক কোনও ব্যাপারে পত্নী জ্ঞানদা তাঁহাকে কোনওদিনই হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। নিজের পরিবার ও সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার একাধিপত্য প্রায় মুসোলিনীর কাছাকাছি ছিল। নৃপেন্দ্রনাথ ইহাতে শান্তি নিশ্চয়ই পাইতেন না, আত্মমর্য্যাদাও তাঁহার সময় সময় ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু আরামে থাকার মূল্যস্বরূপ এগুলিকে তিনি বিসর্জ্জনই দিয়াছিলেন। তিনি নিজে কি খাইবেন, কি পরিবেন, কখন ঘুমাইবেন, কখন কোথায় যাইবেন, তাহা ভাবাও বহুদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞানদাই এ সবেরও ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার নূতন করিয়া এ সব ভাবনা ভাবিতে গিয়া

নৃপেন্দ্র-বাবু বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ হইতে লাগিল। যামিনীর সবে তখন বিবাহ হইয়াছে, সুরেশ্বর দুই দণ্ড তাঁহাকে চোখের আড়াল করিতে চান না। তবু মাঝে মাঝে জেদ করিয়া তিনি আসিতেন। ভ্রাতা মিহিরের সাক্ষাৎ কালেভদ্রে মিলিত। মা থাকিতে সে একেবারেই ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করিতে পারে নাই, এখন তাহার শোধ তুলিতেছিল, কোনও সময়েই ঘরে থাকিত না। স্কুলে যাইবার নাম করিয়া বাহির হইত, রাত আটটা-নটার আগে কোনওদিন বাড়ী ফিরিত না। নৃপেন্দ্র-বাবু সে-সব লক্ষ্যই করিতেন না।

যামিনী আসিয়া চুপ করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতেন। কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন না। মৃত্যুশোক যে না-পাইয়াছে তাহার মুখে সান্ত্বনার বাণী হাস্যকর শুনায়; যে পাইয়াছে সে জানে, ইহার কোনও সান্ত্বনা জগতে নাই, কথা বলিতে যাওয়াই বৃথা। তাই পিতা-পুত্রী দু-জনে নীরবই থাকিতেন, পরস্পরকে কিছু তাঁহাদের বলিবার ছিল না। সাধারণ কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি দু-একটি কথামাত্র তাঁহারা বলিতেন, তাহার পর সুরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইতেন যামিনীকে লইয়া যাইবার জন্য। স্মৃতির শ্মশানের মত এ গৃহ যামিনীর বড় অসহনীয় ছিল। এখানকার সর্ব্বত্র তিনি যেন অশরীরী জ্ঞানদার ছায়া দেখিতেন। আর একজন, যে জগতে থাকিয়াই তাঁহার কাছে মৃত, সেই প্রতাপকেও যেন বড় বেশী করিয়া এখানে মনে পড়িত, এখানকার বালকণাটুকুর সঙ্গেও যে তাহার স্মৃতি জড়িত? প্রতাপের প্রতি নিজের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে হইলে তাঁহার বুকের ভিতর যেন চিতার আগুন জ্বলিতে থাকিত, দুই চোখ বুজিয়া এখান হইতে তিনি পলাইয়া বাঁচিতেন।

তাহার পর দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া

আসিল। মমতা আসিয়া যামিনীর কোল জুড়িয়া বসিল, হৃদয়ের দারুণ ক্ষতে সে সুধাময় প্রলেপ মাখাইয়া দিল। তাহাকে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার কুসুম-কোমল গণ্ডে চুম্বন দিয়া, যামিনী জগতের আর সব কিছুই যেন হঠাৎ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারও মুখে হাসি ফুটিল, সংসারে এতদিন তিনি অতিথির মত ছিলেন, আজ মমতার জননীরূপে ইহাকে নিজের গৃহ বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন।

নৃপেন্দ্রের সংসারেও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। তাঁহার নিজের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, পুরা পেন্সন লাভের আশা ত্যাগ করিয়া তিনি আগেভাগেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন। অল্প যা পেন্সন পাইলেন, তাহাতে সংসার চলে না, অন্ততঃ এতকাল যে ভাবে চলিতেছিল তাহা চলে না। বাড়ীটাকে ভাড়া দিয়া ছোট বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু মিহির কিছুতেই রাজী হইল না। অবশেষে বাড়ীর একটু অদলবদল করিয়া, একতলাটা ভাড়া দেওয়া হইল। দোতলায় পিতাপুত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

মিহিরের বিবাহও হইয়া গেল সকাল-সকাল। পড়া শেষ হইবার আগেই সে আগেভাগে প্রেমে পড়িয়া কাজ অনেকখানি অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিল। বি-এস্‌সি পাস করিয়াই সে পড়া চুকাইয়া দিল, এবং চাকরির চেষ্টায় লাগিয়া গেল। যামিনী ভাইয়ের এত উন্নতি দেখিয়া বেশ অবাক্ হইয়া গেলেন, মনে ভাবিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু আসল কারণটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মেয়ের বাড়ী হইতে তাড়া আসিতেছিল। প্রভা মিহিরেরই সমবয়সী, সেও বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, তবে প্রেমের দেবতা তাহার হৃদয়ে এতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন যে বাগ্‌দেবীর আরাধনা সে

যথোচিত করিতে পারে নাই এবং পাসও হয় নাই। তাহার মা বাবার ইচ্ছা এখন বিবাহ দিয়া ফেলা, দিনের পর দিন বসিয়া মেয়েকে শুধু প্রেমালাপ করিতে দেওয়ায় তাঁহাদের মত নাই। ছেলের বাড়ীঘর আছে, পেন্সনভোগী বাবা বাঁচিয়া আছেন, সুতরাং মিহিরের কাজ হইতে যদি দুই-চার দিন বিলম্বও হয়, তাহাতেও সকলে মারা যাইবে না।

বিবাহ হইয়াই গেল। মা বাঁচিয়া নাই, পিতা সাংসারিক ব্যাপারে একেবারে অক্ষম। সুতরাং ভাইয়ের বিবাহ দিতে যামিনীকে কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়ী আসিতে হইল। নিজের বিবাহের পর এই তিনি প্রথম আসিলেন এবং এই শেষ। বিবাহ এবং বউভাত হইয়া যাইবার পরই ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর আর গিয়া থাকিতে ইচ্ছাও হয় নাই এবং প্রয়োজনও হয় নাই। প্রভার হাতে-গড়া সংসার সম্পূর্ণ অন্য মূর্ত্তি ধরিল, যামিনীর মায়ের সংসারের চিহ্ন একেবারেই মুছিয়া গেল।

নৃপেন্দ্রবাবু মিহিরের বিবাহের বছর-দুই পরে মারা গেলেন। যামিনী তখন হইতে মিহিরের বাড়ী পারতপক্ষে আর যান নাই। প্রভাও খুব যে ডাকিত তাহা নহে। সংসার যে ভাবেই করুক, প্রভুত্বপরায়ণতায় সে নিজের শাশুড়ীরই কাছাকাছি ছিল। তাহার ঘরে আসিয়া কেহ যে মনে মনেও তাহার ঘরকন্নার সমালোচনা করিবে, তাহা সে সহ্য করিতে পারিত না। যামিনীকে ভদ্রতার খাতিরে সে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিত বটে, তবে না আসিলে বিশেষ কিছু দুঃখিত হইত না। যামিনীও যে সেটা মনে মনে না বুঝিতেন এমন নয়।

এবার, কেন জানি না নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া প্রভার একটু দিল খুলিয়া গিয়াছিল। সে যামিনী, মমতা, খোকা, সবাইকেই গিয়া কিছু

দিন তাহার বাড়ীতে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। সুরেশ্বরকে বাদ দিল, কারণ জানা কথা যে ডাকিলেও তিনি যাইবেন না।

মমতা তাঁহাকে-সুদ্ধ যাইতে বলায় যামিনী একটু বিপদে পড়িয়া গেলেন। বলিলেন, "সবাই গেলে চলবে কি ক'রে মা? তোমার বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

মমতা বলিল, "বাবা ত সারাদিন খালি দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমান, কেউ বাড়ীতে থাকলেই বা তাঁর কি, আর না থাকলেই বা কি?"

মেয়ের কথা শুনিয়া যামিনীর হাসি পাইল। তিনি বলিলেন, "তাহলেও যদি দরকার হয়, কারও থাকা ত উচিত?"

মমতা বলিল, "তুমি খালি না-যাবার ছুতো বার করছ মা। যদি দরকার হয় ত তখনই চ'লে এলেই হবে, আমরা ত আর হিল্লীদিল্লী কোথাও যাচ্ছি না, কলকাতাতেই থাকব।"

যামিনী বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর পারি না, মা। তুই যা না, আমার কোথাও নড়াচড়া ভাল লাগে না, নিজের ব্যবস্থায় নিজের ঘরে আমি বেশ থাকি। অন্যের ঘর-সংসারের মধ্যে আমার বড় অসোয়াস্তি লাগে।"

মমতা বলিল, "সব মানুষে বাপের বাড়ী যেতে কত ভালবাসে, তুমি কেন যেতে চাও না মা? আমার ত এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে মনে করলেই কান্না পায়।"

যামিনীর মুখে বিষাদের ছায়া আরও যেন গভীর হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "আমার বাপের বাড়ী কোথায় মা যে আমি যেতে চাইব?"

মমতা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল যে এ আলোচনায় তাঁহার

প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হলে আমিই আজ যাই মা, পরশু কি তার পরদিন ফিরে আসব এখন।"

যামিনী বলিলেন, "বেশ, তা যে ক'দিন ভাল লাগে থেকে আয়। লুসিরা খুব খুশী হবে এখন তোকে পেয়ে। রোদ প'ড়ে গেলে যাওয়া যাবে এখন। আমিও যাব, গিয়ে তোকে রেখে আসব। খোকাকে ব'লে দেখ না, সে যেতে চায় কিনা।"

মমতা বলিল, "কোথায় তার দেখা পাব? বাবা যেমন ঘর ছেড়ে নড়তে চান না, খোকা তেমনি ঘরের ভিতরেই ঢুকতে চায় না। সারাদিন তার আড্ডা হচ্ছে ড্রাইভারটার সঙ্গে, কোথায় কোথায় যাওয়া যায় তারই ফন্দি শুধু।"

যামিনীও কয়েক দিন ধরিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। ছেলেকে কিছু বলা তাঁহার উচিত। কিন্তু নিজের মনের অবসাদ এতই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, কিছু করিতেই, এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা বলিতেও তাঁহার ইচ্ছা করিত না। কিন্তু কর্ত্তব্য একেবারে ভুলিয়া থাকা যায় না। যদিও ইহা এক রকম স্থিরই জানিতেন যে ছেলে তাঁহার কথা শুনিতে সহজে চাহিবে না, তবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, একবার বুঝাইয়া বলিবার জন্য।

সুজিত আসিল আধ ঘণ্টা পরে। কিছু একটা কারণে বকুনি খাইতে হইবে, তাহা সে ধরিয়া লইয়াই আসিয়াছে, মুখ তাহার ভার, দুই চোখে বিদ্রোহীর দৃষ্টি।

যামিনী বলিলেন, "খোকা, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোর তুমি, তোমাকে ত দেখাই যায় না। সারাদিন চাকর-বাকরের সঙ্গেই বা গল্প কর কেন, এটা ত ভাল না।"

সুজিত বলিল, "স্কুল ত ছুটি, শুধু শুধু হাঁ ক'রে বাড়ী ব'সে থাকব নাকি? বাবার গাড়ীটা এখন পাওয়া যাচ্ছে, তাই বেড়িয়ে-চেড়িয়ে নিচ্ছি।"

যামিনী বলিলেন, "স্কুল বন্ধ ব'লে কি পড়াশুনোর সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিতে হবে? বই ত একদিন ছুঁতে দেখলাম না। গেল-বার হাফ-ইয়ারলিতে ফেল করলে, ক্লাসেও উঠতে পারলে না, এবারও তাই করতে চাও নাকি?"

উত্তরে বলিবার ভাল কিছু না পাইয়া, সুজিত মুখখানা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মা আবার বলিলেন, "আর আমাকে বা ওঁকে না জানিয়ে অমন যেখানে-সেখানে চ'লেই বা যাও কেন? কোথায় যেতে হবে, কোথায় না-যেতে হবে সব বোঝবার মত বয়স কি তোমার হয়েছে?"

সুজিত বলিল, "চুরিডাকাতি করতে ত যাই না, বেড়াতেই যাই। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই জান্‌তে পারবে।"

ছেলের কথা শুনিয়া ত যামিনীর দুই কান জুড়াইয়া গেল। চমৎকার শিক্ষা হইতেছে ইহার। নিজের পিতৃকুলকেও হার মানাইবে বোধ হয়।

অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "খোকা, তুমি বড় নির্ব্বোধ হয়ে যাচ্ছ, কথাবার্ত্তা কইতে শিখবার বয়স অন্ততঃ তোমার হয়েছে। আমি ড্রাইভারকে ব'লে দিচ্ছি, আমার বা ওঁর অনুমতি ছাড়া তোমায় কোথাও নিয়ে যাবে না। আর তোমার মাষ্টার-মশায়কে আবার সকালে আসতে বলছি। অন্ততঃ ঘণ্টা-দুই সকালে তোমায় পড়িয়ে যাবেন।"

কথাগুলি খোকার বিন্দুমাত্রও ভাল লাগিল না। কিন্তু এখনও মায়ের কথার অবাধ্য হইবার মত জোর ত তাহার নাই, অন্ততঃ

খোলাখুলি ভাবে। মুখখানা রাগে কালো করিয়া, দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যামিনী বুঝিলেন, মামার বাড়ী যাইতে বলিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই, যাইতে সে কিছুতেই এখন চাহিবে না।

বিকালে চা খাওয়ার পর মমতাকে লইয়া তিনি চলিলেন। মমতার ইহাতেই মহা উৎসাহ, সারা দুপুর বসিয়া সে বই আর কাপড় গুছাইয়াছে। থাকিবে ত মোটে দুই দিন, তাহারই জন্য এত আয়োজন। কিন্তু জীবনের আরম্ভে মানুষের মনটা আনন্দ করিবার জন্য, অকারণে উৎসাহিত হইবার জন্যই যেন ব্যস্ত হইয়া থাকে। উপলক্ষ্য একটা কিছু জুটিল ভাল, না জুটিলেও ক্ষতি নাই।

প্রভা খুব ঘটা করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, "তবু ভাগ্যি যে দিদিরও পায়ের ধুলো পড়ল। গরিব ভাই-ভাজকে ত ভুলেই গেছ। কিন্তু খোকা কই? বেটু ত তার জন্যে মহা ব্যস্ত।"

মমতা আসিয়াই কাপড়ের পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া ছাতে ছুটিয়াছিল লুসি আর বেটুর খোঁজে। যামিনী বলিলেন, "তাকে আর আনলাম না, বড় অমনোযোগী আর দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। দিনকতক ধ'রে বেঁধে ভাল ক'রে পড়াতে হবে।"

প্রভা বলিল, "ওমা, তা দু-এক দিন থেকে গেলে আর কি হ'ত? এখনও ত এক মাস ছুটি বাকি। ঠাকুরজামাই আসতে দিলেন না তাই বল, মানের হানি হবে।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার ঠাকুরজামাই ছেলের জন্যে অত ভাবনা ভাবলে ত আমি বর্তে যেতাম। গরম প'ড়ে অবধি সমস্ত দিনরাত ঘরে

দোর দিয়ে ঘুমনো ছাড়া আর কোনও কাজ তাঁর নেই। ছেলে মামাবাড়ী ছেড়ে বিলেত চ'লে গেলেও তাঁর নজরে পড়ত না।"

প্রভা রসিকতা করিয়া বলিল, "তাই বুঝি তোমার এখন ছুটি মিলেছে, নইলে ত রাণীকে চোখের আড়ালও করতে পারেন না।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তা ভাবলে যদি খুশী হও ত তাই। আমি কিন্তু ভাই রাত্রে চ'লে যাব, মমতা এখন দিনকয়েক থাকবে।"

প্রভা বলিল, "তাই ত বলি, আমাদের কি আর এত ভাগ্যি হবে? খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। আমি সকলেরই রান্না করেছিলাম, সব ফেলা গেলে চলবে না।"

রাত্রে যামিনী বিশেষ কিছুই খান না; কিন্তু না খাইলে আবার একরাশ কথা শুনিতে হইবে, তাহার চেয়ে খাইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

মিহির খানিক পরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভা রান্নাঘর তদারক করিতে গেল, যামিনী বসিয়া ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

খাওয়াদাওয়া সারিতে খানিকটা রাত হইয়া গেল। তাহার পর মেয়েকে রাখিয়া যামিনী ফিরিয়া চলিলেন।

৫

শুক্লপক্ষের রাত, আকাশে কোথাও মেঘের টুক্‌রাটিও নাই। থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস আসিতেছে, আবার খানিক ক্ষণের মত সব স্থির। কলিকাতার কলকোলাহল রাত একটার আগে কখনও মন্দা পড়ে না, গাড়ী ঘোড়া মোটর সমানে চলিয়াছে, তবে গতির বেগ কিছু কমিয়াছে, প্রাণ হাতে করিয়া সকলকে চলিতে হইতেছে না। হাওয়ার লোভে সকলেই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, হিন্দুকুলবধূ ছাড়া। গরিব যে সে ফুটপাথে বসিয়া হাওয়া খাইতেছে, বড়মানুষ গাড়ী চড়িয়া গড়ের মাঠে চলিয়াছে।

যামিনী একলা গাড়ীতে আসিতে আসিতে ইহাই চাহিয়া দেখিতেছিলেন। অধিকাংশ মানুষের জীবনে শুধু অভাব, শুধু সংগ্রাম। অথচ এই জীবনের প্রতিই মানুষের কি নিদারুণ আসক্তি। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নাই। রোগে ও অভাবে তাহারা জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু ইহারই ভিতর সংসার পাতিয়াছে, নিজেরা যেভাবে না খাইয়া, না পরিয়া পৃথিবীর কটা দিন শেষ করিয়া গেল, সেইভাবেই বাঁচিয়া মরিতে আর কতকগুলি জীবকে রাখিয়া গেল। তবু ইহাদেরই জীবনে যে কোনও আনন্দ নাই বা শান্তি নাই, তাহাই কি

কেহ বলিতে পারে? ঐ যে কুলিরমণী শিশু কোলে লইয়া শ্রান্ত পতির পাশে রাস্তার উপরেই বসিয়া আছে, সে কি সত্যই যামিনীর চেয়ে অসুখী? তাঁহার রত্নালঙ্কার আছে, মোটর আছে, প্রাসাদতুল্য বাড়ী আছে, কিন্তু আনন্দ কোথায়, শান্তি কোথায়? এক মমতার মুখখানি মনে যখন জাগে, তখনই প্রাণের ভিতর তাঁহার সুধা সিঞ্চিত হয় আর কে বা কি তাঁহার আছে বিন্দুমাত্র আনন্দ বা শান্তি তাঁহাকে দিতে পারে? সুজিতও তাঁহার সন্তান। কিন্তু তাহার চিন্তায় এখনই তাঁহার মনে বেদনার সঞ্চার হয়; এ ছেলে বড় হইয়া কেমন যে দাঁড়াইবে, তাহারই ভয় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্বামীর চিন্তা তিনি যথাসাধ্য মন হইতে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখেন। সুরেশ্বরকে বিবাহ তিনি করিয়াছিলেন, স্ত্রীর স্বামীকে যাহা দেয়, তাহা তাঁহাকে যামিনী দিতে পারিলেন কই? সুরেশ্বরের নিকট হইতেও তিনি যদি পত্নীর প্রাপ্য যাহা কিছু তাহা না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ দিবেন কাহাকে? যে বিবাহের মূলে উভয় পক্ষেই ছিল শুধু লোভ, তাহার ফলে ইহার চেয়ে ভাল আর কি হইবে? কিন্তু এ-সব এক রকম তাঁহার সহিয়া গিয়াছে, দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে। পত্নীরূপে তাঁহার নারী-জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়াছে, জননীরূপে অল্পমাত্রও সার্থকতা লাভ যদি তাঁহার ভাগ্যে থাকে, সেই আশাতেই তিনি বুক বাঁধিয়া আছেন। সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের যেন ক্রটি না হয়, তাহারা যেন মানব-জীবনে যাহা-কিছু পাইবার তাহা পায়, বঞ্চিত না হয়, এবং অন্যকে বঞ্চিত বা প্রতারিত না করে। এ-ক্ষেত্রেও স্বামী তাঁহার প্রতিবন্ধক, নিতান্ত ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে যদি সুমতি দেন তবেই।

বাড়ী আসিয়া পৌছিতে তাঁহার প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল।

নীচে সব চুপচাপ দেখিয়া তিনি একটু [illegible] হইয়া গেলেন। সুরেশ্বরের অসুখবিসুখ কিছু করিল নাকি? রাত একটার আগে ত তাঁহার সান্ধ্য উৎসব শেষ হয় না?

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে একটা চাকরের সঙ্গে দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কি উপরে?"

সে জানাইল, বাবু উপরেই আছেন। তাঁহার শরীর ভাল না থাকায় তিনি আজ নীচে নামেন নাই।

যামিনী একটু উদ্বিগ্নভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য এখন মধ্যে-মধ্যে তাঁহার আশঙ্কা হইত। স্বাস্থ্যের কোনও নিয়মই প্রায় সুরেশ্বর মানিয়া চলেন না, সুতরাং অসুস্থ হইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

সুরেশ্বরের ঘরে তখনও বাতি জ্বলিতেছে। যামিনী পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল নেই নাকি?"

সুরেশ্বর শুইয়া শুইয়া নভেল পড়িতেছিলেন, ইহাও তাঁহার সদভ্যাসের একটি। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হুঁ; এত রাত হ'ল কেন?"

যামিনী একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "প্রভা খাওয়াবার জন্যে জেদ করতে লাগল, তাই দেরি হ'ল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "মমতা ঘুমিয়ে পড়েনি ত? যা ঘুম-কাতুরে সে।"

যামিনী বলিলেন, "সে ত আসে নি, [illegible]-দুই মামীর কাছেই রইল।"

সুরেশ্বর বিরক্তভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই মাটি করেছে।"

যামিনী বলিলেন, "কেন? দিন-দুই ঘুরে আসুক না? বাড়ীতে

ব'সে ব'সে ছেলেমানুষের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, একটা ত সঙ্গীও নেই।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "আর ক'দিন আগে গেলেই পারত, তখন দু-দিন ছেড়ে দশ দিন থাকলেও ক্ষতি ছিল না। এখন আমি তাদের কথা দিয়ে দিয়েছি যে, পরশু তারা আসবে।"

যামিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কাকে তুমি আবার কথা দিতে গেলে? তোমার জ্বালায় ত আর পারি নে। কি কথা?"

সুরেশ্বর মাথার বালিশটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমার ত সব তাতেই জ্বালা। কি হ'লে যে তোমার সুবিধে হয়, তাও ত এই এতকালের মধ্যে আমার মাথায় ঢুকল না। মেয়ে ত সতের আঠার বছরের হ'তে চলল, সত্যি কি তুমি তার বিয়ে দিতে দেবে না নাকি? তোমার মা যে ব্রাহ্মসমাজের মানুষ ছিলেন, তিনিও ত এ বয়স থেকে তোমার বিয়ের ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। তুমি যে তাঁকেও ছাড়াতে চললে দেখছি।"

যামিনী বলিলেন, "খালি মায়ের তুলনা দেওয়া তোমার এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কি ঠিক তোমার বাবার মতে সব তাতে চলেছ? সে কথা এখন থাক্, ও আলোচনার এ জীবনে ত কখনও মীমাংসা হবে না। কাকে কি কথা দিলে তাই বল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "একটি ভাল ছেলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই ভাবছি কথাবার্ত্তা একটু কয়ে দেখি।"

যামিনী বলিলেন, "ভাল ছেলের সন্ধান ত এখন পর্য্যন্ত ঢের পাওয়া গেল। মেয়ে এখনও অত্যন্ত ছেলেমানুষ, বিয়ে দেবার মত মোটেই নয়। এত তাড়াহুড়োর দরকার কি? পড়ুক না আর কিছু দিন?

এ-সব শুনলে সে এখন কেঁদে অনর্থ করবে। আই-এ-তে কি কি নেবে তারই ভাবনা ভাবছে বেচারী, আর তুমি এ সব উৎপাত জোটাচ্ছ!"

স্বরেশ্বর বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ঢের পড়বার সময় পাবে তোমার মেয়ে, ভাবনা নেই। ওরা ছেলেকে এখন বিলেত পাঠাচ্ছে আই-সি-এসের চেষ্টায়। সেখান থেকে ফিরে আসতেও ত ঢের দিন। তোমার মেয়েকে তখন পছন্দ করলে হয়।"

যামিনী বলিলেন, "না করলেও আমার মেয়ে বানের জলে ভেসে যাবে না। কিন্তু ছেলে কে, তাই না-হয় একটু শুনি? এত আগে মেয়ে দেখবার তাদেরই বা কি দরকার, বিয়ে যখন এখন হবেই না?

স্বরেশ্বর বলিলেন, "ওর ভিতর একটু কথা আছে। ছেলের বাপের অবস্থা ভাল নয়, বিলেত পাঠাবার জন্যে তাঁকে অনেক টাকা ধার করতে হবে। আমি টাকাটা ধার দেব বলেছি; ছেলে অবশ্য যদি পাশ ক'রে এসে মমতাকে বিয়ে করে, তাহলে আর তাঁদের শোধ করতে হবে না টাকা।"

যামিনী বলিলেন, "আর না যদি করে? সেটার সম্ভাবনাই বেশী।"

স্বরেশ্বর বলিলেন, "হ্যাঁ, এখন থেকে কুডাক ডাক, তাহলে তাই ঘটবে শেষ পর্য্যন্ত। না যদি বিয়ে হয়, তাহলে বুড়োর কাছ থেকে স্বদে আসলে সব আদায় করব। বিনা লেখাপড়ায়ই কি তাঁকে টাকা ধরে দিচ্ছি নাকি?"

যামিনী বলিলেন, "মানুষটা কে, তাই ত এখন অবধি শুনলাম না, শুধু আই-সি-এস্ হলেই ত হবে না, ছেলের স্বভাব-চরিত্র, স্বাস্থ্য সব দেখতে হবে, পরিবার দেখতে হবে।"

স্বরেশ্বর বলিলেন, "অত দেখতে গেলে মেয়ে বিয়ে এ জন্মে হবে

না। ছেলের বিয়েতেই লোকে এত দেখে না, তা মেয়ের বিয়েতে।"

যামিনী তিক্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে না হোক, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই, কিন্তু অপাত্রে যেন না পড়ে।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোমার মতে ত পুরুষমানুষ মাত্রেই অপাত্র। আমি অপাত্র, আমার ভাই অপাত্র, আমার বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে সবাই অপাত্র। তাহলে ব'লে দাও না কেন সোজা যে মমতার বিয়ে তুমি দিতে দেবে না?"

যামিনী বলিলেন, "এ নিয়ে এত হৈ চৈ করবার ত আমি কোনও কারণ দেখছি না। যথাসাধ্য ভাল ছেলে বেছে আমি দিতে চাই, তাতে চটবার কি আছে? মেয়ে সুখী হ'লে ত তোমার কোনও লোকসান নেই?"

সুরেশ্বরের মেজাজ যথেষ্টই গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "না তা নেই, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, তুমি যদি এরকম ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় কর, তাহলে মমতার বিয়ে হবে না। মানুষ ত দোষত্রুটিহীন হয় না, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। ওরই মধ্যে একটু দেখে-শুনে নিতে হয়, নিতান্ত ক্ষীণজীবী কি রুগ্ন না হয়, দুটো খেতে পরতে দিতে পারে।"

স্বামীর আদর্শ পুরুষের নমুনা পাইয়া যামিনী আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন। বুঝিতে পারিলেন, আবার একটা সংগ্রাম ঘনাইয়া আসিতেছে। মেয়ের সুখের জন্য আবার কিছু দিন তাঁহাকে দিনরাত্রিব্যাপী অশান্তি বরণ করিয়া লইতে হইবে। হয় হইবে। কিন্তু তাহার তরুণ জীবনকে সামাজিক হাড়কাঠে ফেলিয়া বলি দিতে তিনি কিছুতেই দিবেন না।

সুরেশ্বর স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর কি মনে করিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া, যামিনীর একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখন থেকে এই নিয়ে রাগারাগি করবার দরকার কি? বিয়ে হলেও তিন-চার বছরের আগে হচ্ছে না? ওরা দেখুক না মেয়ে, আমরাও ছেলেটিকে দেখি। মোট কথা, বুড়ো গোপেশ চৌধুরী পরশু আসছে, খুকিকে দেখতে। তাকে আনিয়ে রেখো, এবং কিছু জলখাবারের যোগাড় ক'রো।"

যামিনী হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তা বেশ, তাই করা যাবে। এখন তুমি আছ কেমন, তাই বল দেখি? কেষ্টো বললে, তোমার শরীর ভাল নেই, নীচে যাও নি, কি হয়েছে? খেয়েছ কিছু; না তাও খাও নি?"

যামিনী হাত সরাইয়া লওয়াতে সুরেশ্বর আবার চটিয়া গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এ ধরণের দেমাক তাঁহার ভাল লাগিত না। এত জাঁক আবার কিসের? এ যেন স্ত্রী না আরও কিছু। স্বামীর মেজাজ বুঝিয়া এবং তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে স্ত্রী বাধ্য, কিন্তু পুরুষের দিকেও এমন বাধ্যবাধকতা কেন থাকিবে? বলিলেন, "থাক, থাক, তোমার আর অত আত্তি দেখাতে হবে না। মায়া-মমতা যা সব আমার জানা আছে। যাও, নিজে এখন ঘুমোও গিয়ে।"

যামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। এই সব অনুযোগ-অভিযোগ ত বহু বৎসরই চলিতেছে, ইহা আর তাঁহার কাছে নূতন ছিল না। এ সবের নূতন করিয়া উত্তর দিবারও কিছু ছিল না। মায়া বা ভালবাসা কোনও পক্ষেই নাই, তবু তাঁহারা যখন সন্তানের জনক-জননী, একত্রে সংসারও করিতেছেন, তখন পরস্পরের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও

ত চলে না? যামিনীর স্বামীর কাছে নিজের জন্য কোনও দাবীই ছিল ন
শুধু সামাজিক মানমর্য্যাদার হানি না ঘটিলেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন
কিন্তু সুরেশ্বরের সকল বিষয়েই সংযম ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতেছিল
লোকসমাজেও বেশী দিন তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, এ ভ
যামিনীর মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

সুরেশ্বরের মনোভাবটা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। স্ত্রীকে তি
ভালবাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন না, কিন্তু যামিনী যে ইহা লইয়
দিনরাত মাথা কোটেন না, হা-হুতাশ করেন না, ইহা তিনি সহ্য করিতে
পারিতেন না। তিনি যখন স্ত্রীকে কাছে ডাকিবেন, সে যে বর্ত্তিয়া গিয়
তখনই আসিয়া জুটিবে না, ইহাও তাঁহার অসহ্য ছিল। তাঁহাদের বনিয়াদ
জমিদার-বংশ, এ বংশে স্ত্রীর মূল্য কোনওদিনই ছিল না, কিন্তু স্ত্রীদের কাছে
স্বামীদের মূল্য ছিল যথেষ্ট। যামিনী এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্র
ঘটানোতে সুরেশ্বর কিছুমাত্র খুশী হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্ত্রীর উপ
জোর খাটাইবার ভরসা তাঁহার ছিল না। যামিনীর সম্বন্ধে আর কোন
মনোভাব তাঁহার থাক বা না থাক, ভয়-খানিকটা ছিল। সুতরাং কথ
দিয়া বিঁধিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও শাস্তি স্ত্রীকে তি
দিতে পারিতেন না।

যামিনী মিনিট-পাঁচ বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দুধ-টুধ একটু কি
খেলে হ'ত না? একেবারে সারাটা রাত না-খেয়ে থাকবে?"

সুরেশ্বরের রাগ ইহারই মধ্যে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। তি
আবার বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। উদাসীন ভাবে বলিলেন,
"তাই দাও গে পাঠিয়ে। একেবারে ঠাণ্ডা জলের মত যেন নিয়ে না
আসে।"

যামিনী উঠিয়া গেলেন। বিন্দুকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের জন্য দুধ গরম করিয়া পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তাহার পর নিজের শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রাত ঢের হইয়াছে, এখন শুইয়া পড়িলেই হয়। সুরেশ্বর যদি বেশী অসুস্থ হইয়া পড়েন, এই একটা আশঙ্কা তাঁহার হইতে লাগিল। তাঁহার ঘরে গিয়া থাকিবেন কিনা, যামিনী একবার ভাবিয়া দেখিলেন। কিন্তু পাছে আবার তর্কাতর্কি বাধিয়া গিয়া তাঁহার অসুস্থতা বাড়িয়া উঠে, সে ভয়ও ছিল। একটা চাকরকে ডাকিয়া সিঁড়ির মুখে শুইতে বলিয়া, যামিনী নিজের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাত্রে ঘুম হোক বা নাই হোক, সকালে তিনি উঠিতেনই। আজ উঠিয়া একেবারে বাগানে চলিয়া গেলেন। নিতা-ঝিকে বলিয়া গেলেন, আজ চা খাইতে তাঁহার বিলম্ব হইবে, সুতরাং এখনই গিয়া যেন হাঁকডাক না বাধায়। সুরেশ্বর যদি জাগেন, তাহা হইলে যেন যামিনীকে খবর দেওয়া হয়। সুজিতের ঘরের দরজা খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সেখানে তখনও মাঝরাত্রি।

বাগানটি প্রকাণ্ড বড়। মমতার বাগানটির প্রতি বড় টান। বাবাকে বলিয়া সে প্রায়ই নূতন গাছ আনায়, গাছ লাগায়, বাগানের যথারীতি যত্ন না হইলে মালীদের যথাসাধ্য বকুনি দেয়। এখানটি অত্যন্ত নিরিবিলি বলিয়া যামিনী স্থানটিকে খুবই পছন্দ করেন, তবে অতটা টান নাই। আজ চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক দিনও হয় নাই, মমতা একটু চোখের আড়াল হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহার কেমন যেন বুকের ভিতরটা খালি খালি বোধ হইতেছে। এই মেয়েকে চিরদিনের জন্য সুরেশ্বর এখনই বিদায় করিয়া দিতে চান? যামিনী তাহা হইলে আর কি এ সংসারে টিঁকিতে পারিবেন? কিন্তু অন্য

কোথাও তাঁহার স্থান ত নাই? এই ভাবে এইখানেই পড়িয়া থাকা ছাড়া তাঁহার আর গতি আছে কি?

কিন্তু আজই না-হয় শুধু সুরেশ্বর মমতার বিবাহ দিতে চাহিতেছেন বলিয়া তিনি জোর করিয়া বাধা দিতেছেন। হয়ত এ বিবাহ তিনি বন্ধও করিতে পারিবেন। কিন্তু মমতা নিজে যখন কাহাকেও বরণ করিবে, তখনও কি যামিনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন? তাহাই কি তিনি চাহিবেন? না, না, কন্যার বিচ্ছেদে তাঁহার হৃদয় শতধা ভাঙিয়া গেলেও তিনি মমতার সুখের পথে দাঁড়াইবেন না। সে যদি নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হয়, তাহা হইলে যামিনীর নিজের রিক্ত জীবনের লজ্জাও যেন অনেকটা ঢাকিয়া যাইবে। কিন্তু মমতাকে তিনি আর কাহারও আভিজাত্যের অভিমানের খাতিরে ভাসাইয়া দিতে পারিবেন না। সে দরিদ্রের গৃহে যদি ভালবাসিয়া যাইতে চায়, তাহাতে যামিনীর আপত্তি নাই, কিন্তু প্রেমহীন স্বর্ণ-শৃঙ্খল যেন তাহার গলায় কেহ না পরাইয়া দেয়।

কাল যে মানুষগুলির আগমন ঘটিবে, না জানি তাহারা কেমন? বেশী আশা যামিনীর ছিল না, তবু চোখেও না দেখিয়া একেবারে একটা মত গড়িয়া তুলিতে তিনি চাহিলেন না। দেখাই যাক। ছেলে সঙ্গে আসিবে কিনা কে জানে? ছেলের বাপকে দেখিয়া ত বুঝা যাইবে না ছেলেটি কেমন?

যাহা হউক, আজই সন্ধ্যার পর চিঠি লিখিয়া মমতাকে তাহার মামার বাড়ী হইতে আনাইয়া লইতে হইবে। প্রভা হয়ত ঠাট্টা করিবে, কিন্তু উপায় ত নাই? এখনও অন্ততঃ বছর-তিনের ভিতর বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নাই, জানিলে মমতা বেশী বাঁকিয়া বসিবে না। সুরেশ্বরকে

বেশী চটাইতে এখন যামিনীর সাহস হইতেছিল না। ডাক্তারে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা রকম আশঙ্কা করিতেছিল, এখন তাঁহাকে অধিক উত্তেজিত না করাই ভাল।

এমন সময় নিত্য আসিয়া খবর দিল যে বাবু উঠিয়া গৃহিণীর খোঁজ করিতেছেন।

যামিনী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলেন।

৬

মামার বাড়ী আসিয়া গুছাইয়া বসিবার আগেই মা তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়া হাজির হওয়ায় মমতা অত্যন্ত চটিয়া গেল। বাড়ীতে ত টেঁকা দায়, একটা কথা বলিবার মানুষসুদ্ধ সেখানে নাই। আবার বাড়ী হইতে বাহির হইলেও কাহারও সয় না, এ এক আচ্ছা জ্বালা!

সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "আজকেই যাব কেন? এই ত সবে এলাম। বাবার আমায় কি দরকার শুনি?"

শুধু চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে, বা অন্য কাহাকেও পাঠাইলে মমতা পাছে না-আসে বা বেশী রকম রাগারাগি করে, এই ভয়ে যামিনী চা খাওয়া হইয়া যাইবার পর নিজেই তাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। মমতার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "বিশেষ দরকার না থাকলে শুধু শুধু তোমাকে বিরক্ত করবার জন্যেই কি আর নিতে এসেছি মা? তুমি না গেলে তোমার বাবা বড় বিরক্ত হবেন। আজ চল, আবার না-হয় দু-চার দিন পরে এস।"

মমতা আর কিছু না বলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে চলিয়া গেল। প্রভা যামিনীকে খাতির করিয়া বসাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি ঠাকুরঝি? ছেলেমানুষ এসেছে, অমনি তাকে সাত-তাড়াতাড়ি হিঁচড়ে নিয়ে চল্লে কেন?"

যামিনী বলিলেন, "মেয়ের বাপের খেয়াল, আমি কি করব বল?"

প্রভা ব্যাপারখানা ঠিক আন্দাজ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখতে আসবে বুঝি কেউ?"

যামিনী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন তাহাই বটে। এ-বিষয়ে বেশী কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার না থাকিলেই বা কি আসিয়া যায়? প্রভার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সে ব্যগ্রভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "নিশ্চয়ই রাজা কি জমিদার? নইলে ঠাকুরজামাই এত ব্যস্ত কি আর সাধে হয়েছেন?"

যামিনী বলিলেন, "আমার এইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবার মোটেই ইচ্ছে নেই। নিতান্ত ওঁর জেদে মেয়ে দেখানো হচ্ছে। রাজা কি জমিদার সে-সবের খোঁজও করি নি কিছু। বেশী টাকাকড়ি নেই বোধ হ'ল ওঁর কথা থেকে।"

প্রভা বিজ্ঞভাবে বলিল, "হ্যাঁ, টাকা না থাকলে আর তোমার কর্ত্তাটি এগোতেন কি না? কিন্তু তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে চাও না কেন এখন? ছেলেবেলা দিয়ে দেওয়া ভাল ভাই, তখন মেয়েদের অত স্বাধীনতা বাড়ে না। তার পরে কে কাকে পছন্দ ক'রে বসবে তার ঠিক কি?"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "নিজে ত স্বাধীন ভাবেই বিয়ে করেছ, তাতে খুব ঠকেছ ব'লেও মনে হয় না। তবে নিজে বিয়ে করার উপর অত চটা কেন?"

প্রভা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি ঠকি নি ব'লে কি আর কেউ ঠকে নি? হাজারটা দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

যামিনী বলিলেন, "দৃষ্টান্ত আর কিসের নেই বল? মা বাপে বিয়ে দিয়েছে, এমনও লাখ মেয়ে অসুখী হয়েছে, তারও কি দৃষ্টান্ত নেই?

তবু আমি নিজের নিজের কপাল নিজে বেছে নেওয়ারই পক্ষপাতী।”

এমন সময় মমতা আর লুসি আসিয়া পড়ায়, আলোচনাটা থামিয়া গেল। মমতাকে যখন এ-বাড়ীতে থাকিতেই দেওয়া হইবে না, তখন সে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ লুসিকে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছে। একটা কথা বলিবার লোক তাহার থাকা চাই ত?

যামিনীকে বলিল, “মা, আমি কিন্তু লুসিকে নিয়ে যাচ্ছি।”

যামিনী বলিলেন, “আমার আর তাতে কি আপত্তি? তোমার মামীমাকে বলেছ?”

মামীমাকে তখন অবধি বলা হয় নাই। লুসি নিজেই চীৎকার করিয়া বলিল, “মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু। তুমি যে বলেছিলে আমায় সাত দিন পিসীমার বাড়ী গিয়ে থাকতে দেবে?”

প্রভা বলিল, “তা পোঁটলা-পুঁটিলি যখন গুছিয়েই নিয়েছ, তখন মা আর না বলে কি ক'রে? দেখো, পিসীমাকে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে জ্বালিয়ে তুলো না।”

যামিনী বলিলেন, “হ্যাঁ, ওরা আবার আমাকে জ্বালাবে। একটু হুড়োহুড়ি কেউ করলেই আমি বাঁচি; বাড়ীটাতে একটা টুঁ শব্দসুদ্ধ কেউ করে না।”

প্রভা বলিল, “তাই নাকি? হুড়োহুড়ির খুব দরকার বুঝি? দুটোই বড় হয়ে গেছে যে, না?”

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, “বড় হওয়ার জন্যে নয়। বড় ছেলে-মেয়েতেও কি আর হুড়োহুড়ি করে না? তা খোকার ত বাড়ীতে মনই টেঁকে না, আর মমতা সঙ্গীর অভাবে কি করবে ভেবেই পায় না।”

এমন সময় লুসির ছোট ভাই বেটু আসিয়া উপস্থিত হইল। মমতা এবং লুসি দু-জনেই কাপড়-চোপড় লইয়া যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিল, "কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে?"

লুসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমি পিসীমার বাড়ী যাচ্ছি, সাত দিন পরে আসব।"

যামিনী বলিলেন, "তুমিও চল না বেটু, অনেক দিন ত পিসীমার বাড়ী যাওনি?"

বেটু ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিল, "গিয়ে কি করব? খোকাদা ত সারা দিন চাল মারবে, আর দিদিরা যত স্কুলেরই টীচারের গল্প করবে।"

ছেলের যশ এতদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়াছে দেখিয়া যামিনী গম্ভীর হইয়া গেলেন। [illegible] তাড়া দিয়া বলিল, "আহা, কিবা কথার ছিরি! ধেড়ে ছেলে [illegible] ও কার সামনে কি বলতে হয়, না-হয়, সে আক্কেলটা হ'ল না।

যামিনী বলিলেন, "আমার সামনে বলেছে তাতে আর কি হয়েছে? আমি ত নিতান্ত পর নই? সত্যি; সুজিতকে উনি কি যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা উনিই জানেন। দিনের দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে!"

আর অপেক্ষা করিবার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না। মমতা আর লুসিকে লইয়া যামিনী গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। লুসি আর মমতা কি একটা বিষয়ে এমন গভীর আলোচনা জুড়িয়া দিল, যে, অতখানি পথ কোথা দিয়া যে পার হইয়া গেল, তাহার ঠিকানাই রহি[illegible] না।

মেয়ে পাছে আসিতে রাজি না হয়, সে-ভয়টা সুরেশ্বরের একটু ছিল বোধ হয়। দেখা গেল, ইহারই মধ্যে তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন এবং স্নানের জন্য চাকরকে হাঁকডাক করিতেছেন।

লুসি বলিল, "ও কি পিসেমশাই, এত গরমেও তুমি গরম জলে স্নান কর নাকি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তোদের সব তাজা রক্ত, গরম জলটলের দরকার হয় না। আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে কিনা, সারাক্ষণই বাইরে থেকে তাতে তাপ যোগাতে হয়। তা, তুই এসেছিস বেশ হয়েছে," বলিয়া তিনি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

মমতা লুসিকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া হাজির করিল। শোয় সে মায়েরই সঙ্গে বটে, তাই বলিয়া তাহার নিজের একটা ঘরের অভাব নাই। এ-ঘরে তাহার জিনিষপত্র, পড়ার বই, ইত্যাদি সব থাকে। আলনাতে লুসির কাপড়-চোপড় রাখিয়া সে বলিল, "এখনও ত বেশী রোদ হয় নি, বেশ মেঘলা ক'রে আছে। চল না, বাগানে একটু ঘুরে আসি।"

দু-জনে বাগানে ঘুরিতে চলিল। যামিনী উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে দুটো ছাতা নিয়ে যা। আবার রোদ লাগিয়ে অসুখ-বিসুখ করিস না।"

মমতা বলিল, "না মা, একটু রোদ উঠেছে দেখলেই আমরা পালিয়ে আসব। ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরতে আমার ভাল লাগে না।"

যামিনী নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। বিকালের জলখাবারের সব আয়োজন ঠিক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য নিত্যকে দিয়া বিন্দু-ঠাকুরঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দু-জনে কথা হইতেছে এমন সময় তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে সুরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যামিনী মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কি, তুমি এমন সময়ে কি মনে ক'রে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "কেন, আমার আসায় অপরাধ হ'ল কি? যোগাড়-যাগাড় কি করেছ তাই দেখতে এলাম, শেষ মুহূর্ত্তে আবার একটা গণ্ডগোল না বাধে।"

যামিনী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এমন কি রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার, যে, একলা আমি সাম্‌লাতে পারব না?"

কাহাকেও বিরক্ত হইতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দশগুণ বিরক্ত হইয়া উঠাই ছিল সুরেশ্বরের স্বভাব। তিনি অনেকখানি গলা চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই যদি পারবে, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? বলি, আইসক্রীমে ডিম যেন না দেয় সেটা ব'লে দিয়েছ কি? না, শেষ মুহূর্ত্তে সব পণ্ড হবে? তার পর তোমার আর কি? বললেই হ'ল আমার মনে ছিল না"

যামিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সুরেশ্বরের কথায় এতদিন পরেও তাঁহার যে মনে লাগিত ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সত্যই, বহুদিনের অভ্যাসেও অনেক জিনিষ তাঁহার সহিয়া যায় নাই। কিন্তু জানিতেন এখন কথা বলিলে সুরেশ্বর আরও উত্তেজিত হইবেন এবং আরও চীৎকার করিবেন। সুতরাং উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিন্দু তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ্বরের আরও কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যামিনীকে খুব বেশী চটাইতে তাঁহার ভরসা হইল না। কি জানি, যামিনী যদি রাগিয়া এমন কিছু করিয়া বসেন, যাহাতে সব কাজ সত্যই পণ্ড হইয়া যায়? মেয়েও যে-রকম মায়ের হাত-ধরা। হয়ত ঠিক সময়ে বলিয়া বসিবে, আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে আমি যাইতে পারিব না। না-হয় চুল না বাঁধিয়া, সাজ-সজ্জা কিছুই না করিয়া গিয়া হাজির হইতেও পারে।

যাহারা আসিতেছে, তাহারা অবশ্য সুরেশ্বরের রূপার আকর্ষণেই আসিতেছে, মমতার রূপের আকর্ষণে নয়, তাহা হইলেও সুরেশ্বর যখন বলিয়াছেন, তাঁহার মেয়ে খুব সুন্দরী, তখন তাঁহার কথার মর্য্যাদারক্ষা যাহাতে হয়, সে চেষ্টাও করা কর্ত্তব্য।

অতএব স্ত্রীকে আর খোঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া তিনি মাথা মুছিতে মুছিতেই বাহির হইয়া চলিলেন। দরজার ওপার হইতে বলিলেন, "ওবেলা মমতার চুলটুলগুলো নিজে বেঁধে দিও, যেন ভূত সেজে গিয়ে হাজির না হয়। নিজে ত এখনও কিছুই ঠিক ক'রে করতে পারে না।"

যামিনী এবারেও তাঁহার কথার উত্তর দিলেন না। আইসক্রীমে যে ডিম দিতে বারণ করিতে হইবে, এ-কথা বলিতে সত্যই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গোপেশবাবু নাকি অতি ভয়ানক সনাতনপন্থী। ডিম তাঁহাদের রান্নাঘরের চৌকাঠ পার হইতে পারে না। পেঁয়াজ খাইতেও তাঁহার মাঝে মাঝে আপত্তি হয়, তবে সব সময় নয়। কাজেই রান্নাবান্না খুব সাবধান হইয়া করিতে হইবে। ছেলেকে যদিও বড় চাকরি জুটিবার আশায় তিনি বিলাত পাঠাইতেছেন, তবু সে একেবারে বেহাত না হইয়া যায়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বিবাহ করিয়া যাইতেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলে তাহাতে কিছুতেই রাজী হইল না। তবে বিবাহ তিনি বিশুদ্ধ হিন্দু পরিবারে স্থির করিয়া রাখিবেন, এবং ছেলে যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া এ স্থানেই বিবাহ করে, তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। সুরেশ্বরের হিন্দুত্বে একটুখানি যে খুঁৎ আছে, তাহা দশ হাজার টাকার গুণে তিনি ভুলিয়া যাইতে সম্মত হইয়াছেন। মেয়েটি যদি সত্যই খুব সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে ছেলেকে প্রতিজ্ঞাপালন করানো খুব কঠিন হইবে না, এ আশাও

তাঁহার আছে। প্রথম দিন অবশ্য ছেলে আসিবে না, তিনিই সনাতন প্রথামত দু-চার জন আত্মীয়বন্ধু লইয়া কন্যা দেখিয়া যাইবেন। দুই-চার দিন পরে সুরেশ্বর দেবেশকে নব্যপ্রথামত চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিবেন। তাহার পর কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হইয়া গেলে একবার ঘটা করিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইবে, ইহাই এখন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

লুসি আর মমতা বাগানে গিয়া, ফুল কুড়াইয়া, ফল পাড়িয়া খাইয়া, গাছে ঝোলানো দোলনায় দুলিয়া যথারীতি ফুর্ত্তি করিতে লাগিয়া গেল। লুসি ত প্রায় বনের হরিণের মত উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের যে পাড়ায় বাড়ী, তাহাতে এখন আর এক ইঞ্চি খোলা জমি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের নিজের বাড়ীর সঙ্গে সেকালে একটুখানি খোলা জায়গা ছিল, লুসির বাবা মিহির তাহাও বহুকাল হইল টাকার লোভে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের বাড়ীর দুই পাশে দুখানি অভ্রভেদী বাড়ী, ছাদে না উঠিলে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লওয়া যায় না। একটা সবুজ পাতা বা একটা ফুল কোনওদিন তাহাদের চোখে পড়ে না।

মমতাদের বাগানটি ভারি সুন্দর। মালী আছে বটে, কিন্তু কাজে খুব বেশী উৎসাহ তাহার নাই। কাজেই বাগানটি দেখিলে কারখানায় গড়া সুরকি, কাঁচ ও কাঠের বাগান মনে হয় না। প্রাকৃতিক সহজ শ্রী ইহার ভিতর এখনও অনেকখানি ছড়ান আছে। গাছের তলায় ফুল ঝরিয়া পড়িলে, তখনই কেহ তাহাদিগকে ঝাঁট দিয়া বিদায় করে না, দূর্ব্বাঘাস আপন ইচ্ছামত এদিক-ওদিকে শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়া দেয়, কয়েক দিন অন্তত: 'রোলার' লইয়া কেহ তাহাকে নির্ম্মূল করিতে

ছুটিয়া আসে না। গাছের ফুল মুকুল হইতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে গাছেই থাকিয়া যায়, মূর্ত্তিমান্ যমের মত উড়ে মালী রোজ সকাল-বিকাল তাহাকে নির্ম্মম হাতে উপড়াইয়া লইয়া যায় না।

একটি বলরামচূড়া গাছে যেন ফুলের আগুন লাগিয়া গিয়াছে। মমতা আর লুসি তাহার তলায় আসিয়া ঝরাফুলের রাশির উপর বসিয়া পড়িল। লুসি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি-ভাই, তোমাকে ঠিক ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি ছবি আঁকতে জানলে তোমার ঠিক এই রকম একখানি ছবি এঁকে রাখতাম। মানুষ যখন সেজেগুজে ছবি তোলাতে বসে, তখন এমন কাঠপানা হয়ে যায় যে তাদের একটুও ভাল দেখায় না।"

মমতা লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা, যা, তোকে অত কবিত্ব করতে হবে না। চিত্রকর না হোস, কবি তুই হবিই।"

লুসি বয়সে মমতার চেয়ে মাত্র এক বৎসরের কি দেড় বৎসরের ছোট হইবে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় ঢের পাকা। সে বলিল, "তোমাকে দেখলে ভাই অকবিও কবি হয়ে যায়, আমি ত তবু একটু ভাবুক আছিই।"

মমতা তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা, ভারি বাক্যবাগীশ হয়েছিস্।"

লুসি বলিল, "দিদি-ভাই, একটা কথা কিন্তু আমি লুকিয়ে শুনে ফেলেছি। তুমি যখন কাপড় গুছোচ্ছিলে, তখন মা'তে আর পিসীমাতে কি কথা হচ্ছিল জান?"

মমতা চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি কথা রে?"

লুসি বলিল, "পিসীমা তোমাকে সাত-তাড়াতাড়ি কেন টেনে আনলেন জান?"

মমতা বলিল, "না ত। কেন?"

লুসি ঘাড় দুলাইয়া দুলাইয়া বলিতে লাগিল, "দিদির বর আসবে যক্ষুনি, দিদিকে নিয়ে যাবে তক্ষুনি। তোমায় দেখতে আসছে গো।"

মমতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কক্ষনো না। মা বুঝি আমাকে এখনই বিয়ে দেবেন।"

লুসি বলিল, "আহা, বিয়ে ত দেখাবা মাত্র হয়ে যাচ্ছে না? তার দেরী আছে।"

মমতার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "কক্ষনো আমি এখন বিয়ে করব না। আমি কলেজে পড়ব, এম্-এ পর্য্যন্ত। মা আমাকে কথা দিয়েছেন।"

লুসি বলিল, "তা পিসেমশাই যদি জোর করেন, তাহলে পিসীমা কি করবেন বল?"

মমতা বলিল, "আমি বিয়ে করবই না। বাবা ত আর আমার হাত পা বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন না?"

৭

আকাশ অন্ধকার করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের রাশ ফুলিয়া ফুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। যামিনী ঘরে বসিয়া কি একটা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দিনের আলো ম্লান হইয়া আসায় মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া লেখা রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, নিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ছুটে যা বাগানে, বিষ্টি এসে পড়ল ব'লে। মেয়ে দুটো একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে যাবে, ওদের ডেকে নিয়ে আয়।"

নিত্য আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমণি গো, শীগগীর চ'লে এস, ভয়ানক বিষ্টি নামছে।"

তাহার কাংস্যকণ্ঠস্বর ঠিক গিয়া পৌঁছিল মমতা আর লুসির কানে। গল্পে এবং তর্কে দুজনেই এমন মাতিয়া ছিল যে আসন্ন বৃষ্টির সূচনাগুলি তাহারা লক্ষ্যই করিতে পারে নাই। নিত্যর চীৎকারে চকিত হইয়া দুইজনেই উঠিয়া পড়িল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, নিকষ কালো মেঘের রাশ একেবারে মাথার উপর ঘনাইয়া নামিয়া আসিতেছে। কড়্ কড়্ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া বজ্রধ্বনি হইল, বিদ্যুতের তীব্র চমক তাহাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া মিলাইয়া গেল।

"ও ভাই, ছুটে চল", বলিয়া মমতা উঠিয়া প্রাণপণে দৌড় দিল, লুসিও তাহার পিছন পিছন ছুটিল।

কিন্তু বৃষ্টিকে হার মানাইতে পারিল না। বাড়ী তখনও বেশ খানিকটা দূর, তখনই ঝম্ ঝম্ শব্দে বর্ষারম্ভের বৃষ্টি তাহাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল।

মমতা এবং লুসির দেহ মনে পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল। আঃ, কি সুন্দর, কি ঠাণ্ডা! আরও প্রাণ ভরিয়া ভিজিতে পাইলে তাহাদের গা জুড়াইয়া যায়। কিন্তু বাপ-মায়ের উৎপাতে যাহা ভাল লাগে তাহা করিবার জো কি? কাজেই রঙীন আঁচল উড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে ভিজিতে ভিজিতে দুইজনে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। মমতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "বাবার সামনে পড়লেই গিয়েছি আর কি? ব'কে ভূত ঝাড়িয়ে দেবেন।"

লুসিও দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল, "তোমাদের বাপু সব অনাসৃষ্টি। এক ফোঁটা জল গায়ে পড়লে কি তোমরা গ'লে যাবে? আমরা সেবার মামাবাড়ীর গাঁয়ে গিয়ে এমন ভেজা [illegible]ছিলাম যে কি বল্‌ব। কিন্তু কই, মরি নি ত?"

যামিনী উদ্বিগ্ন ভাবে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেয়ে এবং ভাইঝির অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "শীগগীর উঠে আয়। একবারে চান ক'রে কাপড়চোপড় বদলে ফেল্। তার পর গরম দুধটুধ [illegible] একটু খা।"

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সুরেশ্বর যে তাহাদের দেখিতে পান নাই, ইহাতে শুধু অপরাধিনীদ্বয় নয়, যামিনীও খানিকটা আরাম বোধ করিলেন। সুরেশ্বরের মেজাজ কোনওকালেই ভাল ছিল না, এখন ত সারাক্ষণ সপ্তমে বাঁধা হইয়া আছে। পান হইতে চূন

খসিলেই তিনি হাঁউমাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া সারাবাড়ী মাথায় করিয়া তোলেন। যামিনী এই জিনিষটি একেবারে সহ্য করিতে পারেন না, কাজেই চীৎকারের কারণ যাহাতে না ঘটে, তাহার প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়া চলেন।

মেয়েরা স্নান সারিয়া আসিতেই তিনি নিজে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মমতা লুসিকে লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া একটা শেলাইয়ের প্যাটার্ন শিখিতে বসিয়া গেল।

সুরেশ্বরের আজ মনে শান্তি ছিল না। যতক্ষণ না মেয়েদেখানো ভালয় ভালয় উৎরাইয়া যায়, ততক্ষণ তাঁহার ছটফটানি যাইবে না। স্ত্রী যে তাঁহাকে সাহায্য করার বদলে তাঁহার কাজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিঘ্নই ঘটাইবেন, এ ধারণাও কিছুতেই তাঁহার মন হইতে যাইতে চায় না। আবার যামিনীকে নিজের এই অবিশ্বাস পুরাপূরি জানিতে দিতেও তাঁহার ভয় করে। খানিক নিজের ঘরে গিয়া বসেন, আবার যামিনীর ঘরের দিকে আসিয়া হাজির হন।

মমতাদের আলোচনায় বাধা দিয়া, তিনি হট্ করি. একবার ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার? তোর মা কোথায় রে?"

মমতা মুখ তুলিয়া না চাহিয়াই গম্ভীরভাবে বলিল, "মা চান করতে গেছেন।"

মমতার মুখের ভাব দেখিয়াই সুরেশ্বর বুঝিলেন, মমতা আজকার ব্যাপারের বিষয় সব শুনিয়াছে, এবং তাহার খবরটা ভাল লাগে নাই। চীৎকার করিয়া খানিকটা বকাবকি করিতে পাইলে তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু কাহাকে বকিবেন? যামিনী ত নিশ্চিন্ত মনে স্নানের ঘরে খিল দিয়া আছেন। মমতাকে বকা সুরেশ্বরের সাধ্যে কুলায় না। কন্যাকে

যেমন তিনি ভালওবাসেন অতিরিক্ত রকম, তেমনই ভয়ও খানিকটা করেন। তাহার চোখে নীচু হইতে সুরেশ্বরের একান্ত আপত্তি। সুজিত কাছে নাই, না হইলে তাহাকে বকিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।

শুধু বলিলেন, "খেয়ে-দেয়ে যেন সারা দুপুর হৈ-রৈ ক'রে ঘুরে বেড়িও না. শরীর খারাপ হবে। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা বিশেষ দরকার।"

সুরেশ্বর চলিয়া যাইতেই লুসি বলিল, "দিদি, পিসেমশায়ের ভয় হয়েছে, পাছে তোকে খুব সুন্দর না দেখায়।"

মমতা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "সুন্দর না দেখালেই আমি বাঁচি। আমাকে পছন্দ না ক'রে ফিরে যায় ত বেশ হয়।"

মমতার রূপের মহাভক্ত লুসি। নিজের চেহারায় তাহার বিশেষ রূপের বালাই নাই, তাই সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার লোভও যেমন শ্রদ্ধাও তেমন। তাঁহার কাছে সুন্দর হইলে মানুষের সাত খুন মাপ। মমতার কথা শুনিয়া সে বলিল, "ইস্, তোমাকে আবার পছন্দ না ক'রে ফিরে যাবে! হাঁড়ির কালি মেখে চটের কাপড় প'রে গেলেও না। বাংলা দেশে তোমার মত চেহারা অলিতে-গলিতে গড়াচ্ছে কি না?"

নিজের রূপের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মমতা যে একেবারেই খুশী হইল না, তাহা নহে। তবে মুখে সেটা ত আর প্রকাশ করা যায় না? কাজেই গম্ভীর ভাবেই বলিল, "আহা, রূপ ত কত!"

লুসি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "আচ্ছা দিদিভাই, সত্যি ক'রে বল্ ত, তোর বিয়ে করতে একেবারেই ইচ্ছে করে না? না ও-সব ঢং? বলতে হয় ব'লে বলিস্?"

মমতা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া খানিক বসিয়া রহিল। একেবারে

সত্য কথা কি বলা যায় ? আর নিজের মন নিজেই কি সে ভাল করিয়া জানে ? কখনও মনে হয় এক রকম, কখনও মনে হয় আর এক রকম। বিবাহ একেবারেই করিতে সে চায় না, ইহা একেবারেই ঠিক নয়। ষোল-সতের বৎসরের এমন মেয়ে বাংলা দেশে কোথায়, যে মনে মনে এই রঙীন স্বপ্নটি দেখে না ? তাহার হৃদয়ের গোপন ঘরে সেই চিরকালের রাজ-কন্যা বসিয়া বিনি-সূতার মালা কি গাঁথিতেছে না ? সে মালা কাহার গলায় পড়িবে, তাহা ত সে জানে না এখনও। কত বার সেই চিরকালের রাজপুত্রের মুখ কত রকম রূপে সে দেখিয়াছে। কিন্তু আজও দিনের আলোয় স্পষ্ট করিয়া সে তাহাকে চেনে না।

লুসি বলিল, "কেমন, এখন চুপ মেরে যেতে হ'ল ত ? হুঁ বাবা, পথে এস। অমন বক-ধার্ম্মিক সবাই সাজে।"

মমতা বলিল, "মোটেই আমি বক-ধার্ম্মিক নই। একেবারে বিয়ে করব না, এমন কথা ত আমি কোন দিন বলি নি ? তাই ব'লে এখন করব কেন ? লেখা-পড়া শিখলাম না, মানুষ হ'লাম না, এখনই বোকার মত বিয়ে ক'রে বসি। তার পর চিরজীবন ধ'রে খালি দাঁতখিঁচুনি খাই।"

লুসি বলিল, "কেন, ছোট বয়সে বিয়ে করলেই বুঝি দাঁত-খিঁচুনি খেতে হয় ? এই ত আমার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল এগার বছরে, তিনিই ত সারাক্ষণ দাদুকে বকুনি দেন।"

মমতা লুসিকে থামাইবার আর কোনও উপায় না দেখিয়া উল্টা আক্রমণ করিল। বলিল, "ও, তোমার বুঝি ভারি বিয়ের সখ, তাই আমাকে এত ক'রে ভজাচ্ছ ? তা বেশ ত চল না, আজ তোমাকেই দেখিয়ে দেওয়া যাক। পছন্দ করে ত বেশ, তোমাকেই ওদের ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে।"

লুসি বলিল, "তা আর না? আমি অমনি গেলাম আর কি তাদের সামনে? আমাকে তারা পছন্দ করবেই বা কেন? যা না কেলে মূর্ত্তি? তা ছাড়া আমি ত ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে।"

মমতা বলিল, "তাতে কি? মাও ত ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে?"

লুসি বলিল, "পিসীমার মত চেহারা থাকলে আর ভাবনা ছিল কি? সমাজ-টমাজ ভুলে মানুষ লেজ তুলে দৌড়ে আস্ত। পিসেমশাই যা ক'রে পিসীমাকে বিয়ে করেছিলেন, তা বুঝি জান না?"

মায়ের বিবাহের অত ইতিহাস মমতার জানা ছিল না। লুসি তাহার মায়ের কাছে অনেক কথাই শুনিয়াছে। মমতাকে শুনাইতে তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই সময় যামিনী স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসায় তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল।

আজও খাওয়া-দাওয়া সকাল-সকাল সারিয়া, চাকরবাকরকে সময়-মত ছাড়িয়া দিতে হইবে। না হইলে, তাহারা বিকালের জলযোগের আয়োজনে যথাকালে লাগিতে পারিবে না। কাজেই স্নানের পরে সকলে এক সঙ্গেই খাইতে বসিয়া গেলেন। সুরেশ্বরও সুজিতকে লইয়া এই সঙ্গেই বসিলেন। নিজে অবশ্য মাছের ঝোল ভাত ভিন্ন আর কিছু খাইলেন না। সুজিত লুসিকে দেখিয়া ভদ্রতার খাতিরে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বেটু এল না কেন?"

লুসি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কে জানে!"

খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েদের শুইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া সুরেশ্বর নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেলেন। যামিনী বিন্দুকে ডাকিয়া কি কি করিতে হইবে, কেমন ভাবে করিতে হইবে তাহা আরও একবার বলিয়া দিলেন। নীচের বড় ড্রইং-রুম্‌টা চাকর ভালভাবে পরিষ্কার করিয়াছে

কিনা, তাহা নিজে একবার গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মালীকে তিনটার সময় ফুল আনিতে বলিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে আবার উপরে উঠিয়া আসিলেন।

দিনের বেলা তিনি কোনওদিনই ঘুমাইতেন না, আজও ঘুমাইলেন না। সুরেশ্বর বলিয়াছেন মমতাকে খুব ভাল করিয়া সাজাইয়া দিতে, কি ভাবে সাজাইবেন তাহাই যামিনী ভাবিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর অবশ্য চান যে মেয়েকে হীরা-মুক্তা-কিংখাবে একেবারে মুড়িয়া ফেলা হয়। তাহাতে মেয়ের বাপের টাকা অনেক আছে তাহা বুঝা যাইবে বটে, কিন্তু মমতা বেচারীকে ত দেখাই যাইবে না। যামিনীর পছন্দ-মত সাজাইলে মেয়েকে দেখাইবে ভাল বটে, তবে সুরেশ্বর চটিয়া যাইবেন। মমতারও ত একটা মতামত আছে? তাহাকেই না-হয় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা যাক। সে নিজের ইচ্ছামত সাজিলে সুরেশ্বর বেশী কিছু বলিবার সুবিধা করিতে পারিবেন না।

পিতার আজ্ঞামত মমতা শুইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমায় নাই যে তাহা বলাই বাহুল্য। খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকালে কোন্ শাড়ীখানা পরবি রে?"

মমতা কিছু বলিবার আগেই লুসি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সেই ওর পাসের খাওয়ার দিন যে শাড়ী আর যে গহনাগুলো পরেছিল, তাই পরিও পিসীমা। অত সুন্দর আর ওকে কোনও পোষাকেই দেখায় না।"

বিবাহ করিতে যত অমতই থাক, সাজিতে মমতার বিশেষ কিছু অমত ছিল না। সে বলিয়া উঠিল, "না মা, তোমার বৌভাতের সেই বেগুনী রংএর শাড়ীটা পরব, ওটা আমার একবারও পরা হয় নি। আর সেই বড় বড় মুক্তোর মালাটা।" তাহাই হইল। মমতার সামনে যামিনী তাঁহার

কাপড়ের আল্‌মারী ও গহনার বাক্স খুলিয়া [illegible]লেন। সে যাহা খুশী তাহা বাছিয়া লইল। মোটের উপর দেখা [illegible] চুল বাঁধিতে জানুক বা নাই জানুক, নিজের সুন্দর রূপকে সুন্দরতর [illegible] কি কি প্রয়োজন তাহা মমতার বেশ জানা আছে।

তাহার পর গা ধুইয়া আসিয়া মমতা মায়ের কাছে চুল বাঁধিতে বসিল। লুসি যামিনীকে সাহায্য করিতে লাগিল। গহনা মমতা খুব বেশী পরিল না, কিন্তু যাহা পরিল তাহা একেবারে বাছাই-করা জিনিষ, সুরেশ্বরের পিতামহীর আমলের জড়োয়া গহনা। মেয়ের কপালে ছোট একটি কুঙ্কুমের টীপ পরাইয়া দিয়া যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু-পায়ে যাবি, না নাগরা জুতো পরবি? শুধু-পায়ে যাস্ ত নিত্যকে বলি আল্‌তা পরিয়ে দিতে।"

মমতা আল্‌তা পরিতেই চায়। লুসি বলিল, "দিদিকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক রূপকথার রাজকন্যা!"

যামিনী ভাইঝির উচ্ছ্বাসে একটু হাসিলেন, কোনও কথা বলিলেন না।

লুসি মমতার মুখখানা একবার ডান-পাশে একবার বাঁ-পাশে ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিল, "তোমার কাছে কি লিপ্‌ষ্টিক্ আছে পিসীমা, একটু দিয়ে দিলে হ'ত দিদির ঠোঁটে, বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।"

যামিনী বলিলেন, "রূপকথার রাজকন্যাতে কি 'লিপ্‌ষ্টিক্' লাগায় রে? ওসব পাট আমার নেই।"

লুসি লজ্জিত হইয়া আর কিছু বলিল না। আজ[illegible] ঘরে-ঘরেই ত 'লিপ্‌ষ্টিক' ও 'রুজের' চলন, ইহাতে আপত্তি যে কেন পিসীমার, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

সাজগোজ সারিয়া মমতা চুপ করিয়া পাখার তলে বসিয়া রহিল, [illegible]

ফেরা করিতে গিয়া পাছে ঘামিয়া উঠে। লুসি তাহার পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। যামিনী উঠিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া গেল। মেঘলা দিন, একেবারে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মমতা একবার লুসিকে বলিল, "তুই চুল বেঁধে, কাপড় ছেড়ে নে না ভাই, তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারবি। একলা যেতে আমার ভয়ানক লজ্জা করবে।"

লুসি বলিল, "তা আর না? আমি গেলাম আর কি? একেই ত এই চেহারা, তার উপর তোমার ঐ ইন্দ্রাণীর মত মূর্ত্তির পাশে আমাকে যা দেখাবে তা আর ব'লে কাজ নেই।"

অগত্যা যথাকালে মমতাকে একলাই যাইতে হইল। অবশ্য সুজিত তাহাকে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিল। তাহার হাতে রূপার ডিবায় পান। পান না লইয়া কোনও কনেকেই দেখা দিতে যাইতে নাই, অতএব মমতাও একটা পানের ডিবা হাতে করিয়া আসিয়াছে।

তাহার সামনেই একখানা বড় চেয়ার সম্পূর্ণ ভরিয়া একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। মাথায় মস্ত বড় টাক, কিন্তু সুপুষ্ট গোঁফাজাড়া অনেকটা মাথার কেশের অভাব পোষাইয়া লইয়াছে। পাশের সোফায় আরও দুইটি ভদ্রলোক বসিয়া, ইঁহাদের বয়স কিছু কম। আর একটা চেয়ারে সুরেশ্বর। ঘরে এই চারিটি মানুষ। সকলে যে অতি উত্তমরূপে জলযোগ করিয়াছেন, তাহারর চিহ্ন এখনও এদিকে ওদিকে বর্ত্তমান।

মমতা ঢুকিতেই সুরেশ্বর বলিলেন, "পান ঐ টেবিলের উপর রাখ মা! গোপেশ বাবু, এইটিই আমার মা লক্ষ্মী।"

গোপেশ বাবু পরম আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বোসো

মা, বোসো। রাজ-নন্দিনী ত রাজনন্দিনীই বটে। তোমার নামটি কি মা?"

মমতা নাম বলিল। তাহাকে এমন একটা 'সিলি' ব্যাপারের ভিতর আনিয়া ফেলায় সে বাপের উপর আবার চটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই তাহার নাম জানেন, শুধু শুধু জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন? সমস্ত ব্যাপারটাই যে শুধু শুধু, তাহা বেচারী মমতা জানিত না। সুরেশ্বরের টাকার থলিটা দেখা মাত্র গোপেশ বাবুর প্রয়োজন ছিল।

আবার প্রশ্ন হইল, "কতদূর পড়াশুনো করা হয়েছে মা লক্ষীর?"

মমতা বলিল, "এইবার ম্যাট্রিক পাস করেছি।"

গোপেশ বাবু পাশের এক ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ আমাদের ঢের, কি বল হে দক্ষিণা? একেবারে মেমসাহেব হ'লে আবার বাঙালী ঘরে চলে না।"

মমতা মনে মনে বলিল, "আহা, কিবা তোমার বুদ্ধি! ম্যাট্রিকের বেশী পড়লেই বুঝি মেমসাহেব হয়ে যায়।"

মমতা গান জানে কিনা সে খোঁজও হইল। তাহার পর তাহার ছুটি। সুজিত আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। উপরে আসিতেই লুসি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। মমতা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, অত হাস্‌ছিস্ কেন?"

লুসি বলিল, "বাপ রে, বরের বাপটি ত ঠিক সিন্ধুঘোটকের মত দেখতে: বরটিও ঐ রকম হলেই হয়েছে।"

৮

মমতাকে দেখিয়া গোপেশ বাবুর অত্যন্ত বেশী রকম পছন্দ হইয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার সুন্দরী পুত্রবধূর যে কিছু দরকার ছিল, তাহা নয়। রূপের চেয়ে রূপা যে ঢের বেশী স্থায়ী জিনিষ তাহা এতকাল এই পৃথিবীতে বাস করিয়া তিনি অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণী। তবে সব টাকাই নগদ পণরূপে পতিদেবতার হস্তগত না হইয়া, খানিকটা খানিকটা অন্ততঃ বরাভরণ, আসবাব, দানসামগ্রী হিসাবে তাঁহার ঘরে উঠিলে তিনি খুশী হন। মমতাকে গহনা দিতে যে মা বাবা কার্পণ্য করিবেন না, তাহা স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই ধরিয়া লইয়াছিলেন। মমতা একমাত্র সন্তান না হোক, একমাত্র কন্যা ত বটে? তাহাকে কি আর গা সাজাইয়া গহনা না দিয়া মায়ের মন উঠিবে? তবে নগদ দশ হাজার দিতেছে বলিয়া বরকে জিনিষপত্র বেশী দিতে যদি না চায়।

তবু মমতার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া অতখানি খুশী হওয়ারও একটা কারণ ছিল। দেবেশের মেজাজখানি বেশ সাহেবী ধরণের। এখন পর্য্যন্ত বাপ-মায়ের কথা সে খানিক খানিক শুনিয়া চলে বটে, কিন্তু বাপ-মাও এখন পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ অমত যাহাতে, এমন কিছু তাহাকে দিয়া করাইবার চেষ্টা করেন নাই। বিলাত যাইবার সখ তাহার অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বাপের এমন সংস্থান নাই যে তাহাকে পাঠাইতে পারেন। তাঁহার ছেলে

মাত্র ঐ একটি, কিন্তু মেয়ে আছে গুটি-পাচেক। তিনটির তাহার মধ্যে বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ দিতে অবশ্য দেশের জমিজমা বাড়ীঘর সবই মহাজনের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে। কলিকাতার বাড়ীটিও এবার হয় বাঁধা দিতে না-হয় বিক্রী করিতে হইবে, কারণ চতুর্থ কন্যাটিও প্রায় অরক্ষণীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ছেলেকে বিলাত পাঠাইবার খরচ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? অতি শুভক্ষণে এই বিবাহের প্রস্তাবটি আসিয়াছে। নামে মাত্র সুদে যদি সুরেশ্বর গোপেশ বাবুকে দশ হাজার টাকা ধার দেন, তাহা হইলে আপাততঃ সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। বাড়ী তিনি বাঁধা রাখিতে চান, তাহাতে ক্ষতি নাই। বিবাহ দেবেশ করিবে বলিয়াই মনে হয়। এখন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় বে-দখল হয় নাই বলিয়া তাহার পিতা-মাতার বিশ্বাস। সুতরাং মমতার মত সুন্দরী একটি তরুণীকে ভাবী পত্নীরূপে কয়েক দিন ধ্যান করিতে পাইলে, সহজে আর ঐ মানুষটিকে সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবে না। কয়েক দিন মেলামেশা করার সুবিধাও সে পাইবে। নিতান্ত বিলাতের মায়াবিনীদের মায়ার ফাঁদে পড়িয়া, সব-কিছু যদি ভুলিয়া না যায়, তাহা হইলে গোপেশ বাবু এবং তস্য গৃহিণীর ঐ দশ হাজার আর ফেরৎ দিতে হইবে না। কোনও দিক্ দিয়াই এতকাল এই দম্পতীটি আধুনিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু পৃথিবীতে অর্থের দরুন যত মতের পরিবর্ত্তন হয়, এতটা আর কিছুতেই হয় না। যে-গোপেশ-গৃহিণী বিবাহের আগে বর ও কন্যার চাক্ষুষ পরিচয় হওয়াকেও মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, তিনিও এখন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সুরেশ্বর এবং যামিনীকে বলিয়া-কহিয়া যদি খানিকটা হাল্কা রকম কোর্টশিপের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বিবাহটা নিশ্চিত ভাবে

ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়িয়া যায়। মমতা এবং দেবেশ যদি একটু চিঠি-লেখালেখিও করে, তাহাতেই বা কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়?

সুরেশ্বরের অবশ্য কোনও কিছুতেই আপত্তি ছিল না, মেয়ের বিবাহ হইলেই হয়। ডাক্তার আজকাল তাঁহাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন হইতেও পারে যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। তখন যামিনীর হাতে পড়িয়া মমতার কি গতি হইবে কে জানে? যা না তাঁহার অপূর্ব্ব মতামত! তাঁহার মত ধনী স্বামী পাইয়াও যামিনী যে সুখী হন নাই, সেটা সুরেশ্বর স্ত্রীর অতিবড় অপরাধ বলিয়াই ধরিতেন। মেয়ের বিবাহের ভার যদি যামিনীর হতে পড়ে, তাহা হইলে কোনও এক কপর্দ্দকহীন কেরানীর ঘরেই মমতাকে তিনি পাঠাইয়া দিবেন। মেয়েরও বুদ্ধিশুদ্ধি মায়েরই মত, সেও যে বিশেষ আপত্তি করিবে তাহা মনে হয় না। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে সুরেশ্বর আদরিণী কন্যার একটা সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে চান। সুজিতও নেহাৎ ছোট, তাহার উপর কিছু ভরসা করা চলে না। আর তাহার সহিত মা বা বোনের এখনই যখন বনিবনাও নাই, ভবিষ্যতে ত আরও থাকিবে না।

বিকালে জলযোগটা একটু গুরুতর রকমেরই হইয়াছিল, সুতরাং রাত্রির খাওয়াটা অতি সংক্ষিপ্ত করা দরকার। এই উপলক্ষ্য ধরিয়া সুরেশ্বর আবার আজ যামিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যামিনী তখন মমতার ছাড়া গহনাগুলি গুছাইয়া লোহার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিতেছিলেন। জিনিষগুলি অতি মূল্যবান্, বেশীক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে ভরসা হয় না।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া যামিনী একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনই করিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "খুকিকে দে'খে বুড়ো যা খুশী, একেবারে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি? সত্যি আজ ওকে ভারি চমৎকায় দেখাচ্ছিল।"

যামিনী অল্প একটু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

স্ত্রীর উৎসাহের অভাব দেখিয়া সুরেশ্বরের মেজাজ অল্পে অল্পে চড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এত শীঘ্রই চেঁচামেচি আরম্ভ করিলে আসল কাজে বাধা পড়িয়া যাইবে। অতএব যথাসাধ্য নিজকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "তার পর দেবেশকে কবে ডাকছ?"

যামিনী উদাসীন ভাবে বলিলেন, "আমার আর ডাকাডাকি কি? তোমার যেদিন সুবিধা তুমি ডেকো।"

সুরেশ্বর একটু বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "কেন, তুমি ডাকলে কি ক্ষতিটা? এ-সব কাজ বাড়ীর গিন্নিরা করলেই শোভন হয়।"

যামিনী একটু কঠোরভাবে বলিলেন, "বাড়ীর গিন্নির পছন্দ-মত ত সব ব্যবস্থাটা হচ্ছে না, তখন তাকে আর মাঝপথে টেনে আনা কেন? যা করতে চাও তা নিজেরাই কর।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "হুঁঃ; ঐ রাগেই গেলে। কেন আমার কি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবলে কোনও দোষ আছে? না, আমার ভাল-মন্দ জ্ঞান তোমার চেয়ে কম?"

যামিনী বলিলেন, "জ্ঞান, বেশী কি কম, সে আলোচনা ক'রে লাভ কি? তোমার আর আমার মতামত ত এক রকম নয়?"

সুরেশ্বর না রাগিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যথেষ্টই রাগিয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বর চড়াইয়া বলিলেন, "তা হোক আলাদা রকম। আমার মতে না হয় এবার কাজ হোক, বাংলা দেশে চিরকাল তাই-ই ত হয়ে আস্‌ছে?"

যামিনী বলিলেন, "দেখ, তোমার শরীর ভাল নেই, আমারও নেই। বাজে কথা নিয়ে রাগারাগি ক'রে কি হবে? দরকারী কথা কিছু থাকে ত বল, না-হয় যে যার চুপ ক'রে থাক। তোমার মতে তুমি যা খুশী কর, তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই, প্রবৃত্তিও নেই, এ ত তুমি ভাল ক'রেই জান?"

কাছে আসিলেই যামিনী যে তাঁহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিদায় করিয়া দিতে চান, ইহাতে সুরেশ্বর মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করেন, রাগও হয় তাঁহার অত্যধিক। কিন্তু এ অবস্থার কি প্রতিকার তাহা তিনি ভাবিয়া পান না। পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ থাকিলে এক দিনের অদর্শনই মানুষের কাছে ভীষণ হইয়া উঠে, তাহা এই দুইটি মানুষের মধ্যে একেবারেই নাই। অথচ স্ত্রীকে জীবন হইতে একেবারে বাদ দিলে সুরেশ্বরের এখনও চলে না, নানা দিকে এখনও যামিনীর উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। যামিনীর রকম দেখিয়া কিন্তু তাঁহার মনে হয়, সুরেশ্বরকে বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন তাঁহার কোনও দিক্ দিয়া নাই। এ অবস্থাটা স্বামীমাত্রেরই অত্যন্ত অসহ্য, সুরেশ্বরের ত বিশেষ করিয়া, কারণ, নিজের সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার অতি উচ্চ। স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ দরকার বলিয়া তাঁহার ধারণা, কিন্তু উপায় ত কিছু খুঁজিয়া

পান না? এক তাঁহার খাওয়া-পরা বন্ধ করা যায়, বা তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া আর একটা বিবাহ করা যায়, তাহা হইলে যামিনী একটু সায়েস্তা হন। কিন্তু সিভিল আইনের খপ্পরে পড়িয়া এমন ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি হইতেও সুরেশ্বর বঞ্চিত। তাহা ছাড়া সত্যই এ ধরণের কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবেই নাই। অত হাঙ্গাম পোহাইবে কে? আর মেয়েও যে তাহা হইলে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে? এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। কাজেই রোজ রাগারাগি করা আর চীৎকার করা ছাড়া উপায় কি?

সুতরাং খাটের উপর আরও চাপিয়া বসিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; "আমার যা-খুশী করায় বাধা দেবার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই, তোমার ত নেই-ই। আমি কি কারও খাই পরি? আমি বল্‌ছি, দেবেশ পরশু আস্‌বে, এখনই লিখে পাঠাচ্ছি আমি গিয়ে। তার আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেন না-হয়, এই এক কথা ব'লে দিলাম।" বলিয়া তিনি খাট হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যামিনী বলিলেন, "বাড়ীতে ডেকে অনাদর করাটা ত ভদ্রতা নয়, সুতরাং দেবেশকেও অনাদর করা হবে না তা বলাই বাহুল্য।"

যামিনীকে কিছুতেই চটাইতে না পারিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া পড়িলেন।

বলিলেন, "আমি রাত্রে কিছু খাবটাব না, কেউ যেন এই নিয়ে আমায় জ্বালাতে না যায়।" তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যামিনী গহনা-তোলা শেষ করিয়া লোহার সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া, তাহার ধারে গিয়া বসিলেন। দিনের পর দিন এক ভাবে

চলিয়াছে। আরও কত দিন চলিবে তাহাই বা কে জানে? কি ভীষণ মরুভূমির মধ্যেই যামিনীর জীবনপথ আসিয়া শেষ হইল।

মাতার অন্তিমকালে তাঁহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে গিয়া, যামিনী যে, আজীবন কি শাস্তি নিজের জন্য বরণ করিয়া লইতেছিলেন, তাহা সেই অতীত দিনে তিনি ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জীবন হইতে প্রেমকে চিরনির্ব্বাসন দিলেন, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু শান্তি, আত্মসম্মান, সকলই যে চিরকালের মত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহা ত ভাবেন নাই?

খানিকটা নিজের মনেই যেন বলিলেন, "মেয়েকে এই হাড়কাঠে বলি দিতে আমি কিছুতেই দেব না, তা যা থাকে আমার কপালে।"

বাস্তবিক তাঁহার কপালে ইহার অপেক্ষা বেশী শোচনীয় আর কিই বা ঘটিতে পারে? সুরেশ্বর সত্যই কিছু তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না বা ধরিয়া মারিতে পারেন না। পারিলেই যেন এক দিক্ দিয়া ভাল হইত। নিত্য এই অপমান, এই গ্লানি তাহা হইলে চুকিয়া যাইত। দারিদ্র্য তাঁহার অভ্যাস নাই, কিন্তু এই লাঞ্ছনাজড়িত ঐশ্বর্য্যভোগ অপেক্ষা দরিদ্রভাবে জীবনযাপন সহস্রগুণে কি ভাল হইত না?

এমন সময় একখানা চিঠি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া মমতা ডাকিল, "মা।"

নিজের অদৃষ্ট-চিন্তা হইতে যামিনী জোর করিয়া যেন নিজেকে ফিরাইয়া আনিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মা?"

মমতা চিঠিখানা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "মা দেখ, ছায়া আমোকে কাল নেমন্তন্ন করেছে।"

যামিনী চিঠি লইয়া পড়িয়া দেখিলেন। ছায়াই লিখিয়াছে। কাল

তাহার জন্মদিন, তাই তাহার মাসীমা ছায়ার কয়েক জন বন্ধুকে একটু জলযোগ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মমতা অত্যন্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, আমি যাব ত?"

যামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা যেও, রাত হবার আগেই ফিরে এস, কিন্তু।"

মমতা বলিল, "তা ত আসবই। এ ত আর রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ নয়, চা খাবার শুধু। আচ্ছা মা, লুসিকেও কি নিয়ে যাব? ও তা না হ'লে একা একা ব'সে কি করবে?"

যামিনী বলিলেন, "ছায়া থাকে পরের বাড়ী, উপরি লোক নিয়ে গেলে হয়ত অসুবিধা হ'তে পারে। লুসি ঘণ্টা দুই-তিন কি আর একলা থাকতে পারবে না?"

মমতা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আচ্ছা, তাই থাকবে না হয়। আমি যাব কার সঙ্গে?"

মা বলিলেন, "কার সঙ্গে আর যাবে মা, বাড়ীর গাড়ীতে নিজেই যেও! নিত্যকে সঙ্গে দেব এখন।"

মমতা চলিয়া গেল। ছোটখাট ব্যাপার তাহাদের তরুণ-জীবনে কতখানি! কাল ছায়ার বাড়ী যাইবে, এই ভাবনাই মমতাকে এখন অধিকার করিয়া বসিল। কি কাপড় পরিবে, কি গহনা পরিবে, তাহাই কতবার করিয়া ভাবিল। ছায়ার ত গহনাকাপড় বিশেষ কিছু নাই, তাহার বাড়ীতে বেশী সাজ করিয়া যাওয়া ভাল দেখাইবে না।

অলকা মুট্‌কী কিন্তু প্রাণপণে সাজিয়া আসিবে, তাহা মমতা লিখিয়া দিতে পারে। তাহাদের ক্লাসের মেয়েদের ছাড়া আর

কাহাকেও ছায়া বলিয়াছে কিনা কে জানে? বাহিরের অচেনা ছেলেদের সামনে বাহির হইতে মমতার বড় লজ্জা করে, অভ্যাস নাই কিনা?

লুসি তখন খাটের উপর বসিয়া একখানা নভেলের পাতা উল্টাইতেছিল। মমতাকে দেখিয়া বলিল, "বেশ আছিস্ ভাই, দিদি। নিত্যি পার্টি, নিত্যি নেমন্তন্ন। বড়লোক হওয়ার সুখ আছে।"

মমতা বলিল, "সুখ ত কত। এই রকম জড়ভরত সেজে যত বুড়ো আর টেকোর সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগে আর কি?"

লুসি বলিল, "সে ত আর রোজ না? এর পর বুড়ো আর টেকোর ছেলে আসবে, তখন খুব ভাল লাগবে।"

মমতা তাহাকে একটা চড় মারিয়া বলিল, "যাঃ, ভারি ফাজিল হয়েছিস্। এত পাকামি তোর আসে কোথা থেকে?"

লুসি বলিল, "কোথা থেকে আবার আসবে? বয়স বাড়ছে না কমছে? চিরদিনই কি আর খুকি থাকব? তোমার বর যে নিজে আসবে তোমায় দেখতে, তা বুঝি জান না? তোমার বিন্দু পিসীমার কাছে শুনলাম যে?"

মমতা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ব্যাপারটা কি জানি কেন তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। মায়ের যে ইচ্ছাতে বিন্দুমাত্র সম্মতি নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, এবং মনটাও তাহার এই কারণে বিরূপ হইয়া যাইতেছিল। বিবাহের চিন্তা, বরের চিন্তা, প্রেমে পড়ার চিন্তা, এই বয়সে কোন মেয়ের মাথায় না আসে?

কিন্তু এই রকম ঘটকালির বাঁধা পথে কি মমতার রাজপুত্রের আগমন ঘটিবে? তাহার মন যেন একেবারে মুখ ফিরাইয়া লইল।

লুসি বলিল, "দিদি ভাই, তুমি বড় ছে[illegible] কিন্তু। আমি হ'লে—"

মমতা বলিল, "তুমি হ'লে কি করতে? চা[illegible] তুলে নাচতে?'

লুসি বলিল, "চার পা তুলে না নাচি, দু-পা তুলে ত নাচতামই। কিন্তু আমি ত আর তোমার মত সুন্দরী নই; আমার জন্যে অত ছুটে ছুটে বরও আসবে না।"

মমতা বলিল, "আহা, আমার সৌন্দর্য্যের জন্যেই বর ছুটে আস্‌ছে আর কি? আসছে ত বাবার টাকার লোভে।"

লুসি বলিল, "তা হোক না? আসল দিক্‌টা দেখ না, নকলটা বাদ দিয়ে।"

মমতা তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "তুই থাম ত, খালি বিয়ে আর বিয়ে। সে যখন হবে তখনই হবে। কাল সন্ধ্যাটা কি ক'রে কাটাবে বল দেখি?"

লুসি বলিল, "সে দেখা যাবে এখন। না-হয় পিসীমার সঙ্গে কোথাও বেড়িয়ে আসব।"

রাত্রি হইয়া আসিল। সুরেশ্বর সত্যই রাত্রে কিছু খাইলেন না। যামিনী নামে মাত্র খাইতে বসিয়া উঠিয়া গেলেন। [illegible]মেয়েরা যথা-রীতি খাইতে বসিল, এবং খাইয়া-দাইয়া উঠিয়া গেল।

মমতা লুসি নিজেদের ঘরে গিয়া আজ শুইল। যামিনী আপত্তি করিলেন না, দুই-সখীর গল্পে বাধা দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাল ছায়ার বাড়ী যাওয়া লইয়া সুরেশ্বর আবার

গোলমাল না বাধান। দিনের দিন তাঁহার স্বভাব যা হইতেছে, তাঁহা আর বলিবার নয়। স্থির করিলেন, তিনি নিজেই লুসি মমতা, এবং একজন ঝিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন। তাহার পর মমতাকে যথাস্থানে নামাইয়া দিলেই হইবে।

৯

ভাবী কুটুম্বের সঙ্গে বেশী হৃদ্যতা করিতে গিয়া সুরেশ্বরের শরীরটা পরদিনেও ভাল শোধরাইল না। সকালে উঠিলেন না, মাথা ভার হইয়া আছে, গা কেমন করিতেছে। চাকর তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া যামিনীকে খবর দিল। যামিনী নিজেই তাঁহার ঘরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মমতাকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ত মা, দে'খে আয়। যদি শরীর বেশী খারাপ হয়ে থাকে, তাহ'লে ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে।"

মমতা সবে তখন চা খাইয়া উঠিয়া লুসির সঙ্গে কি একটা বিষয়ে গভীর তর্ক জুড়িয়াছে, মায়ের আদেশে সে লুসিকে টানিতে টানিতেই গিয়া সুরেশ্বরের শুইবার ঘরে উপস্থিত হইল।

সুরেশ্বর মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন। পায়ের শব্দে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, যামিনী আসিয়াছেন। মমতাকে দেখিয়া বিরক্তটা চট করিয়া মুখ হইতে মুছিয়া লইয়া বলিলেন, "কি মা-লক্ষ্মী, সকালবেলাই যে সদল-বলে?"

মমতা বলিল, "তুমি উঠলে না, কিচ্ছু না, তাই দেখতে এলাম কি হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে কি ফোন্ করব বাবা?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা একবার করলে হয়, মোটেই ভাল বোধ করছি না।"

মমতা বলিল, "তুমি কি কিছুই এখন খাবে না, বাবা, উঠবেও না?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখি ডাক্তার কি বলে আগে।"

মমতা লুসিকে লইয়া চলিয়া গেল। যামিনী তাহার কাছে সব শুনিয়া তখনই টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিলেন। নিজে যাইবেন কি না স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কাল রাত্রে একটা রাগারাগির মত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাকে দেখিলে সুরেশ্বর যদি আবার উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে না যাওয়াই ভাল। আবার না যাওয়ার জন্য যদি সুরেশ্বর চটিয়া যান, সেও এক ভাবনা। অবশেষে অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, ডাক্তার আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই যাইবেন। একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে সুরেশ্বর জোর করিয়াই মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখিবেন।

ডাক্তার আসিতে বেশী দেরী করিলেন না। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বহু কাল সুরেশ্বরের পারিবারিক চিকিৎসকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। খবর পাইয়া যামিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এই যে আসুন, উনি শোবার ঘরেই রয়েছেন, এখনও উঠেন নি।'

ডাক্তার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে? খাওয়া দাওয়ার কিছু অনিয়ম হয়েছিল নাকি?"

যামিনী বলিলেন, "তা খানিকটা হয়েছে[illegible]।"

দুইজনে সুরেশ্বরের শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "ওঁর এখন বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, শরীরের গতিক ভাল

নয়। খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোনও অনিয়ম না হয়, ঘুম যেন ঠিক-মত হয়, এই দুটো বিষয়ে আপনি খুব লক্ষ্য রাখবেন। ওঁর স্বভাব ত জানি, সামনে ভাল খাবার দেখলে কিছুতেই লোভ সামলাতে পারেন না, আপনারই এখন শক্ত হওয়া দরকার।"

যামিনীর হাসি আসিতে লাগিল। তাঁহার শক্ত হইয়া ত কত লাভ! তিনি একটা কথা বলিলে, তাহার উল্টা কাজ করার উৎসাহ সুরেশ্বরের চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। যে স্ত্রী তাঁহার জন্য কণামাত্রও ব্যস্ত নয়, তাহার কথা শুনিয়া চলিবার অপমান স্বীকার সুরেশ্বর কখনও করিবেন না, আর যেই করুক। কথাটা শুনিলে তাঁহার নিজের ভাল হইবে কিনা সেটা ভাবিবারই কথা নয়।

সুরেশ্বর ডাক্তারকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাকরকে ডাকিয়া চেয়ার দিতে বলিলেন। যামিনীকে দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল বটে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করিবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

চাকর তাড়াতাড়ি দুইখানা চেয়ার আনিয়া হাজির করিল। ডাক্তার-বাবু বসিলেন, যামিনীও একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, চেয়ারটা খাটের আর এক পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন।

ডাক্তার যথারীতি পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিলেন, এবং যথারীতি ব্যবস্থাও দিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "কয়েক দিন চুপচাপ বিশ্রাম করতে হবে, একেবারে বাড়ী থেকে বেরোবেন না, শোবার ঘর ছেড়েও যদি না বেরোন ত ভাল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি। বিশেষ জরুরী কাজ ছিল কতগুলো এই সময়।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে সব এখন পেছিয়ে দিতে হবে। শরীর আগে,

তার পর অন্য সব। খাওয়া-দাওয়াও যেমন বললাম, তার থেকে এদি ওদিক্ করবেন না।"

সুরেশ্বর হতাশ ভাবে আবার খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলে "উপায় যখন নেই, তখন আর কি করা যাবে?"

ডাক্তার বাহির হইয়া চলিলেন, যামিনীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহি হইয়া আসিলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া একটু উদ্বিগ্নভাবেই ডাক্তারবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলেন ওঁকে?"

ডাক্তারবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "খুব বেশী ব্যস্ত হবার ম এখনই কিছু হয় নি, তবে সাবধানে থাকতে হবে। অনিয়ম আর চলে না। একটু ব্লাড-প্রেশারের ভাব দেখা যাচ্ছে।"

এই ব্যাধিটি এই বংশে পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে সুতরাং রোগের নাম শুনিয়া যামিনী যে খুব নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিলেন তাহা বলা চলে না। কিন্তু চিন্তা করিয়াই বা তিনি কি করিতে পারেন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে।

"তা হলে আসি, আজ শুধু লিকুইডের উপরেই থাকেন যেন," বলিয় ডাক্তার নামিয়া গেলেন।

যামিনী নিজের ঘরে গিয়া সুরেশ্বরের চাকরকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কি কি খাবার কর্ত্তার ঘরে যাইবে, তাহা বলিয়া দিলেন।

খানিক বাদে চাকরটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু ডাকছেন।"

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া আবার সুরেশ্বরের ঘরে ফিরিয়া চলিলেন সুরেশ্বর তখন মুখ-হাত ধুইয়া উঠিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন যামিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "ব'সো, চা-টা খাওয়া হয়েছে?"

এতখানি ভদ্রতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া যামিনী বলিলেন, "হাঁ

হয়েছে।" তিনি খাটের একপাশে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরেশ্বর বলিলেন, "এই কালই সে কথা হচ্ছিল কিনা দেবেশকে ডাকবার, তার কি করবে ?"

যামিনী বলিলেন, "খুব ত তাড়া নেই, তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠ' তারপর দেখা যাবে।"

ডাক্তারের উপদেশের বহরে সুরেশ্বর একটু দমিয়া গিয়াছিলেন, বেশী মেজাজ না দেখাইয়া বলিলেন, "আবার বেশী দেরী ভাল না, নানারকম বাধা-বিপত্তি ঘটতে পারে। যোগ্য ছেলে, আরও অনেকের চোখ আছে ওর উপর। আমার এমন ত কিছু অসুখ নয়, আজকের দিনটা শুয়ে প'ড়ে থাকলেই সামলে যাব। আমি বল্‌ছিলাম, যেমন কাল ডাকার কথা ছিল, তাই না হয় ডাকা যাক্।"

সুরেশ্বরকে চটিবার কোনও সুযোগ দিবার ইচ্ছা যামিনীর একেবারেই ছিল না। তিনি বলিলেন, "বেশ তাই কর। চিঠি লিখে দাও।"

সুরেশ্বর খুশী হইয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন, যামিনী বিষণ্ন মনে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মমতার বিকালে নিমন্ত্রণে যাওয়ায় একটু মুস্কিল ঘটিবে। এ অবস্থায় যামিনী ত বাহিরে যাইতে পারেন না। পাঁচ মিনিট পরে পরে যে-কোনও ছুতা করিয়া সুরেশ্বর এখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে থাকিবেন, নিজে অসুস্থ হইয়া থাকিলে বাড়ীসুদ্ধকে অস্থির করিয়া তোলা তাঁহার নিয়ম। নিজে যখন আরামে না থাকেন, তখন অন্য কাহারও আরাম তিনি সহ্য করিতে পারেন না। মমতাকেও ডাকিতে পারেন, কিন্তু বেড়াইতে গিয়াছে বলিলে তত বেশী কিছু বলিবেন না। অথচ মমতা বেচারীকে নিরাশ করিবার ইচ্ছা যামিনীর একেবারেই ছিল না।

এমনিতেই সে বাড়ী হইতে কোথাও বাহির হইতে পায় না, যদি একটা স্থযোগ ঘটিল, তাহাও না মাঠে মারা যায়। কি করিবেন, যামিনী ভাবিয়াই পাইলেন না।

এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। স্থজিত হঠাৎ আসিয়া বলিল, "মা আমার একবার গাড়ীটা দরকার বিকেলে।" কয়েক দিন আগে তাড়া খাইয়া, স্থজিত এখন কোথাও যাইতে হইলে ভদ্রতা করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে।

যামিনী বলিলেন, "কোথায় যাবে? তোমার দিদিরও ত আজ এক্ জায়গায় যেতে হবে।"

স্থজিত বলিল, "আমাদের ক্লাসের দীনবন্ধুর কাছে একবার যেতে হবে, কয়েকখানা বই আনবার জন্যে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ পাড়ায় তাদের বাড়ী?"

স্থজিত বলিল, "কালীতলার কাছে।"

ছায়ার মাসীর বাড়ী বেনেটোলায়। যামিনী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহ'লে মমতা আর তুমি একসঙ্গেই যাও, ওকে নামিয়ে দিয়ে তবে তুমি দীনবন্ধুর বাড়ী যেও, আবার ফিরবার সময় তুলে নিয়ে এস। আট-টার বেশী দেরী যেন না হয়।"

ব্যবস্থা স্থজিতের মোটেই পছন্দ হইল না। ইহারই মধ্যে মেজাজটা তাহার খুব বনিয়াদী হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কোথাও যাইতে হইলে তাহার যেন মাথা কাটা যাইত। মেয়েরা বাড়ীর ভিতর থাকিয়া পুরুষদের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবে, এই ছিল তাহার স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে বিধান। তবে এখনও ত নিজের ধারণাগুলি অন্যের উপর খাটাইবার স্থবিধা পায় নাই, কাজেই তাহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক

কাজ করিতে হয়। দিদিকে লইয়া যাইবার তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহা না করিলে নিজের যাওয়া বন্ধ হয়, অগত্যা তাহাকে রাজী হইতে হইল।

সুরেশ্বর সারাটা দিন বাড়ীর সকলকে, বিশেষ করিয়া যামিনীকে, ব্যস্ত করিয়া রাখিলেন। মমতা, সুজিত, লুসি, ঝি-চাকর, আশ্রিতবর্গ, সকলেই পালা করিয়া তাঁহার ফরমাস খাটিতে লাগিল। বিকাল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যামিনী বলিলেন, "আমি বস্‌ছি এখন এখানে, খোকা খুকী খানিকটা ঘুরে আসুক। সারাদিন বাড়ীতে বন্ধ হয়ে থাকা ভাল নয়।"

সুরেশ্বর রাজী হইলেন, কারণ ছেলেমেয়ের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাতে কখনও তিনি আপত্তি করিতেন না। যামিনী মমতাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "এই নে মা চাবি, শীগগির ক'রে কাপড়চোপড় প'রে নে গিয়ে।"

মমতা চলিয়া গেল। লুসি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। "দেখি ভাই দিদি আজ কি পরবে?"

মমতা কাপড়ের আল্‌মারি খুলিতে খুলিতে বলিল, "যাহোক একটা কিছু প'রে গেলেই হবে আজ।"

লুসি বলিল, "ও মা কেন? চায়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছ, বেশ ভাল ক'রে ড্রেস ক'রে যাও। কাল যেমন উপকথার রাজকন্যা সাজলে, আজ তেমনি মেমসাহেব সাজ। তোমার ত সব রকমই আছে।"

মমতা বলিল, "না ভাই। ছায়া-বেচারীর সাজপোষাক কিছুই নেই, তার ঘরে গিয়ে বড়মানুষী দেখালে বড় বিশ্রী হবে। এমনি সাদাসিধে কাপড় প'রেই যাই।"

লুসির মোটেই কথাটা পছন্দ হইল না। নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, যাহার যেমন পোষাকপরিচ্ছদ আছে, সে তেমন পরে, যাহার বাড়ী যাইতেছে তাহার কি আছে না-আছে, সে ভাবনা ভাবে না। দিদির সব-তাতেই বাড়াবাড়ি।

মমতা সাজিবেই না যখন, তখন তাহার চুলগুলি ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া যথাসাধ্য বড় একটা এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াই লুসি নিশ্চিন্ত হইল। মমতা গহনা যা পরিয়া থাকে, তাহার উপর কিছুই পরিল না। বাছিয়া বাছিয়া একটা লাল-বুটী দেওয়া ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া পরিয়া বসিল। কপালে লুসি একটা কুঙ্কুমের টিপ পরাইয়া দেওয়াতে আপত্তি করিল না।

যামিনী এক ফাঁকে আসিয়া মেয়ের প্রসাধন দেখিয়া গেলেন। বলিলেন, "বেশ হয়েছে। লুসির এখন বেলাটা কাটে কি ক'রে?"

লুসি বলিল, "দাও না পিসীমা, ঐ কালো আল্‌মারির চাবিটা, আমি সব কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিই। তুমি না বলছিলে, সব বড় আগোছাল হয়ে আছে?"

কালো কাঠের আলমারিতে যামিনীর এবং মমতার রেশমের কাপড়-চোপড়গুলি থাকিত; এই সব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লুসির ভারি আনন্দ। মমতা যতক্ষণ বাড়ী থাকিবে না, এই উপায়ে সে দিব্য সময় কাটাইয়া দিতে পারিবে।

এমন সময় সুরেশ্বর নিজের ঘর হইতে হাঁক দিয়া উঠিলেন। যামিনী ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছেন, এই সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাঁহার মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে।

যামিনী চাবির রিংটা তাড়াতাড়ি লুসির হাতে দিয়া বলিলেন, "এই

মোটা চাবিটা ঐ আলমারীর, দেখিস যেন বাইরে কিছু প'ড়ে না থাকে।" তিনি আবার সুরেশ্বরের ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

সুজিতও প্রস্তুত হইয়া আসিল। নিত্যকে ডাকিয়া লইয়া মমতা সুরেশ্বরের ঘরের দরজার সামনে দিয়াই নীচে চলিয়া গেল, তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। মেয়ের অঙ্গে সাজসজ্জার কিছু প্রাচুর্য্য দেখিলে অবশ্য তাঁহার মনে একটু সন্দেহ হইলেও হইতে পারিত।

সুজিত সামনে ড্রাইভারের পাশে বসিল, ভিতরে বসিল মমতা এবং নিত্য। গাড়ীটা সিডান, এই যা রক্ষা, খানিকটা পর্দ্দা বজায় রাখিয়াই যাওয়া যায়। মমতা কোথায় যাইবে, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সুজিত সারাপথ আর ঘাড়ই ফিরাইল না।

ছায়ার বাড়ী আবিষ্কার করিতে একটু ঘোরাঘুরি করিতে হইল, কারণ বাড়ীটা বড়রাস্তার উপরে নয়, একটুখানি গলির ভিতরে। সুজিত গাড়ীতেই বসিয়া রহিল, ড্রাইভার নামিয়া গিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিল। তাহার পর মমতা এবং নিত্যকে লইয়া সে-ই আবার পৌছাইতে চলিল। সুজিত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শূন্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমি আটটার সময় আসব, তখন যেন আর দেরী না হয়।"

নোংরা দুর্গন্ধ গলির ভিতর তিনতলা পুরনো একটা বাড়ী। এক-এক তলায় এক-এক জন ভাড়াটে। ছায়ার মাসীমা দু-তলায় থাকেন। ড্রেনের এবং নর্দ্দমার মিশ্রিত গন্ধে মমতার দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সদর দরজার সামনে আসিয়া ড্রাইভার বলিল, "এই বাড়ী।" দরজার কড়াটাও সে সজোরে নাড়িয়া দিল।

একতলাবাসিনী একটি ছোট মেয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বছর পাঁচ বয়স, কিন্তু পরিচ্ছদের কোনও বালাই নাই। মমতাকে দেখিয়া বলিল, "সব্বাই উপরে চ'লে গেছে।"

অনাহূত ভাবেই উপরে চলিয়া যাইবে কিনা, মমতা ভাবিতেছে, এমন সময় তিন-চার সিঁড়ি এক-এক লাফে অতিক্রম করিয়া একটি যুবক নামিয়া আসিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গায়ের রংটা শ্যামবর্ণ। মমতাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "এই যে, এইদিকে আসুন।"

মমতা প্রতিনমস্কার করিল বটে, তবে কথা কিছু বলিল না। অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতে তাহার বড় লজ্জা করিত। চির কাল একলা একলা থাকিয়া এ বিষয়ে তাহার কোনও অভ্যাস হয় নাই।

ড্রাইভার ফিরিয়া গেল। মমতা ও নিত্য যুবকটির পিছন পিছন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

উপরে ঘর মাত্র তিনটি। দুইটি মাঝারি, একটি অত্যন্ত ছোট। তিনটিই শয়নকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে আজ একটিকে বসিবার ঘরে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তক্তপোষ বহির করিয়া দিয়া শতরঞ্চির উপর চাদর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। ঘরের এক কোণে পুরাতন একটি টেবিল, আর একপাশে গোটা দুই বড় ট্রাঙ্ক, তাহা আজ একটা ছিটের দোলাইয়ের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে। আর জিনিষপত্র যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে।

অলকা এবং তাহাদেরই ক্লাসের শুভা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। পাশের ছোটঘর হইতে উঁকি মারিয়া ছায়া বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি। তুই ঐ ঘরে বোস ভাই।"

১০

মমতা ঘরে ঢুকিতেই অলকা তাহার হাত ধরিয়া এক টানে নিজের পাশে বসাইয়া দিল। ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "আচ্ছা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলাম বাবা, মুখ বুজে ব'সে থাকতে থাকতে চোয়ালে খিল ধ'রে গেল।"

মমতা স্বাভাবিক গলাতেই বলিল, "কেন, কেউ তোকে কথা বলতে বারণ করেছে নাকি?"

তাহাদেরই ক্লাসের আর একটি মেয়ে ধীরা, এ[illegible] চিম্‌টি কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "এই, চুপ, ওরা গুষ্টিসুদ্ধ পাশের ঘরে ব'সে আছে, শুন্‌তে পাবে।"

বাধ্য হইয়াই গলাটা একটু নামাইয়া মমতা বলিল, "এমন কি কথা আমরা বলছি যে ওরা শুন্‌লে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

অলকা বলিল, "ছায়াটা মোটেই আসছে না, [illegible]র বাড়ী এসে নিজেরাই হৈ চৈ করা যায় নাকি? কি যে করছে [illegible]খানে? তা তুই এ-রকম বেশে এসেছিস্ কেন? এটা ত জন্মদিনের উৎসব, শ্রাদ্ধ ত নয়?"

মমতা যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই, অলকার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গহনা, পরনে দামী চাঁপাফুল রঙের ক্রেপের শাড়ী, পায়ে পাঞ্জাবী জরির

জুতা। মুখের রংটাও সবটাই স্বাভাবিক নয় বোধ হয়। এই সাদাসিধা ঘরে, অন্য মেয়েগুলির পাশে তাহাকে উৎকট রকম অশোভন দেখাইতেছে। ভাগ্যে সে নিজে লুসির কথা শুনিয়া এক গা গহনা পরিয়া আসে নাই! ছায়া বেচারী গরীবের মেয়ে, বড়-জোর একখানা শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙার শাড়ী পাইয়াছে জন্মদিনে। তাহারই ঘরে, তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাইতে যাওয়াটা যে রীতিমত কুরুচির পরিচায়ক, সে জ্ঞান মুট্‌কি অলকার কোনওদিনই হইবে না।

সবসুদ্ধ আটজন মেয়ে আসিয়াছে। পাঁচজন ত তাহাদের ক্লাসেরই, অন্য তিনজন পাড়ার মেয়ে বোধ হয়। তাহারা এদের চেনে না, ইহারাও তাদের চেনে না, কাজেই দুই দলই চুপচাপ বসিয়া আছে, অথবা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যেই কথা বলিতেছে। মমতাও একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এমন সময় ছায়া আসিয়া ঢুকিল। চুলটা খুব পরিপাটি করিয়া বাঁধা, কপালে চন্দন, পরনে চওড়া লালপাড় দেশী শাড়ী। এই তাহার সাজ। আর ইহার চেয়ে বেশী মূল্যবান্ সজ্জা তাহার জুটিবেই বা কোথা হইতে?

মমতা তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাজ হয়ে গেল ভাই?"

ছায়া বলিল, "হয়েছে। তোরা বুঝি তখন থেকে চুপচাপ ব'সে আছিস?"

অলকা বলিল, "তা কি করব? তুই ত আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলি না?"

ছায়া লজ্জিত ভাবে অতিথিদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের আলাপ করাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। নিমন্ত্রণ-কর্ত্রীর কাজটা তাহাকে দিয়া বেশী

ভাল ভাবে হইবার নয়, তাহার স্বভাবে লজ্জা ও সঙ্কোচ অত্যন্ত বেশী। তবু সে ছাড়া আর যখন অভ্যাগতদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিবার কেহ নাই, তখন তাহাকেই কাজটা করিতে হইবে।

বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো সদাসর্ব্বদা জ্বলে না, আজকার মত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলো জ্বালার পর এই আড়ম্বরহীন ছোট ঘরখানিরও শোভা খানিকটা যেন বাড়িয়া গেল। মেয়েরা এখন এ উহার সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একজন প্রৌঢ়া মহিলা ঘরের ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "একটু গানটান হোক না? তুই না বল্‌ছিলি ছায়া, যে তোদের ক্লাসে দু-তিনজন মেয়ে বেশ গান করতে পারে?"

মেয়েরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছায়া পরিচয় করিয়া দিল, "ইনি আমার মাসীমা। এই মমতা, এই অলকা, এই শ্যামা, এই ধীরা, এই শোভনা।"

মমতারা একে একে ছায়ার মাসীমাকে প্রণাম করিল। অলকার প্রণাম করাটা বিশেষ আসে না, সে কোনওমতে নীচু হইয়া একটা নমস্কার করিয়া কাজ সারিয়া লইল।

ঘরের কোণে ছোট একটা বক্স-হার্ম্মোনিয়ম ছিল, ছায়া সেটা টানিয়া আনিল।

মমতা বেশ গাহিতে পারে, অলকা বহুকাল ওস্তাদের কাছে গান শিখিতেছে, অতএব ধরিয়া লইতে হইবে, সে ভালই গাহিতে জানে। ধীরার ত সুগায়িকা বলিয়া স্কুলে নামই ছিল, ছায়া তাহাকেই প্রথমে গাহিতে অনুরোধ করিল।

ধীরার ন্যাকামি করা স্বভাবে ছিল না। গান গাহিতে সে পারেও

ভাল, সুতরাং গাহিতে বলিলেই গাহিত। অলকা অবশ্য সেটাকে বলিত' ঢং। যে যেখানে গাহিতে বলিবে অমনি হাঁ করিয়া চেঁচাইতে হইবে নাকি? আজ এখানে আসিয়া অবধি আয়োজনের দৈন্য দেখিয়া সে চটিয়া আছে। তাহার মতে এই দীনহীন গৃহে তাহাকে এবং মমতাকে ডাকিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া ছায়া ভাল কাজ করে নাই। ধীরা করুক গান; মানসম্ভ্রম-জ্ঞান তাহার একেবারেই নাই, অলকা কখনই নিজেকে খেলো করিবে না।

ধীরা বেশ ভালই গাহিল। মাসীমা তাহার খুব প্রশংসা করিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে বলিল, "চমৎকার ত তুমি গাও ভাই, নিশ্চয় তোমার গান একদিন রেকর্ডে উঠবে।" অলকা ইহাতে আরও চটিয়া গেল, যদিও কেন তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

ছায়া হার্ম্মোনিয়মটা অলকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি এইবার একটা গান কর না ভাই?"

অলকা মিহি গলায় বলিল, "যা কষ্ট পাচ্ছি ভাই ফ্যারেনজাইটিস্ হয়ে, আমার দ্বারা আজ আর হবে না।"

মমতা বলিল, "কর্ না ভাই, আস্তে আস্তে করিস্, এখানে ত আর তোকে বেশী চেঁচাতে হবে না?"

অলকা কিছুতেই রাজি হইল না। তখন সকলের অনুরোধে মমতাই গান আরম্ভ করিল।

ধীরার মত মমতার গলার জোর অত বেশী ছিল না, কিন্তু কণ্ঠের মিষ্টতা তাহারই ছিল বেশী। ছোট ঘরখানিতে যেন সুধাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ মমতার চোখ পড়িল দরজার ওধারে। সেই

শ্যামবর্ণ যুবকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিতেছে। তাহার নিজের গলাটা একটু কাঁপিয়া গেল।

ছায়াও তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া যুবককে দেখিতে পাইল। ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া মমতার কানের কাছে বলিল, "অমরদা গান ভয়ানক ভালবাসে ভাই, ভাল গান শুন্‌লে ওর আর জ্ঞান থাকে না। ও নিজেও চমৎকার গান করে ভাই।"

মমতা নিজের গান শেষ করিয়া নীচু গলায় বলিল, "ওঁকে বল না ভাই গান করতে, আমরা এতক্ষণ করলাম গান, আমাদের ত শুনতে পাওয়া উচিত?" কথাটা বলিয়াই তাহার অনুশোচনা হইল, হয়ত এতটা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা ঠিক হইল না।

ছায়া তাহার মাসীমাকে বলিল, "অমরদাকে বল না মাসীমা একটা গান করতে।" অমরেন্দ্র মাসীমারই সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।

মাসীমা হাসিয়া উঠিয়া গিয়া অমরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। সে একটু লজ্জিত ভাবেই ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের নমস্কার করিল। ছায়া সকলের সহিত একজোটে তাহার আলাপও করাইয়া দিল।

গান করিতে অমর কিছু মাত্র আপত্তি করিল না। অলকা ভাবিল, এইসব গরিব লোকদের চালচলনই এক রকম, নিজেরাই, নিজেদের উপযুক্ত মূল্য দিতে জানে না। তাহাদের সোসাইটিতে এমন যখন-তখন নিজেকে খেলো করার রেওয়াজ নাই।

অমরেন্দ্র সত্যই অতি সুগায়ক। মমতা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন চমৎকার গান আর কখনও সে শুনিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দরিদ্র ঘরে কত রত্ন যে লুকানো থাকে! বড় মানুষের ছেলে হইলে সারা কলিকাতায় ইহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

একটা গান শেষ হইবামাত্র ছায়াকে বলিয়া সে অমরকে আবার গান ধরাইল। অত উৎসাহ প্রকাশ করা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবারও তাহার অবসর রহিল না। উপরি উপরি তিনটি গান করিয়া তবে অমর ছাড়া পাইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর দেরী করা চলে না। রাত্রিতে খাইবার নিমন্ত্রণ ত নয়, চা খাইবার নিমন্ত্রণ মাত্র। কিন্তু খাওয়ার আয়োজন দেখিয়া অলকার ত চক্ষুস্থির! এই নাকি চা খাওয়া? সব আছে, খালি চা-টাই নাই। অবশ্য চাহিলে হয়ত পাওয়া যাইত, কিন্তু চাহিতে আবার যাইবে কে?

পাশের ঘরে মাটিতে আসন পাতিয়া জায়গা করা হইয়াছে। সেখানে গিয়া সকলে বসিল। ছায়াকে তাহার সঙ্গিনীরা ছাড়িল না, তাহাকেও বসিতে হইল বন্ধুদের সঙ্গে। মাসীমা এবং অমর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মমতা ভাবিল এ ছেলেটি ত বেশ, কোনও কাজ করিতে বাধা অনুভব করে না। বাড়ীতে তাহার বাবা বা ভাই পরিবেশন করিতেছেন, ভাবিতেই তাহার হাসি পাইল।

লুচি, বেগুন-ভাজা, ছানার ডাল্‌না আর পায়েস। সবই মাসীমার হাতের তৈরি, খাইতে ভালই হইয়াছে। আরও আছে, ঘরে তৈয়ারী মালপোয়া। এটি ছায়ার নিজের হাতে প্রস্তুত। অলকা বলিল, "ছায়ার এ বিদ্যেও আছে দেখছি।"

মাসীমা বলিলেন, "বাঙালী গেরস্ত-ঘরে রান্নাবান্না না শিখলে কি চলে মা? এখন ত তবু তোমরা স্কুল-কলেজে যাও, তাই ঘরের কাজ শিখবার তত সময় পাও না, আমার ত সাত-আট বছর বয়স থেকে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্না করতে শিখেছি।"

অলকা ভাবিল ভাগ্যে সে ঐ রকম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার এত যত্নের এনামেল্ করা ছুঁচলো অঙ্গুলের নখগুলির তাহা হইলে কি দশাই না হইত! মাগো!

ধীরা বলিল, "আমার দিদি খুব ছোটবেলা রান্না শিখেছিলেন। সত্যই সাত-আট বছর বয়সে তিনি এক-একদিন সংসারের সব রান্নাই ক'রে রাখতেন। তবে হাঁড়ি কড়া নামাবার জন্যে অন্য লোক ডাকতে হ'ত।"

খাওয়া ত চুকিয়া গেল, মেয়েরা আবার উঠিয়া আসিয়া আগের সেই ঘরটিতে বসিল। ছায়া সামান্য কিছু উপহারও পাইয়াছে, সেইগুলি সকলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সুরেশ্বরের অসুখের উৎপাতে মমতা কিছুই আনিতে পারে নাই, সেজন্য তাহার বড়ই লজ্জা করিতেছিল। সে-ই ছায়ার বন্ধুদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মানুষের মেয়ে। সকলেই উপহার দিল, অথচ সে কিছু দিল না; ইহাতে ছায়া কি মনে করিয়াছে কে জানে? অবশ্য সে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেও একটু অসময়ে, কিন্তু তখনও জিনিষ কিনিবার সময় নিশ্চয়ই ছিল।

সে ছায়ার কানে কানে বলিল, "বাবার একটু অসুখ ব'লে আমি তোর জন্যে কিছু আন্‌তে পারি নি ভাই। আমি পরে পাঠাব।"

ছায়া বলিল, "আহা, এ কি ট্যাক্স নাকি? না দিলেই বা কি?"

মমতা বলিল, "ট্যাক্স কেন হ'তে যাবে? আমার বুঝি আর কিছু দিতে ইচ্ছে করে না?"

অলকা নিজে একটা 'সিরোপার্লে'র নেকলেস আনিয়াছিল। মমতা কি দেয় দেখিবার জন্য তাহার বেজায় উৎসাহ ছিল, কারণ সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র মমতাকে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য বলিয়া মনে করিত।

কিছুই সে আনে নাই দেখিয়া অলকা খানিকটা অবাক্ হইয়া গেল।

আটটা বাজিতে আর দেরী নাই, মমতা গাড়ী হয়ত এখনই আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার আগে আসিল অলকার গাড়ী। সকলের কাছে বিদায় লইয়া, ছায়াকে অনেক শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া খট খট্ করিতে করিতে অলকা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। পাড়ার মেয়েরাও একটি-দুটি করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

মমতা ঘড়ি দেখিল, আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সুজিত এখনও আসে না কেন? বেশী রাত করিলে বাবা আবার রাগারাগি না আরম্ভ করেন।

আরও পনের মিনিট কাটিয়া গেল তবু গাড়ীর দেখা নাই। মমতা বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাস্তা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গলিটা সোজা নয়, বড় রাস্তা হইতে খানিকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, এখান হইতে কিছু দেখা যায় না।

হঠাৎ বাহির হইতে অমর বলিল, "সুজিতবাবু আপনাকে নিতে এসেছেন।"

সুজিতকে বাবু বলায় মমতার অত্যন্ত হাসি পাইল কিন্তু হাসিলে পাছে অমরেন্দ্র তাহাকে অভদ্র মনে করে, এই ভয়ে সে গম্ভীর হইয়া রহিল। ছায়ার মাসীমাকে প্রণাম করিয়া এবং অন্য সকলের কাছে বিদায় লইয়া সে নামিয়া চলিল। তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চলিল অমরেন্দ্র।

সুজিত অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া গাড়ীতে বসিয়া আছে। মমতা ও নিত্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হল কেন রে?"

সুজিত প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। মমতা আবার প্রশ্ন করাতে গোঁজমুখ করিয়া বলিল, "যা না ছিরির গাড়ী! এর চেয়ে গরুর গাড়ীও ভাল। ড্রাইভার বুঝাইয়া বলিল, গাড়ীর ইঞ্জিনের কি একটু গোলমাল হইয়াছে। মাঝে একবার একেবারেই অচল হইয়াছিল, সে আপনার যথাবিদ্যায় উহা মেরামত করিয়া এতদূর লইয়া আসিয়াছে, এখন মানে মানে বাড়ী পৌঁছিলে হয়।

সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল কিন্তু গাড়ী আবার চলিতে নারাজ। ড্রাইভার নামিয়া আবার ইঞ্জিন পরীক্ষা করিল, এটা-সেটা একটু ঠিক করিল, কিন্তু যন্ত্রদানব তখনও বিমুখ, চলিবার ইচ্ছা তাহার নাই। খালি ঘড় ঘড় শব্দ করে, কিন্তু যেখানকার জিনিষ সেখানেই থাকিয়া যায়।

মমতা উদ্বিগ্ন, নিত্য ভীত ও সুজিত চটিয়া আগুন। নীচু গলায় ইহারই মধ্যে সে গালাগালি আরম্ভ করিয়াছে। মমতার তাহার হইয়া লজ্জা করিতে লাগিল। কি অপদার্থ ছেলে, নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, জানে খালি অন্যের উপর তম্বি করিতে। অমরেন্দ্র না-জানি এই অপূর্ব্ব চিজ্‌টিকে কি মনে করিতেছে।

ড্রাইভার তৃতীয় বার চেষ্টা করার পর বলিল, গাড়ীটাকে খানিক দূর ঠেলিয়া লইয়া গেলে চলিতে আরম্ভ করিতে পারে। সুজিত যেখানে ছিল, সেখান হইতে এক ইঞ্চি না নড়িয়া আদেশ করিল, কুলী ডাকিয়া আনিতে। সে সুরেশ্বর রায়ের ছেলে, সে কি গাড়ী ঠেলিবে নাকি?

অমরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "কুলী আবার কি হবে? আমিই খানিকটা ঠে'লে দিচ্ছি," বলিয়া কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সে গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল।

মমতা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ইহার দেখি সব গুণই আছে, গায়েও

জোর কেমন! খোকাটার গালে তাহার চড় মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কেমন নবাবের মত বসিয়া আছে দেখ না, যেন দুনিয়াসুদ্ধ তাহার চাকর।

রাস্তার এক বিড়িওয়ালাও কি কারণে উৎসাহ হইল, সেও নামিয়া আসিয়া অমরেন্দ্রের সঙ্গে গাড়ী ঠেলিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে গাড়ীটার মত বদলাইল। সে স্থির করিল, ইহার পর নিজেই চলিবে। অমরেন্দ্র তখন নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। নিজের বনিয়াদিত্ব দেখাইবার জন্য সুজিত বিড়িওয়ালাকে একটা আধুলি বকশিশ করিয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিতে তাহাদের খানিকটা রাতই হইয়া গেল। মমতা খুব ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিতে লাগিল। যদিও দেরি হওয়ার দোষটা তাহার বিন্দুমাত্রও নয়, তবু সেকথা বাবাকেও বোঝান যাইবে না। তিনি একে অসুস্থ, তাহর উপর রাগারাগি বকাবকি করিয়া যদি রাত্রেও না ঘুমান, তাহা হইলে তাঁহারও অসুখ বাড়িয়া যাইবে, এবং মায়েরও যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না।

সিঁড়ির মুখের ঘর অন্ধকার। মমতা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল, বাঁচা গেল, বাবা তাহা হইলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত হ'ল কেন রে?"

মমতা বলিল, "গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল মা। আমরা অনেক হাঙ্গাম ক'রে এসেছি।"

১১

লুসি শয়নকক্ষে তখনও জাগিয়া রহিয়া আছে। পার্টি কেমন হইল, কত মানুষ আসিল, কে কি পরিয়াছিল, কে কি বলিল, সব না-শুনিয়া সে কি ঘুমাইতে পারে? মমতা ঘরে ঢুকিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "তুই না বলেছিলি ভাই যে আটটার সময় ফিরে আসবি?"

মমতা কাপড় বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে বলিল, "আমি কি করব ভাই, গাড়ী বিগড়ে যত হাঙ্গাম হ'ল। বাবা কিছু রাগারাগি করেন নি?"

লুসি বলিল, "না। তোর সে টেকো বুড়োর বাড়ী থেকে কি একটা চিঠি এসেছে, তাতে পিসেমশাই এত খুশী হয়েছেন যে সন্ধ্যার পর রাগারাগি করতেও আর তাঁর মনে থাকে নি। ও কি, শুচ্ছিস্ যে এরই মধ্যে? খাবি না?"

মমতা বলিল, "খেয়েই ত এলাম, আবার খাব কি? আমি কি রাক্ষস?"

লুসি বলিল, "সে ত শুধু চা খেয়েছিস্, তাতে পেট ভ'রে গেল?"

মমতা তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল, "লুচিটুচি অতগুলো খেলাম, আবার এই রাতে খাওয়া যায় নাকি?"

তাহার পর ফিস্‌ফিস্ করিয়া আরম্ভ হইল পার্টির গল্প। ঘটে নাই ত কিছুই, মাতব্বর মানুষ হইলে এই সন্ধ্যাটির বিষয় বলিবার মত কোনও

কথাই হয়ত খুঁজিয়া পাইত না। অথচ দুইটি কিশোরীতে গল্প চলিল অনর্গল, পূর্ণ একটি ঘণ্টা ধরিয়া। কে কি বলিল, কে কি গান করিল, কে কেমন দেখিতে, গল্প নিজের গুণেই ক্রমে যেন জমিয়া উঠিতে লাগিল।

যামিনী খানিক পরে আসিয়া বলিলেন, "এবার ঘুমো বাছারা, আর রাত জাগিস্ নে, কাল আবার সারাটা দিন হৈ হৈ ক'রেই যাবে।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা? কাল কি?"

যামিনী বলিলেন, "কাল আবার উনি একজনকে বিকেলে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন কিনা?" তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এদিক্‌কার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিস্ মা, আজ আমি ওঘরে থাকব। নিত্যকে বলব এ-ঘরে শুতে?"

নিত্যর বিপুল নাসিকা-গর্জ্জন মমতার ঘুমের ভারি বাধা জন্মায়। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না মা না, আমরা দু-জন রয়েছি, কিছু ভয় করবে না আমাদের।"

যামিনী চলিয়া গেলেন। সুরেশ্বর নিজে ঘুমাইতে না পাইলে যামিনীকেও পারতপক্ষে ঘুমাইতে দেন না। ছেলেমেয়েকেও জাগাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আবার মায়াও হয়। তাহার চাকর এবং যামিনীকে আজ রাত্রে জাগিয়াই কাটাইতে হইবে, তাহা তাহারা জানিয়াই রাখিয়াছেন। তবে দেবেশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাইয়া সুরেশ্বর কিছু খুশী হইয়াছিলেন, তাহার উপর গোপেশবাবু তাঁহার নিমন্ত্রণ-পত্রের উত্তরে এমন এক অতি অমায়িক চিঠি লিখিয়াছেন যে সুরেশ্বর একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাত্রে ঘুমাইয়া পড়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। এখন ত ঘুমাইয়াই আছেন, বারোটার পর না জাগেন, তাহা হইলেই রক্ষা। যামিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া, ক্যাম্প্‌খাটের

বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে রাত্রে আসলে ঘুম হইল না খালি সুজিতের। তাহার অত্যন্তই রাগ হইয়াছিল, তবে সেটা কাহার উপর তাহা সে নিজেও ভাবিয়া পাইতেছিল না। যাহা হউক, সেটা কাহারও উপর ভাল করিয়া ঝাড়িতে না পারিয়া, তাহার মাথাটা এমন গরম হইয়া রহিল যে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমান একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সকালেই আবার হতভাগা ড্রাইভার গাড়ীটাকে লইয়া কারখানায় দিয়া আসিল। ইহাও সুজিতের রোষের আগুনে খানিকটা ঘৃতাহুতি দিল।

সারারাত সুরেশ্বর সত্যই ঘুমাইয়াছিলেন, এবং মেজাজটাও তাঁহার ভালই ছিল। শরীরটাও অতএব খানিকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু স্বভাব যাইবে কোথায়? কতক্ষণে স্ত্রীর সহিত কিছু একটা লইয়া কথা-কাটাকাটি করিতে পারিবেন, তাহারই সুযোগ তিনি যেন খুঁজিতেছিলেন।

যামিনী ইচ্ছা করিয়াই সারা সকালটা রান্নাবাড়ী এবং ভাঁড়ার-ঘরে কাটাইয়া দিলেন। উপরে গিয়া ঝগড়া করিবার মত উৎসাহ তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আর ছিল না। সুরেশ্বরের চিমটিকাটা কথা শুনিলে সহস্র চেষ্টাতেও বিরক্তি তিনি দমন করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সান্নিধ্য একেবারে পরিহারই করিয়া চলিতেছিলেন। মাঝে মাঝে লুসি বা মমতাকে দিয়া দরকারী কথা দুই-চারিটা বলিয়া পাঠাইতেছিলেন।

মমতার মন আজ বড় ভার হইয়া আছে। অতিথিটি যে কে, এবং কেন তাঁহার শুভাগমন হইতেছে, তাহা জানিতে মমতার বাকী নাই। লুসি থাকিতে সংবাদদাতার অভাব নাই। লুসির উৎসাহেরও অন্ত নাই। মমতা ধনীর কন্যা, তাহার উপর যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী হয়, তাহা

হইলে পার্থিব সুখের চরম শিখরে চড়িতে আর তাহার বাকী রহিল কি ? কিন্তু মমতা বয়সে তাহার চেয়ে বড় হইলে কি হয় ? এখনও যেন খুকীই থাকিয়া গিয়াছে। নিজের ভাল-মন্দও নিজে বুঝিতে পারে না। এই বিবাহের সম্ভাবনায় তাহার মনে আনন্দের লেশমাত্র নাই। বাপের উপর সে রীতিমত চটিয়া গিয়াছে। কলেজ খুলিতে আর এক সপ্তাহ বাকী, কোথায় পড়াশুনার ব্যবস্থা সব ভাল করিয়া করিবেন, না কোথাকার এক ভুঁড়িওয়ালা বুড়োর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন! মমতা বিবাহ এখন কিছুতেই করিবে না, বাবা কেন যে অনর্থক এমন করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। আই-এ'তে কি কি 'সবজেক্ট্' লইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতেই সে ব্যস্ত, ভাবী স্বামী-নির্ব্বাচনে তাহার উৎসাহ নাই। যামিনী যদি কিছু আগ্রহ দেখাইতেন, তাহা হইলেও মমতার মনটা একটু অনুকূল হইলেও হইতে পারিত, বলা যায় না। কিন্তু মায়ের যে মত একেবারেই নাই, তিনি যে এই ব্যাপার লইয়া দুঃখই পাইতেছেন, তাহা মমতা বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া তাহার মন একেবারে বিমুখ হইয়া গিয়াছে।

দুপুর শেষ হইতে চলিল। সুরেশ্বর আর সহ্য করিতে না পারিয়া চাকর দিয়া যামিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যামিনী রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকছ কেন ?"

সুরেশ্বর স্বভাবসিদ্ধ কলহের সুরে বলিলেন, "ডেকে এমন কি অপরাধ হয়েছে ? দরকারও ত মানুষের কিছু থাকতে পারে ?"

কিছুতেই চটিবেন না, যামিনী এক রকম পণই করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি শান্তভাবেই বলিলেন, "সেই দরকারটা কি তাই ত জিজ্ঞেস করছি।"

স্বরেশ্বর বলিলেন, "ভদ্রলোকের ছেলেকে চা খেতে ত ডেকে পাঠালে, জোগাড়জাগাড় ঠিক মত হয়েছে ত? এসে না মনে করে, কি এক উজবুকের বাড়ী এলাম।"

যামিনী কষ্টে হাঁসি চাপিয়া বলিলেন, "না, তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না। বাঙালীর ছেলে বই আর কিছু ত নয়? তাঁকে অবাক্ ক'রে দেবার মত কিছু ঘটবে না সম্ভবতঃ।"

কথার স্বরে একটু যে শ্লেষ আছে তাহা স্বরেশ্বর ধরিয়া ফেলিলেন, ঝাঁকিয়া বলিলেন, "নিজের জাঁকেই গেলে। কিসের যে এত জাঁক তাও যদি বুঝতাম—"

আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, যামিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, অনর্থক বক্‌বক্ ক'রো না। বিন্দু-ঠাকুরঝির মাথা ধরেছে, নূতন রান্নার লোকটাকে সব জিনিষ একটা-একটা ক'রে বোঝাতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে ব'সে ঝগড়া করবার সময় আমার নেই। তাহ'লে সব কাজ মাটি হবে। খুকীকে এখনই চুল বেঁধে দিতে হবে, আমার নিজের কাপড়চোপড় বদ্‌লাতে হবে, গা ধুতে হবে। দরকারী কথা কিছু থাকে ত বল, না হ'লে আমি চল্‌লাম।"

যামিনী এমনভাবে কথা প্রায়ই বলেন না, স্বরেশ্বরকে বাজে বকিবার যথেষ্ট অবসরই সচরাচর দিয়া থাকেন। স্বরেশ্বর ঠিক কি করিবেন, অতঃপর কোন্ পথে নূতন কলহের আমদানী করিবেন, তাহা স্থির করিবার আগেই যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কচিছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেলে যেমন মন খুঁৎ খুঁৎ করে, ঝগড়াটার পূর্ণ পরিণতি লাভে বাধা পড়ায় স্বরেশ্বরেরও তেমনই মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল,

কিন্তু সত্যসত্যই কাজ পণ্ড হইবার ভয়ে তিনি আর যামিনীকে ডাকিতে ভরসা করিলেন না।

কিন্তু একলা চুপ করিয়া বসিয়াই বা কতক্ষণ মনে মনে গজরান যায়? অতএব চাকরকে ডাকিয়া একটু গালাগালি করিলেন, সুজিতকে ডাকিয়া একবার ধমকাইয়া দিলেন। তাহার পর মমতা এবং লুসিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবশ্য বকিবার উদ্দেশ্যে নহে।

মমতা মায়ের আদেশ মত তখন সবে গা ধুইয়া বাহির হইয়াছে, লুসি গা ধুইতে গিয়াছে। বাপের ডাকে খোলা চুলটা ঢিপি করিয়া জড়াইয়া ভিজা তোয়ালে হাতেই সে তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া হাজির হইল। সুরেশ্বর মেয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন, "কি মা, এই চান ক'রে এলি নাকি?"

মমতা বলিল, "এই ত গা ধুয়ে বেরুলাম বাবা, লুসি এখনও গা ধুচ্ছে। তুমি ডাকছ কেন?"

কেন যে ডাকিয়াছেন তাহা সুরেশ্বর নিজেও জানেন না। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে দু-দণ্ডও ভুলিয়া থাকে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে সচেতন করিয়া রাখাই তাঁহার ডাকিয়া পাঠানর উদ্দেশ্য, অবশ্য সেটা তলাইয়া নিজেও ঠিক বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। মেয়ের কথার উত্তরে বলিলেন, "তা যাও মা, চুল বেঁধে কাপড়চোপড় ভাল ক'রে প'র গিয়ে। আজ আবার বাইরের লোকজন আসবে কি না? আর দেখ, লুসিকেও বেশ ভাল কাপড়-চোপড় গহনাগাঁটি পরতে বল্‌বে। সে যদি না এনে থাকে ত তোমার মাকে বল্‌বে, তাকে কিছু কিছু আলমারী থেকে বার ক'রে দিতে। এক বাড়ীর দুই মেয়ে দু-রকম সাজলে ভাল দেখায় না। একটি ছেলে আসছে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে, তার সঙ্গে বেশ খোলাখুলি

ভাবে আলাপ করবে,' লজ্জা বা সঙ্কোচ ক'রো না। সে ওসব ভালবাসে না, গান-বাজনা করতে বললে অবশ্য করবে।"

বাপের এতখানি অনাবশ্যক উপদেশ পাইয়া মমতা একটু ভীতভাবেই ঘর হইতে চলিয়া গেল। আগন্তুকের প্রতি মনটা তাহার আরও বিরক্ত হইয়া গেল। কে না আসিতেছেন নবাবপুত্র, তাঁহার জন্য আবার কাণ্ড দেখ না?

যাহা হউক, সে বাপের মুখের উপর ত কিছু বলিতে পারে না? কাজেই ঘরে ফিরিয়া গিয়া সাজ-সজ্জায়ই মন দিল। লুসিকেও ডাকাডাকি করিয়া স্নানের ঘর হইতে বাহির করিল। যামিনীর কাছে চাবি চাহিয়া আনিয়া দু-জনে যথেচ্ছ শাড়ী ব্লাউজ টানিয়া বাহির করিয়া খাটের উপর রঙের বন্যা বহাইয়া দিল। অনেক গবেষণার পর লুসি একটি গাঢ় সবুজ রঙের দক্ষিণী শাড়ী বাছিয়া লইল, মমতা সান্ধ্য মেঘের মত হাল্কা লাল-রঙের একখানা রেশমের কাপড় বাছিয়া লইল, তাহাতে চওড়া সুরাটি জরির পাড় বসান। চুলবাঁধা কাপড়-পরা খুব উৎসাহ সহকারে চলিতে লাগিল।

যামিনী মাঝখানে একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তিনি তখন গা ধুইতে যাইতেছিলেন। বলিলেন, "করছিস্ কি রে? এ যে একেবারে শাড়ীর বান ডাকছে।"

মমতা বলিল, "আমরা আবার তুলে রাখব মা গুছিয়ে। তুমি যাও শীগগির, লোকজন এসে পড়লে বাবা এখুনি বকতে সুরু করবেন। শুধু আমাকে সেই বড় মুক্তোর কণ্ঠীটা দিয়ে যাও, আর লুসিকে গলার জন্যে একটা কিছু দাও।"

যামিনী তাহাদের প্রার্থিত জিনিষ বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

নীচে চাকর, ঝি, মালী, সবাই মিলিয়া বিপুল কোলাহল সহকারে ড্রয়িং-রুম এবং ডাইনিং রুম সাজাইতে লাগিল। কেবলমাত্র দেবেশকে একলা অতিথিরূপে ডাকিলে সে হয়ত সঙ্কোচ অনুভব করিতে পারে, তাই সুরেশ্বর নিজের ছোট ভাই শিশিরকে এবং মিহির, প্রভা এবং বেটুকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দেবেশ শুধু যে কন্যাটিকেই যাচাই করিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে কন্যার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই যাচাই করিবার সুবিধা পাইবে। অতিথিদের আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তা, গৃহিণী, ছেলে-মেয়ে, সকলেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। একখানা গাড়ী ত কারখানায়, আর একটা গাড়ী, যেটি সুরেশ্বরের নিজস্ব বাহন, তাহা মিহিরদের আনিতে গিয়াছে, কারণ তাহাদের গাড়ী নাই। শিশির বড়মানুষ, সে নিজের গাড়ীতেই আসিবে। দেবেশকে প্রথমে গাড়ী পাঠাইবেন সুরেশ্বর ভাবিয়াছিলেন, তাহার পর ভাবিলেন, অতটা আধিক্যতা এখনই ভাল নয়, ছেলেটা ভাবিবে যে, সে না-জানি কোন্ সাত-রাজার ধন এক মাণিক। বাড়ী ফিরিবার সময় না-হয় সুরেশ্বর তাহাকে নিজের গাড়ীতে পাঠাইবেন।

প্রথমেই আসিল মমতার মামার-বাড়ীর দল। প্রভা কথা বলে একাই এক-শর সমান, সে আসিবা মাত্রই তাহার হাসিতে এবং গল্পে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন কি সুরেশ্বরেরও মুখের এবং মনের উপরের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল।

তাহার পরই আসিল দেবেশ। তাহার গাড়ী নাই, কাজেই ট্যাক্সি করিয়া আসিয়াছে। সাধারণতঃ সে হিসাবী মানুষ, কিন্তু আজ তাহাকে গুটি-তিন টাকা খরচ করিতে হইয়াছে, কারণ জমিদার-বাড়ীতে কিছু ভাবী জামাই ট্রামে চড়িয়া আবির্ভূত হইতে পারে না?

দেবেশ আসিতেই সুরেশ্বর নীচে নামিয়া গিয়া, তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। শিশির তখনও আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া তাঁহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর ভাল নাই, অথচ দেবেশকে একেবারে মেয়ে-মজলিসে ফেলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে পারেন না। শিশির থাকিলে সে-ই তাঁহার প্রতিনিধি হইতে পারিত, মিহির হাজার হউক অন্য পরিবারের মানুষ, কন্যার মামা মাত্র।

যাহা হউক, সুরেশ্বর উপরে খবর পাঠাইয়া দিলেন, সকলকে নীচে আসিবার জন্য। নিজে বসিয়া অতিথির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দেবেশ মানুষটি ছোটখাট, তবে রোগা বলিয়া তাহাকে কিছু খারাপ দেখায় না। রংটা বাপের চেয়ে ফরসা, এমন কি বাঙালীর পক্ষে ফরসাই। চোখে চশমা, বেশভূষায় খুব ফিট্‌ফাট।

ছেলেমেয়েদের লইয়া যামিনী, মিহির, প্রভা, সকলে প্রায় এক সঙ্গেই নামিয়া আসিলেন। দেবেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, সুরেশ্বর সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। একসঙ্গে আধ ডজন প্রায় নমস্কার করিয়া তাহার পর বেচারা দেবেশ আবার বসিতে পাইল।

সকলের অলক্ষ্যে সে একবার মমতাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। চশমা চোখে থাকায়, সে চট্ করিয়া কাহারও কাছে ধরা পড়িল না। ভাবিল, মেয়েটির রং খুব ফরসা বটে, অবশ্য সবটাই নিজস্ব, কি তুলির কাছেও কিছু ধার করা তা বলা শক্ত। মুখটা যত নিখুঁৎ বলিয়া শুনিয়াছিলাম, তাহা ত বোধ হইতেছে না। নাকটা আরও সুগঠিত হইলে ভাল হইত। মুখের ভাবটাও যুবতীসুলভ নয়, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে কেমন তাকাইতেছে দেখ না, ঠিক যেন কচি খুকি। অন্য মেয়েটি দেখিতে তত সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে

খুব চালাকচতুর। কিন্তু ভাবী শাশুড়ীটি ত দিব্য দেখিতেছি। এত বয়সে চেহারার এমন জলুশ সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির দেখিতেছি। মোটের উপর মামীশাশুড়ী এবং তাঁহার মেয়ের ধরণ-ধারণই দেবেশের চোখে ভাল লাগিল। যামিনী এবং মমতা উভয়েই সুন্দরী, কিন্তু এক জন পাষাণ-প্রতিমা, আর একজন সবে যেন শৈশব-স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়াছে।

যামিনীর প্রথম দর্শনে দেবেশকে বিশেষ ভাল লাগিল না। বড় বেশী কৃত্রিমতা, যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, স্বাভাবিকতা কোথায়ও নাই। পান হইতে চুণ খসিলেই যেন ইহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে।

বেটু এবং সুজিত হাসি চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে, অতিথি হইতে যথাসাধ্য দূরে বসিয়া রহিল। সুরেশ্বরের কাছে ধমক খাইবার ভয়েই তাহারা ঘরে আসিয়াছিল, না হইলে অতিথিটির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ তাহাদের মনে ছিল না।

১২

সকলেই সকলকে এক-একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু মমতা এ পর্য্যন্ত একবারও দেবেশের দিকে তাকায় নাই। একে ত তাকাইতেই লজ্জা করে, কারণ কি সূত্রে যে দেবেশ আজ এখানে আসিয়াছে, তাহা মমতা ভাল করিয়াই জানে। তবু কৌতূহল বলিয়া একটা জিনিষ ত আছে? মমতার যে এই নূতন মানুষটিকে দেখিতে একেবারেই ইচ্ছা করিতেছিল না তাহা নয়, তবে অন্যেরা—বিশেষ করিয়া মামীমা বা লুসি যদি তাহাকে ঐদিকে তাকাইতে দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে মমতার আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। লুসি ত বাক্যবাণের চোটে মমতাকে অস্থির করিয়া তুলিবে, মামীমাও ঠাট্টা করিবেন। সম্পর্কে মামী হইলে কি হয়, ঠাট্টাতামাসার বেলা প্রভা সকলের সমবয়সী। বেটু এবং খোকাও এই লইয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করিবে, মমতাকে কিছু নাই বলুক।

তবু একবার না তাকাইয়া মমতা থাকিতে পারিল না। তাহার কৌতূহলটাই জয়ী হইল। তাহার বাবা এবং মামা যখন দেবেশের সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত, মা ও মামী এক রাশ খাবারের ব্যবস্থা করিতেছেন, সেই ফাঁকে সে একবার দেবেশকে দেখিয়া লইল। সৌভাগ্যক্রমে দেবেশ তখন অন্য দিকে তাকাইয়া ছিল। মমতার মনে হইল, মানুষটার রংটা বেশ ফরশাই বটে, কিন্তু বড় যেন ফুলবাবুর মত চেহারা। পুরুষমানুষ এই রকম

হইলে কি মানায়? তাহাদের সর্ব্বাগ্রে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হওয়া দরকার। আর একজন ছেলের কথা মমতার মনে পড়িল। সে ফরশা নয়, কিন্তু যথার্থ পুরুষের মত চেহারা তাহার। কাহারও গাড়ী অচল হইলে দেবেশ কি গাড়ী ঠেলিতে পারিত? কথনই না।

শিশির এতক্ষণে আসিয়া পৌছিয়া, খুব জোর গলায় যামিনীর কাছে নিজের সময় মত না-আসিতে পারার কারণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ছোট বউ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তাঁহার কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যামিনী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, কারণ ছেলেমেয়েদের এ সকল বিষয়ে এখনই বেশী জ্ঞান দান করিতে তিনি ব্যগ্র ছিলেন না।

এ পর্য্যন্ত স্থরেশ্বর ভিন্ন কেহই দেবেশের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলে নাই। দেবেশ ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কারণ সে এখানে স্থরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করিবার জন্য আসে নাই। যামিনীর উচিত তাহাকে আদর-আপ্যায়ন করা, মমতার না-হয় লজ্জা করিতে পারে। যামিনী না-হয় মস্ত বড় মানুষের গৃহিণী, কিন্তু দেবেশই বা কি ফেলনা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইঁহারাই আর অত ঘটা করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন না।

যামিনীও দেখিতেছিলেন, তাঁহার অতিথির মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসিতেছে, কারণটাও ঠিকই ধরিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করিবেন, তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিলেন না। বাল্যকাল হইতে যামিনী মুখচোরা, কাহারও সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আলাপ স্থরু করিতে কোনও দিনই তিনি পারেন না। অগত্যা প্রভাকে তিনি টিপিয়া দিলেন, "একটু ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও না ভাই, বৌ! দেখছ ত কেমন মুখ আঁধার ক'রে ব'সে আছে?"

প্রভা তৎক্ষণাৎ দেবেশের কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল। সে এ-সব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। দেবেশও বিরক্তি ভুলিয়া গিয়া গল্পে মজিয়া গেল। যামিনীর উপর অভিমানটা তাহার একেবারে দূর হইল না। যামিনীকে তাহার নিজের খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহারও যদি দেবেশকে খানিকটা অন্ততঃ ভাল লাগিত তাহা হইলে দেবেশ খুশী হইত।

যামিনী জলযোগের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। লুসি আর মমতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে খাবার দিতে লাগিল। পাশেই মস্ত বড় ডাইনিং-রুম, সেখানে কৈলাস চাকর আইসক্রীম্ ফ্রীজারের হাতল ঘুরাইতেছে দেখা গেল। বেটু এবং সুজিত তৎক্ষণাৎ সেইখানে গিয়া জুটিল। এ ঘরে তাহারা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মমতা এবং লুসিও খানিক ঘোরা-ফেরা করিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল, ততটা সঙ্কোচ আর তাহাদেরও রহিল না। দেবেশের সামনে খাবারটা অবশ্য লুসিই দিয়া আসিল।

প্রভা বলিল, "ও কি, আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না? আপনাদের বয়সে আমরা ও ক'টা জিনিষ এক নিশ্বাসে শেষ করতাম।"

দেবেশ বলিল, "তাহ'লে এখনও তাই করা উচিত। সে দিনগুলো খুব বেশী দিন গত হয়েছে ব'লে ত মনে হচ্ছে না?"

প্রভা ভাবিল, "বাবাঃ, এ যে দেখি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমাকে কি শালাজ ঠাউরেছে নাকি? আমি যে মামী-শাশুড়ী হ'তে চলেছি, সে খেয়ালই নেই।"

মুখে বলিল, "সে ত একেবারে পাষ্ট-হিষ্ট্রী। সে যাক্ গে, সব জিনিষ ঘরে তৈরি, কিছু ফেল্‌লে মনে করব যে ভাল হয় নি।"

অগত্যা দেবেশকে আর একটু খাওয়ার পরিমাণ বাড়াইতে হইল।

এমন সময় যামিনী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে চা দেব কি? যা গরম আজ, অনেকেই চা খেতে চাইছেন না।" দেবেশ আপ্যায়িত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক পেয়ালা পেলে ভাল হয়।" যামিনী সরিয়া গেলেন, প্রভা দেবেশের অলক্ষ্যে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া লইল।

শিশিরও প্রায় প্রভার জুড়িদার। নিজের পিতৃব্যত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া মমতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বর পছন্দ হ'ল? বেশ ত টুকটুকে, তোর পাশে বেশ মানাবে।"

মমতা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যাও কাকাবাবু, তুমি ভারি ফাজিল।" সে সারা সন্ধ্যা আর শিশিরের কাছেই ঘেঁষিল না।

দেবেশ দূর হইতে খুড়া-ভাইঝির দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিক আঁচ করিয়া লইল। ভাবিল, "বাঃ, ঠোঁট ফুলিয়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে মেয়েটি একটু বেশী খুকীভাবাপন্না।" তাহাকে লইয়া যে ইহারই মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ইহাতে সে সন্তুষ্টই হইল।

জলখাবার খাওয়া এক পালা শেষ হইল। মিহির, সুজিত আর বেটুর আর এক পালা আরম্ভ হইল, অন্যরা আইসক্রীম খাইতে মন দিল। সুরেশ্বর মমতা আর লুসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বেশী আইস্‌ক্রীম্ খেয়ে যেন গলা ধরিয়ে ফেলো না, গান করতে হবে দু-জনকেই।"

লুসি চুপি চুপি বলিল, "ইস্, গান আমি করলাম আর কি?" কিন্তু মনে মনে সে জানিত গান তাহাকে করিতেই হইবে, ভাগ্যে সেতারটা লইয়া আসে নাই, না হইলে বাজাইতেও হইত। এ সব বিষয়ে প্রভা অতি সতর্ক। কোনও মজলিসে মেয়ের কি কি বিদ্যা আছে, তাহা দেখাইবার সুযোগ সে কখনও ছাড়ে না।

বাবার কথা শুনিয়া অভিমানেই মমতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কি যাহার তাহার সামনে তাহাকে এমন করিয়া খেলো করা? বাবার যতই আভিজাত্যের অহঙ্কার থাক্, এদিকে ত দেখি মেয়ের আত্মসম্মানের ভাবনা কিছুমাত্র নাই। যতটা না আইস্‌ক্রীম খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল, রাগিয়া সে তাহার চেয়ে অনেক বেশী খাইয়া ফেলিল।

সুরেশ্বর ভয়ে ভয়ে বিশেষ কিছুই খাইতেছিলেন না। অথচ ভোজন-বিলাসী মানুষের পক্ষে খালি বসিয়া বসিয়া অন্যের খাওয়া দেখা বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার। তাই খাওয়া-দাওয়াটা তিনি চটপট চুকাইয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন। শ্যালক এবং ছোট ভাইয়ের উপর তাঁহার রীতিমত রাগ হইতেছিল, তাহারা ক্রমাগত খাইয়া চলিয়াছে বলিয়া।

লুসি আইস্‌ক্রীমের প্লেট সরাইয়া রাখিতেই তিনি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবার একটা গান আরম্ভ হোক, কেমন?"

প্রভা তাড়াতাড়ি বলিল, "সেতার-টেতার নেই বুঝি? গানের চেয়ে বাজনাটাই ওর হয় ভাল।"

যামিনী বলিলেন, "সেতার ত নেই ভাই। বেহালা আর এস্রাজ আছে, ও বুঝি শুধু সেতারই বাজায়?"

সুরেশ্বর চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিছু কি এ বাড়ী থাকবার জো আছে? সেতার-টেতার কত কি ছেলেবেলা বাজিয়েছি, তা কে বা সেগুলোর খোঁজ রাখছে!"

যামিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সুরেশ্বরকে কোনওদিন কোনওপ্রকার বাজনা বাজাইতে তিনি দেখেন নাই। সেতার এ বাড়ীতে কখনও চোখে পড়িয়াছে বলিয়া ত তাঁহার বোধ হইল না। কিন্তু বাহিরের এক

ভদ্রলোকের ছেলে বসিয়া, তাহার সামনে ত এ-সব লইয়া স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে না? স্বামীর অবশ্য অত বাছবিচার নাই।

শিশির তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেকি দাদা? কোন্ সেতারের কথা বলছ? সেই বাবার আমলের সেটা? বৌদিদি বোধ হয় সেটা কোনও কালে চোখেও দেখেন নি।"

সুরেশ্বর একটু কোণঠাসা হইয়া বলিলেন, "হুঁ:, সেটা কেন শুধু, কত ছিল। তা কোথায় উড়ে-পুড়ে গেছে।"

প্রভা এ-সব বাক্‌বিতণ্ডা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লুসিকে ঠেলিয়া অর্গ্যানের কাছে বসাইয়া দিল। লুসিকে অগত্যা গান আরম্ভ করিতেই হইল।

দেবেশ আইস্‌ক্রীমের প্লেট নামাইয়া রাখিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে গান শুনিতে আরম্ভ করিল। লুসির গান তাহার বেশী কিছু ভাল লাগিল না, তবু গানের শেষে সে খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রভার দেবেশ সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা উচ্চ হইয়া গেল।

সুরেশ্বর এইবার মমতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এইবার তোমার পালা মা। লুসি দেখ বল্‌বামাত্রই কেমন রাজী হয়েছে।"

মনে মনে যতই আপত্তি থাক, এত লোকের সামনে মমতা তাহা প্রকাশ করিতে পাইল না। তাহাকেও গিয়া বাজনার কাছে বসিয়া গান আরম্ভ করিতে হইল। তাহার গান দেবেশের ভালই লাগিল। ভাল ত সবই। দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, বাপের টাকা আছে, মেয়েরও নানা একম্‌প্লিশমেণ্ট আছে। খালি বয়সের উপযুক্ত চাল্‌চলন যদি হইত। বয়স ত দেখিয়া মনে হয় সতের-আঠার হইতে পারে। এ বয়সের ঢের মেয়ে দেবেশের দেখা আছে, তাহাদের পরিবারে নারীজাতিরই সংখ্যাগত

প্রাধান্য। তাহারা সব এই বয়সে এক-এক জন মস্ত গিন্নীবান্নী ছেলে-পিলের মা। মমতাকে দেখিয়া কিন্তু বো[illegible] না যে সে পুতুল খেলা ছাড়া আর কিছুতে এখন মন দেয়।

মমতার গানের সকলেই প্রশংসা ক[illegible] প্রভা দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গানটান করেন না?"

দেবেশ বলিল, "আজ্ঞে না, ও সব মোটেই আসে না, তবে গান-বাজনা শুনতে আমি খুবই ভালবাসি।"

মিহির হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, দিদি ত এককালে চমৎকার পিয়ানো বাজাতে, এখন আর বাজাও না?"

সুরেশ্বর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "তাই নাকি, কই কখনও শুনেছি ব'লে ত মনে পড়ছে না?"

প্রভা ক্যাঁট করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা শুনবেন কেন? বিয়ের পর কি আর নিজের স্ত্রীর গানবাজনা কখনও কানে ঢোকে? অন্যের স্ত্রী কানেতারা বাজালেও তাই. তখন বেশী মিষ্টি লাগে।"

শিশির, মিহির, দেবেশ, সকলেই হাসিতে লাগিল। ছেলেমেয়ের সামনে তাঁহাকে এমন ভাবে খোঁচা দেওয়াতে সুরেশ্বর অবশ্যই চটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রভা শালাজ মানুষ, কান মলিয়া দিলেও তাহাকে কিছু বলিবার উপায় নাই। অগত্যা সুরেশ্বরকে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসিতে হইল।

কিন্তু দেবেশ কথাটা পড়িতে দিল না। বলিল, "আমি ভাল বাজনার খুব ভক্ত, যদিও ঘন ঘন সে-সব শোনার সৌভাগ্য আমার হয় না।"

শিশির বলিলেন, "হ্যাঁ, বাজাও না বৌদি, আমিও ত প্রায় ভুলে গেছি যে তুমি কোনওদিন বাজাতে।"

যামিনীর কাহারও সামনে বাজাইতে ভাল লাগিত না। বাজানর অভ্যাসটা অবশ্য তিনি বরাবরই রাখিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র শ্রোত্রী ছিল মমতা। মায়ের বাজানর সে পরম ভক্ত। কত মানুষ অতি বাজে বাজায়, তাহারা লোক সমাজে কত বাহবা নেয়, আর, তাহার মা এত ভাল বাজাইতে পারেন, অথচ কেহ তাহা শুনিতে পায় না, ইহা মমতার একটা আপ্‌সোসের বিষয় ছিল।

যামিনীকে অগত্যা বাজাইতেই হইল। দেবেশ একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। ভদ্রমহিলা শুধু রূপবতী নন, রীতিমত গুণবতীও বটেন, এত ভাল বাজনা সে বাঙালীর মেয়ের কাছে আর শুনিয়াছে বলিয়া ত মনে পড়িল না। সুরেশ্বরকে সে বনিয়াদী হিন্দু জমিদারই মনে করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইল যে অন্দর মহলটি তাঁহার নানা দিকেই বেশ আধুনিক। সকল দিকেই আধুনিক হইলে দেবেশের সুবিধা হইত। মা-বাপের মনোভাব বোনদের মারফতে কিছু কিছু সে জানিতে পারিয়াছিল। এই মেয়ের সঙ্গে কোর্টশিপ করিতে গেলেই হইয়াছে আর কি? রবীন্দ্রনাথের নব-বঙ্গদম্পতীর প্রেমালাপের অবস্থা হইবে বোধ হয়। মমতাকে দেখিলে মনে হয়, পুষিমেনী এবং টোপাকুলের প্রতিই তাহার বরের চেয়ে বেশী অনুরাগ হইবে।

যামিনীর বাজনা শেষ হইতেই সবাই খুব জোর গলায় তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে আরম্ভ করিল। সুরেশ্বরেরও বাজনাটা ভাল লাগিয়াছিল, তবে সে-বিষয়ে কিছু বলা তিনি অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। ভাল লাগিল না খালি সুজিতের। মায়ের এ-সব মেমসাহেবী সে একেবারে পছন্দ করিত না। তিনি যদি অনন্ত ও বাজুবন্ধ পরিয়া সারাদিন ঝি-চাকরদের বকিতেন এবং সুজিতের জন্য দিনে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না

করাইতেন, তাহা হইলেই সে খুশী হইত। বনিয়াদী চাল যে কিরূপ হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে তাহার মতামত তাহার পিতার চেয়েও কড়া ছিল।

চা খাইতে আসিয়া সারারাত কিছু আর বসিয়া থাকা যায় না। দেবেশের যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, তবু তাহাকে উঠিতে হইল। সুরেশ্বর তাহাকে যখন-খুশী আসিবার জন্য বার-বার করিয়া বলিতে লাগিলেন। যামিনী একবারও বলিলে সে ঢের বেশী খুশী হইত, কিন্তু তিনি তাহাও বলিলেন না। প্রভা অবশ্য অনেক কথা বলিয়া গেল। তাহাদের বাড়ী যাইতে সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। যামিনীর যে এ বর পছন্দ হয় নাই তাহা সে জানিত, অতএব ভবিতব্যের কথা বলা যায় না ভাবিয়া সেও একটু টোপ ফেলিয়া রাখিল।

এবার আর দেবেশকে ট্যাক্সি করিয়া যাইতে হইল না। সুরেশ্বর তাহাকে নিজের গাড়ীতেই পাঠাইয়া দিলেন। বেটু এবং সুজিত তাহাকে পৌঁছাইতে চলিল।

প্রভা বলিল, "লুসীকে আজ নিয়ে যাই, কেমন ঠাকুরঝি ?"

যামিনী কিছু বলিবার আগেই মমতা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "এখনই কেন নিয়ে যাবেন মামীমা ? এখনও ত স্কুল খোলে নি ? আমার কলেজ আর ওর স্কুল খুল্‌লে ত আর মাসে একদিনও দেখাসাক্ষাৎ হবে কিনা সন্দেহ।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, তবে থাক আর দু-চার দিন। আমার যে একলা আর দিন কাটে না। খোকাকে ত দু-দণ্ডও বাড়ীতে পাবার জো নেই।"

১৩

দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিটা অবশেষে ফুরাইয়া গেল। যেদিন লুসির স্কুল খুলিল, তাহার আগের দিনই সে বাড়ী চলিয়া গেল। মমতার কলেজ খুলিবে আর কয়েকদিন পরে, কি কি পড়িবে, বাড়ীতে মাষ্টার রাখিতে হইবে কিনা, এই লইয়া মা-মেয়েতে দিনরাত আলোচনা হইতে লাগিল।

সুরেশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না যে মমতা আর কলেজে যায়। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখার বিরুদ্ধে ত তিনি চিরকালই ছিলেন, এখন অল্পবিদ্যার উপরেও চটিয়া উঠিতেছেন। যে-শিক্ষা মেয়েকে এমন করিয়া তোলে যে পুরুষের বিধিদত্ত শ্রেষ্ঠতা সুদ্ধ স্বীকার করিতে তাহারা ভুলিয়া যায়, সে শিক্ষা কোনও কাজের নয়। মমতাকে নিজের মনের মত করিয়া মানুষ করিতে পাইলেন না, এই তাঁহার বড় একটা দুঃখ থাকিয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীর জ্বালায় তাঁহার ইচ্ছামত কিছু করিবার জো কি? সারাদিন ছিনেজোঁকের মত পিছনে লাগিয়া আছে। আর মেয়েও হইয়াছে তেমনই মা-অন্তপ্রাণ। মায়ের অঙ্গুলি-হেলনেই সে উঠিতেছে বসিতেছে। সুরেশ্বর যামিনীকে খোঁচা মারিতে যতই ভাল বাসুন, নিজের মেয়ের চোখে জল আসিবে ভাবিতেই কাতর হইয়া উঠেন।

সুতরাং মমতাকে কলেজে পাঠানই স্থির হইয়াছে। দেবেশের বিলাত যাত্রা করিতে এখনও মাস দুই তিন দেরি আছে, সেখানেও সে অন্ততঃ

পক্ষে দুইটা বছর কাটাইয়া আসিবে। তত দিন মেয়ে বাড়ী বসিয়া থাকিয়াই বা করিবে কি? গানবাজনা, ছবি আঁকা, শেলাই এবং কায়দা-দুরস্ত ভাবে ইংরেজী বলা, এই ক'টা শিখিলেই সুরেশ্বরের মতে যথেষ্ট হইত, কিন্তু এ বাড়ীতে ত আর কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম নয়? মেয়ের মারফতে গৃহিণী সব কাজই নিজের মর্জ্জিমত উদ্ধার করিয়া লন। তা মেয়ে কলেজেই পড়ুক। মেয়েদের কলেজ, আশা করা যায় মেয়ে সেখানে নিরাপদেই থাকিবে, য. না দিনকাল পড়িয়াছে, কোথা দিয়া কি বিপদ্ ঘটে কিছু বলা যায় না। মাও কুপরামর্শ দিতে ওস্তাদ, মেয়ে একটা কিছু গোল বাধাইয়া এমন চমৎকার সম্বন্ধটা নষ্ট করিয়া না দেন, তাহা হইলেই হয়।

কলেজেও খুলিয়া গেল। যামিনীই মমতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া আসিলেন। এখানকার স্কুলেই মমতা পড়িত, কাজেই তাহার ভয় বা সঙ্কোচ কিছু হইল না। সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া নূতন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সে মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একলা-একলা থাকিয়া তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। যামিনী তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। মেয়েকে কলেজে দিতে পারিয়া তিনিও খানিকটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। মেয়ের মানুষ হওয়া, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারার ক্ষমতা থাকা কত যে দরকার তাহা যামিনীর মত হাড়ে হাড়ে অল্প [illegible]কেই বুঝিতে হয়। মমতা যাহাতে স্বামীর হাতের পুতুল না হয়, এমনই ভাবেই তাহাকে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা যামিনীর মনে ছিল। স্বামী যথাসাধ্য তাঁহার সকল ইচ্ছাতেই বাদ সাধিবেন তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তিনিও প্রাণ থাকিতে জেদ ছাড়িবেন না, সে-বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মমতাই

এখন জীবনের তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। ছেলের সব আশা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে পূরাপূরি সুরেশ্বরের বংশধরই হইবে, আরও এক কাঠি সরেশ না হইলেই হয়।

সুরেশ্বরের শরীর এখনও সামলায় নাই। গরমটা ভাল করিয়া কাটিয়া না গেলে ভাল থাকিবার আশাও ছিল না। এই দারুণ গরমে এখানে তাঁহাকে আটকাইয়া পড়িয়া পচিতে হইল কেবল মেয়ের মঙ্গল ভাবিয়া, কিন্তু মেয়ে কি তাহা ভুলিয়াও মনে করে? মায়ের প্ররোচনায় সেও ত ক্রমে পিতাকে শত্রু মনে করিতে শিখিতেছে। এ ধারণাটি কি কারণে সুরেশ্বরের মস্তিষ্কে গজাইয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কারণ তাঁহার প্রতি ব্যবহারে মমতার কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না।

পূজার সময় সুরেশ্বরের দার্জ্জিলিঙ যাইবার ইচ্ছা, এখন ডাক্তারটি মত করিলেই হয়। যামিনীই হয়ত তাঁহাকে টিপিয়া দিয়া থাকিবেন। নারী-জাতির কথা পুরুষমানুষে সহজে ঠেলিতে ত পারে না? যামিনী কোনও কালেই দার্জ্জিলিঙ যাইতে চান না, এ তাঁহার এক রোগ। কারণটা যে কি তাহা আজ অবধি সুরেশ্বর ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। সত্য বটে যে যামিনীর মা জ্ঞানদা দার্জ্জিলিঙে মারা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় কি? মা-বাপ কাহারও চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না, কোনও না কোনও স্থানে তাহারা মারা যাইবেই। তাই বলিয়া কি সে-সব দেশ আর জন্মে মাড়াইতে হইবে না?

দেবেশের আর এ বাড়ীতে আসা সেই দিনের পর ঘটিয়া উঠে নাই। যতই তিনি ব্যাপারটাকে পাকা করিয়া তুলিতে চান, ততই কেমন করিয়া সব যেন ওলটপালট হইয়া যায়। এ বাড়ী হইতে ফিরিয়াই দেবেশ একপালা সর্দ্দিজ্বরে পড়িল। কেমন করিয়া জানি না, তাহার দারুণ ঠাণ্ডা

লাগিয়া গিয়াছিল। জ্বর ছাড়িতে-না-ছাড়িতে দেশে জমিজমা লইয়া কি এক গণ্ডগোল বাধিল, গোপেশবাবু পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন, তিনি যাইতে পারিলেন না, অগত্যা দেবেশকেই চলিয়া যাইতে হইল। সে এখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে নাই। নিতান্ত কনেদেখা গোছের সে একবার মমতাকে দেখিয়া গিয়াছে মাত্র, তাহাদের ভিতর একটা কথাও হয় নাই। ইহাতে কতদূর কি কাজ হইবে তাহা সুরেশ্বর বলিতে পারেন না। কিছু কাজ না হওয়াই সম্ভব! দেবেশের মেজাজটি বেশ সাহেবী বলিয়া খ্যাতি আছে, সে শুধু একবার চোখে দেখিয়া কোনও মেয়েকেই বিবাহ করিতে রাজী হইবে না। মমতা সুন্দরী ও গুণবতী বটে, কিন্তু এমন অত্যাশ্চর্য্য কিছু নয় যে একবার দর্শনেই মানুষ নিজের মতামত সব ভুলিয়া যাইবে। গোপেশবাবুর কাছ হইতে অতি অমায়িক চিঠি আরও গুটি কয়েক আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সুরেশ্বর ভুলিতেছেন না। গোপেশ-বাবুর টাকাটা হাতে পাওয়া অনতিবিলম্বে প্রয়োজন, তিনি ত অমায়িক চিঠি লিখিবেনই? কিন্তু বিবাহ ত তিনি করিবেন না, করিবে ভাবী সিভিলিয়ন দেবেশ, কাজেই তাহার মুখ হইতে পাকা কথা না শুনিয়া সুরেশ্বর অগ্রসর হন কিরূপে? একলা একলা এত ভাবনা ভাবিতে গিয়া সুরেশ্বরের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া যাইতেছে। মেয়ের বিবাহের ভাবনা চিরকাল মেয়ের মা বেশী করিয়া ভাবে, কিন্তু এক্ষেত্রে মা'টিও চমৎকার। বিবাহ না দিতে পারিলে তিনি বর্ত্তিয়া যান।

কলেজে ঢুকিয়া মমতা প্রথম প্রথম পৃথিবীর আর সব কিছুই ভুলিয়া গেল। কত নূতন সঙ্গিনী জুটিয়াছে, প্রফেসররাও সব নূতন, এক-এক জন কি সুন্দর পড়ান। মমতা এখন কলেজের মেয়ে হইয়াছে, তাহার পদ-মর্য্যাদা বাড়িয়াছে কত! শিক্ষকরা পর্য্যন্ত কেহ কেহ তাহাদের 'আপনি'

সম্বোধন করিয়া কথা বলেন। তাহাদের নিজেদের বসিবার ঘর আছে। লাইব্রেরী হইতেও তাহারা বই নিতে পারে, এই রকম কত কি সুবিধা। এক রবিবার মামার বাড়ী গিয়া সে সারাটা দিন লুসির কানের কাছে কলেজের গুণগান করিয়া তাহার হাড় জ্বালাইয়া দিল।

লুসি এইবার ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে, কলেজে ঢুকিতে তাহার প্রায় এক বছর দেরি। কাজেই কলেজের গল্প তাহার বেশী ভাল লাগিল না। মমতাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "কি খালি কলেজ, আর কলেজ! ভারি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ নয়? কেউ আর কোনওদিন কলেজে যায় নি যেন।"

মমতা একটু আহত হইয়া বলিল, "তা হলে কিসের গল্প করতে হবে?"

লুসি ফট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দেবেশবাবু আর তোদের বাড়ী একবারও এসেছিলেন?"

মমতা বিরক্তমুখে বলিল, "না, তাঁর গল্পটা বুঝি তোমার কানে ভারি মিষ্টি লাগবে?"

লুসি মাথা দোলাইয়া বলিল, "তা ত লাগতেই পারে? ভাবী ভগ্নী-পতি হাজার হ'লেও।"

মমতা তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল, "যাঃ, ভগ্নীপতি না আরও কিছু! আমি বিয়ে করলাম আর কি? তোর যদি এত পছন্দ তবে তুইই করগে যা।"

পাশের ঘরে প্রভার সাড়া পাওয়া যাইতেছিল। লুসি তাই ফিশ্ ফিশ্ করিয়া বলিল, "তাঁর ত আমায় পছন্দ হবে না গো? আমি ত জমিদারের মেয়ে নই?"

মমতা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "টাকাটাই ওদের আসত পছন্দ, মানুষ যে একটা কেউ হ'লেই হ'ল। ভাবলেই আমার গা জ্ব'লে যায়।"

লুসি বিজ্ঞভাবে বলিল, "ও ত পৃথিবীর সনাতন নিয়ম, ও নিয়ে রাগ ক'রে আর হবে কি? তবু এটা এক দিক্ দিয়েভাল, মা-বাপদের মেয়েদের জন্তেও কিছু খরচ করতে হয়, নইলে হতভাগা ছেলেগুলো ত সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ব'সেই আছে।"

মমতা বলিল, "মেয়েদের জন্তে খরচ করা আর কি হ'ল? টাকাটা ত আর তাদের রইল না? সেই হতভাগা ছেলের দলেরই একজনের গর্ভে ত গেল?"

এমন সময় প্রভা খাইতে ডাকায় তাহাদের আলোচনাটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না।

দেবেশ দেশে চলিয়া যাওয়াতে যামিনী খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। নিত্য এই এক ব্যাপার লইয়া সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া করা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। নিজেরও ইহাতে কোনও শান্তি থাকে না, সুরেশ্বরেরও শরীর খারাপ হয়। তাঁহার যদি পলাইবার কোনও জায়গা থাকিত, দিন-কয়েকের জন্য অন্ততঃ মেয়েটাকে লইয়া পলাইয়া বাঁচিতেন। কিন্তু যাইবেনই বা কোথায়? সামনে পূজার ছুটিতে যদি ভাই-ভাজের সঙ্গে কোথাও যাইতে পারেন, তাহার আগে কোনও সুবিধা নাই। তখনও সুরেশ্বর যাইতে দিতে রাজী হইলে হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়া যামিনী অন্যত্র আরাম করিতেছেন, এ ধারণা মাথায় আসিলে কখনও তিনি যাইতে দিবেন না।

মমতার কলেজের দিনগুলি বেশ একটির পর একটি করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। স্কুলের দলের সকলেই প্রায় তাহারা এক সঙ্গে পড়িতেছে।

অলকার সাজপোষাকের ঘটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর নাকি তাহারও এক আই-সি-এস্ পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে, কাজেই অলকা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পড়াশুনায় তাহার আর মন নাই, কোনও কালই অবশ্য ছিল না। বাড়ীতে নাকি তাহার জন্য একজন মেম শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই রাখা হইবে, কায়দাকানুন এবং ইংরেজী বলা ভালমতে শিখাইবার জন্য। কলেজের প্রফেসররা অত ভাল ইংরেজী নাকি বলিতে পারে না। মমতার জন্য কেন যে তাহার মা বাবা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন না, তাহা অলকা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। সেও ত ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরেই ভবিষ্যতে যাইবে? তাহার জন্য ত উপযুক্ত ভাবে তৈয়ারী হওয়া দরকার। ক্লাসের মেয়েরা কেহ অলকাকে দেখিতে পারে না, তাহার নিত্য রাজাউজীর মারা শুনিতে শুনিতে সকলের হাড় জ্বালাতন হইয়া যায়, মমতার সঙ্গে অনেকেরই বেশ ভাব হইয়াছে।

বর্ষা নামিয়াছে খুব। কলিকাতার লোকের তাহাতে খুব বেশী অসুবিধা নাই। রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া গেলে ঘণ্টা কয়েক সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু বাংলা দেশের অনেক স্থানেই ভীষণ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছে। গৃহহীন, আশ্রয়হীন নরনারীর আর্ত্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। সুরেশ্বরের জমিদারীর ভিতরেও কয়েক জায়গা ভাসিয়া গিয়াছে। তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য ঘন ঘন আবেদন আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার যে কানে সে-সব ঢুকিতেছে, তাহাই বোধ হয় না। তাঁহার ধারণা প্রজারা দুষ্টামী করিয়া বাড়াইয়া বলিতেছে।

যামিনীর প্রাণে ব্যাপারটা বড়ই আঘাত দিতেছিল। স্বামী তাঁহার কথা নিশ্চয়ই শুনিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, তবু একবার কথাটা না-তুলিয়া পারিলেন না। কে যেন ভিতর হইতে সারাক্ষণ তাঁহাকে

খোঁচাইতেছে। এত আরাম উপভোগ করিতেছেন তাঁহারা যাহাদের খাটুনির ফলে, তাহারা আজ দলে দলে অনাহারে নিরাশ্রয় মরিতে বসিয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহার কি কিছু করিবার নাই ?

শরীর খারাপ, পাছে খাওয়া-দাওয়ায় ডাক্তারের উপদেশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, সেই ভয়ে যামিনী এখন [illegible]ই সুরেশ্বরের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকেন। ইহা লইয়াও কথাকাটাকাটি হয়।

যামিনী যথাসম্ভব চুপ করিয়া থাকেন, নিতান্ত না পারিলে এক-আধটা জবাব দেন।

আজ খাইতে বসিয়া সুরেশ্বর নিজেই কথাটা তুলিলেন। বলিলেন, "দেখছ, আজও এক গাদা কেমন চিঠি এসেছে ? একেবারে নাছোড়বান্দা।"

যামিনী বলিলেন, "মরতে বসলেও যদি মানুষ নাছোড়বান্দা না হয়, ত কিসে হবে ? তুমি কিছু যে করছ না, সেটা কি খুব ভাল হচ্ছে নাকি ?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তুমিও যেমন, যত ছোটলোকের কথায় বিশ্বাস কর। একখানাকে দশখানা ক'রে বলা ওদের চিরকালের স্বভাব। ওদের কথা শুনে চল্‌লেই আমার জমিদারী করা হয়েছিল আর কি ?"

যামিনী বলিলেন, "দেশ জুড়ে সবাই মিথ্যা কথা বল্‌ছে, এ কখনও হয় ? যদি এতই অবিশ্বাস তোমার, নিজে গিয়ে একব[illegible] দে'খে এস।"

সুরেশ্বর চটিয়া বলিলেন, "যাবার মত আমার শরীরটা খুব রয়েছে না ? সে ভাবনা ত তোমার কত। তুমি নিজে যাও না সেই অজপাড়াগাঁয়ে, দু-দিনে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে এখন।"

যামিনী বলিলেন, "আমি যেতে এখনই রাজি আছি, যদি আমার

যাওয়ায় কিছু কাজ হয়। কিন্তু তুমি ত আর আমার কথায় বিশ্বাস করবে না? সেই জন্যই বলছি যে তোমার নিজে গিয়ে দেখা ভাল। গুষ্টিসুদ্ধ নবাবী করছি যাদের খাটুনির ফলে, তারা দলে দলে না খেয়ে জলে ভিজে মরছে, আর আমরা খাটের উপর ব'সে আছি, এ একটা মহাপাপ ব'লে আমি মনে করি।"

সুরেশ্বরের রাগ হইল অত্যন্তই, কিন্তু কি ভাবে উত্তর দিলে যামিনী সবচেয়ে খোঁচা খান, তাহা তিনি কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। গজ গজ করিতে করিতে বলিলেন, "নিজের কাপড় গহনা যা আছে, সব দিয়ে দাও না গিয়ে, প্রাণে যদি এতই দয়া? দয়ার ধাক্কাটা আমার ঘাড় দিয়েই বা যায় কেন?"

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "বেশ তাই দেব, তখন যেন আমায় দোষ দিতে এস না।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া এখন সুরেশ্বরের আপসোস হইতে লাগিল। যামিনী যে-রকম মানুষ, অনেক টাকার জিনিষপত্র দিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অন্য কোনও কারণে না হোক, স্বামীকে জব্দ করিবার জন্যই তিনি তাহা করিবেন। ঘরে বাহিরে এত জ্বালাতন মানুষে সহ্য করে কি করিয়া? খাওয়া শেষ না করিয়াই সুরেশ্বর উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার 'ব্লাড প্রেসার' আজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। চাকরকে বলিলেন ডাক্তারবাবুকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিতে।

যামিনী চাকরের মুখে খবর শুনিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল আবার? এই ত বেশ ছিলে?"

সুরেশ্বর খাটে শুইয়া "উঃ, আঃ" করিতেছিলেন। বলিলেন, "এত

ংপাতে মানুষের, শরীর কখনও ভাল থাকে? অসুখ করবে না কি?"

যামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "জগতে থাকতে লেই নানা অশান্তি ঘটে, তার আর উপায় কি? তা তোমার যদি তে এতই শরীর খারাপ হয়, তাহ'লে জমিদারীর চিঠিপত্র আর তুমি ড়ো না। আমিই দেখব, খুব কিছু দরকারী থাকলে তোমায় জানাব। চিঠি লিখে তাদেরও কিছু লাভ হচ্ছে না, প'ড়ে তোমারও কিছু লাভ হচ্ছে না।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু ঘরে তুমিও ত আমায় নিষ্কৃতি দাও না?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ, আমিও আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।"

সুরেশ্বরের মনের ভার তবু কমিল না। তিনি বলিলেন, "বলবে না ত, কিন্তু এমন কিছু ক'রে বস্‌বে যে তা ... য়ে হাজার কথা বলাও ভাল মনে হবে।"

যামিনী হতাশ হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি হ ... ল তোমার নিজের সুবিধে হয়, তাই না-হয় ব'লে দাও।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "সে কি আর এক কথায় ব ... য়, একটু বুঝে চল্‌লেই পার? মোট কথা, এখন হট্‌ ক'রে কত ... না গয়নাগাঁটি যেন দিয়ে ব'সো না।"

যামিনী হাসি চাপিয়া বলিলেন, "আচ্ছা," বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই বিকালে মমতা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কলেজের মেয়েরা চাঁদা তুলছে মা, বন্যার জন্যে। আমি কি দেব?"

যামিনী তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট দিয়া বলিলেন, "এইটা

এখন ত দাও, তার পর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে। আমাদের ত আরও, ঢের বেশী দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমার বাবার এখন অসুখ, কিছু বলতে গেলেই বিরক্ত হন, তাই কি ভাবে কি দেব, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি।”

মমতা বলিল, “মা, টাকা দিতে না পারলেও অন্য জিনিষ ত দেওয়া যায়? ছেঁড়া কাপড়সুদ্ধ তারা নিচ্ছে। আমাদের ত দুই-তিন আল্‌মারী বোঝাই কাপড়, কোনও জন্মে অত কাপড় আমরা প'রে উঠতে পারব না, কিছু কিছু দিয়ে দিলে হয় না?”

যামিনী বলিলেন, “ও সব সৌখীন কাপড় গরীব-দুঃখী মানুষের কি কাজে লাগবে, মা? তাদের মোটা কাপড় দরকার। তুমি ভেবো না, আমরা কোনও উপায়ে কিছু দিতে পারবই।”

মমতা বলিল, “দেশবন্ধু পার্কে এরই জন্যে খুব বড় সভা হবে মা, আমরা যাব? মেয়েদের জন্যে আলাদা জায়গা থাকবে।”

যামিনী বলিলেন, “ভেবে দেখি।” তিনি জানিতেন, সোজাসুজি সুরেশ্বরের কাছে এ প্রস্তাব করিলে কখনও তিনি রাজি হইবেন না। অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মেয়ের প্রাণেও যে দুঃখীর জন্য দরদ জাগিয়াছে দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন। সুজিত আসল বাপ-কা বেটা, টাকা উড়াইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত, টাকা কোথা হইতে আসে সে ভাবনা তাহার নয়।

১৪

মমতা স্কুলের চাঁদার ঝুলিতে দশ টাকার নোটখানা ফেলিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তাহার আরও ঢের বেশী দেওয়া উচিত ছিল। একে ত সে অন্যদের চেয়ে ধনী পিতার কন্যা, তাহার উপর তাহাদের ধন যাহাদের পরিশ্রমের ফলে অর্জিত, সেই মানুষগুলিই আজ বন্যাপীড়িত। মায়ের হাতে ত টাকা থাকে ঢের, কিন্তু তিনি যথেচ্ছ খরচ করিতে পারেন না, তাহা মমতা জানে। বাবাকে সে ভালবাসে, সন্তানের যেমন ভালবাসা উচিত, কিন্তু এখন মমতার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বরের দোষত্রুটিগুলিও তাহার চোখে পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি যেন বড় বেশী স্বার্থপর, বড় বেশী জেদী। মমতার এক-একবার ইচ্ছা করে, বাবার সঙ্গে খোলাখুলি এই বিষয়ে আলোচনা করে, কিন্তু আবার সঙ্কোচ বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। পিতার সঙ্গে এভাবে কথা বলিতে কোনওদিনই সে অভ্যস্ত নয়। তিনি যদি খুব বেশী বিরক্ত হইয়া উঠেন?

মা শুধু তাহার মা নহেন, সঙ্গিনীও বটেন। মমতার যত গোপন মনের কথা, সব হয় মায়ের সঙ্গে। আর একটি বোন থাকিলে যে জায়গা নিতে পারিত, বোনের অভাবে মা হইয়াও যামিনীকে সেই স্থান অধিকার করিতে হইয়াছে।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মায়ের ঘরে গিয়া মমতা দেখিল, তিনি কাহাকে যেন চিঠি লিখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন খুব বেশী ব্যস্ত আছ মা ?"

যামিনী চিঠির কাগজের প্যাড্‌টা সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "না মা, এই ত হয়ে গেল।"

মমতা খাটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি দশ টাকা দিয়ে এলাম মা, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। কালকের সেই মিটিঙে আমরা যাব ত মা ?"

যামিনী বলিলেন, "সেই জন্যেই ত তোর মামীমার কাছে চিঠি লিখছি, দেখি সে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কি না।"

মমতা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি পারবেন মা ব্যবস্থা করতে ?"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "দেখাই যাক না, পারতেও পারে।"

মমতা পুরাপুরি আশ্বস্ত না হইলেও, খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কাপড় চোপড় বদ্‌লাইতে চলিয়া গেল। আকাশ জুড়িয়া ঘন কাল মেঘের রাশি ফুলিয়া ফুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বাগানে বেড়ান আজ আর হইবে না, হঠাৎ হয়ত ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিবে, আর ভিজিয়া মরিতে হইবে। তাহার চেয়ে ছাদেই বেড়ান যাক্।

নিজের চুলবাঁধাটা এখনও মমতার ভাল করিয়া আসে না। যামিনীর মেয়েরই উপযুক্ত চুল হইয়াছে তাহার। যেমন গোছে, তেমনই লম্বায়। এত একরাশ চুল নিজে সে ভাল করিয়া গুছাইয়া বাঁধিতে পারে না। কোনও-দিন মা বাঁধিয়া দেন, কোনওদিন বিন্দুপিসিমা, অভাব পক্ষে নিত্যঝি। আজ আর তাহার কাহারও কাছে আবেদন করিতে ইচ্ছা হইল না।

কোনও মতে একটা বিনুনী ঝুলাইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে একলা ঘুরিতে ভাল লাগে না, কিন্তু আর কোথায়ই বা সে যায়?

আজ ক্লাসে ছায়া বলিতেছিল, তাহাদের পাড়ার ছেলে অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হইয়া বন্যাপীড়িতের সাহায্যার্থ যাইতেছে। অমরেন্দ্রও যাইবে হয়ত। তাহাকে এক দিনের পরিচয়ে মমতা যতখানি চেনে, তাহাতে মনে হয় এ সব কাজে সেই সবার আগে অগ্রসর হইয়া যাইবে। মমতা কেন যে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল তাহার ঠিকানা নাই। যদি পুরুষ হইত, তাহা হইলে সেও ত যাইতে পারিত। সুজিতটা ত একেবারে অপদার্থ, কোনওরকম ভাল কাজে তাহার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। খালি বাবুগিরি করিতে আর আভিজাত্য ফলাইতে তাহার ভাল লাগে। মমতা ছেলে হইয়া সে মেয়ে হইলে মন্দ হইত না। মেয়েদের পরের ইষ্ট করিবার ক্ষমতা যেমন কম, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাও তেমনই কম।

যামিনী প্রভাকে চিঠি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সোজাসুজি সভায় যাইতে গেলে সুরেশ্বর চেঁচাইয়া হাট বসাইয়া দিবেন। কিন্তু ভাইয়ের বাড়ী যাইতেছেন শুনিলে কিছুই বলিবেন না, যদি না মেজাজটা বেশী রকম খারাপ থাকে। প্রভার সঙ্গে যামিনীর সম্পর্কটা খুব যে মধুর তাহা নয়, মনে মনে কেহই কাহাকেও পছন্দ করেন না, কিন্তু দু-জনেই দু-জনের কাজে লাগেন, সময়ে অসময়ে, কাজেই খানিকটা মানাইয়া চলিতেই হয়। যামিনী ধনী গৃহিণী প্রয়োজনমত টাকাকড়ি চাহিলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায় এবং টাকা শোধ করিবার জন্য তিনি কোনও দিনই পীড়াপীড়ি করেন না। যামিনীও ভাইয়ের বাড়ী গিয়া অনেক কাজ উদ্ধার করিয়া আসেন, যাহা নিজের বাড়ী বসিয়া করা যায় না।

প্রভা চিঠি পাইয়াই হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আপদ্ যাহোক!

মানুষটাকে যেন সোনার খাঁচায় পূরে রেখেছে, একটু পা নাড়বার জো নেই।"

মিহির তখন কাজ হইতে ফিরিয়া চা খাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি চিঠিখানার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "দেখি? কে আবার কাকে সোনার খাঁচায় পূরল?"

প্রভা চিঠিখানা স্বামীর হাতে আগাইয়া দিয়া বলিল, "কে আবার, তোমার দিদিটি। টাকার উপর ব'সে আছে, কিন্তু মানুষটার কোনও সুখ নেই বাপু।"

সুখ যে নাই তাহা মিহিরের অজানা নয়। যামিনীর বিবাহের সময় সকল কথা বুঝিবার মত বয়স না হইলেও, বেশ খানিকটা বুঝিবার বয়স মিহিরের হইয়াছিল। যামিনীর বিবাহিত জীবনের গলদ কোথায় তাহাও জানিতে মিহিরের বাকী নাই। প্রতাপ তাঁহারই গৃহশিক্ষকরূপে এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে যে ভাবে বিদায় করা হইল, তাহার অর্থ তখন না বুঝিলেও পরে মিহির বুঝিয়াছিলেন। যামিনীর মন যে তখন হইতে একেবারে ভাঙিয়াছে, এবং সুরেশ্বরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়াও সে-ভাঙা কোনওদিনই জোড়া লাগে নাই, একথা বুঝিতে দেরী হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীর সহিতও এ-সব কথা তিনি বেশী আলোচনা করেন না, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, পুরাতন ক্ষত খোঁচাইয়া লাভ কি? যামিনী এখন সন্তানের জননী, বৃহৎ সংসারের গৃহিণী, তাঁহার প্রথম যৌবনের দুঃখ-নিরাশার কাহিনী হয়ত তাঁহার নিজেরই এখন ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, অন্যেরও ভুলিয়া যাওয়াই উচিত।

চিঠিখানা পড়িয়া তিনি স্ত্রীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? টাকার উপর ব'সে থাকলেও তোমাদের জাতের সুখ নেই;

আমি ত মনে করি, এ ছাড়া আর কিছুতেই তোমাদের সুখ নেই।”

প্রভাকে বেশ টানাটানি করিয়াই সংসার চালাইতে হয়, কারণ মিহিরের আয় বেশী নয়। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বচসারও অন্ত নাই।

খোঁচা খাইয়া প্রভাও ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল, “তোমাদের বুঝি ট্যাঁক খালি থাকলে সুখের সীমা থাকে না? যাকে ভোগ ভুগতে হয় সেই বোঝে। কোনও ঝক্কি ত ঘাড়ে নাও না, ঠাট্টা করা কাজেই তোমাদেরই সাজে।”

মিহির তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, “যাক গে, ও তর্কে আর দরকার নেই, ও ভাবনা ত সারা জীবনই চল্‌বে। এখন দিদি যা লিখেছেন তাই কর। দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাও, তাঁর গাড়ী-খানা থাকলে তুমিও বেশ খানিক বেড়িয়ে আসতে পারবে। মিটিঙে যেতে চাও, তাই যাবে, না-হয় অন্য কোথাও ঘুরে আসবে। এমনিতে তোমার ত ঘর ছেড়ে বেরনোই হয় না। লুসিও বাঁচবে মমতাকে পেয়ে।”

এ সব ক'টা সম্ভাবনার কথাই প্রভা আগে ভাবিয়া লইয়াছে। সুতরাং দেরী না করিয়া সে যথাবিহিত নিমন্ত্রণ করিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। কাল একটু বাজার-খরচ বেশী করিতে হইবে, তা আর কি করা যাইবে বল?

সুরেশ্বরের মধ্যরাত্রির আগে শুইতে যাওয়া কোনওকালেই অভ্যাস ছিল না। এখন ডাক্তারের উৎপাতে বন্ধুবান্ধব সব বাড়ীতে আসা বারণ হইয়া গিয়াছে, আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ। যদি বা লুকাইয়া কিছু করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাও স্ত্রীর জ্বালায় কিছু হইবার জো নাই। তিনি যেন সারাক্ষণ সেপাইয়ের মত দরজা আগলাইয়া আছেন। এত খবরদারি সহাও যায় না, আবার বিদ্রোহ করিবারও উপায় নাই, শাস্তি

নিজেকেই পাইতে হয়। অসুখটা সুরেশ্বরের নিতান্তই সত্য, তাহার ভিতর কাল্পনিক কিছু নাই, পান হইতে চূণ খসিলে তাঁহারই অসোয়াস্তি ও যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

তবু আজ সন্ধ্যার সময় তিনি নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও গুটি দুই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই মানুষ ক'টির যাইবার কোনও স্থান নাই, সুরেশ্বরের আড্ডা ভাঙিয়া যাওয়ায় ইঁহারা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। আরও দু-একবার ডাক্তারের নি[illegible] অমান্য করিয়া প্রবেশের চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু নীচে হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। আজ গৃহস্বামী নীচে থাকাতে ঢুকিবার সুবিধা হইল। সুরেশ্বর মহোৎসাহে তাঁহাদের ডাকিয়া বসাইলেন। আর কিছু না হোক একটু গল্প ত করা যাইবে, খানিকটা তাসও ত খেলা যায়? সময়মত শুইতে গেলেই হইবে।

এমন সময় প্রভার চিঠি আসিয়া হাজির। সুরেশ্বর ড্রাইভারকে ডাকিয়া চিঠিখানি চাহিয়া লইলেন। সকলের সব চিঠি খুলিয়া পড়া তাঁহার রোগ, অবশ্য তাঁহার চিঠি খুলিবার হুকুম কাহারও নাই।

প্রভা চিঠিখানা যথেষ্ট সাবধান হইয়া লিখিয়াছে। সুরেশ্বর বুঝিলেন, যামিনী এবং মমতার নিমন্ত্রণ কি একটা মেয়ে মজলিশে। যাইতে বারণ করাও যায় না, আবার ভালও লাগে না। ঘরের গৃহিণী ঘরের বাহিরে গেলেই সুরেশ্বরের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, অবশ্য ঘরেও তাহার সহিত সুরেশ্বরের মুখ-দেখাদেখি নাই। চিঠি পড়িয়া, আবার তিনি পত্রবাহকের হাতে ফিরাইয়া দিলেন, সে উপরে চলিয়া গেল।

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খারাপ খবর নাকি?"

সুরেশ্বর ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "নাঃ, খারাপ আর কি ! তা কালও একবার এস এই সময়, একটু চা-টা হবে।" যামিনীই যখন ফুর্ত্তি করিতে যাইতেছেন, তখন তিনিই বা কেন একটু না করেন ? সাবধান হইয়া চলিলে আর ভাবনা কি ? ডাক্তাররা সর্ব্বদাই বাড়াবাড়ি করে, তাহাদের সব কথা অত মানিয়া চলা যায় না।

যামিনী চিঠি পড়িয়া, মমতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর মামীমা কাল দুপুরে আমাদের খেতে বলেছে। লুসির সঙ্গে খুব গল্প করবার সুবিধা হবে।"

মমতা ব্যাপারটা বুঝিল, তবে সে-বিষয়ে কিছু মন্তব্য করিল না। বলিল, "বেশ ত, কাল রবিবার আছে, অনেকক্ষণ থাকতে পারব।"

যামিনী সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘর তখনও অন্ধকার, নীচে সমানে আড্ডা চলিতেছে। আজ বাড়াবাড়ি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলে সুরেশ্বর কাল আর, যামিনীকে বাড়ীর বাহির হইতে দিবেন না। কি করা যায় ? যামিনী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মমতা তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে নীচের থেকে ডেকে আনব মা ?"

সুরেশ্বরের বন্ধুর দল শিশু-অবস্থা হইতে মমতাকে দেখিতেছে, অনেকে কোলে পিঠেও করিয়াছে। কাজেই তাহাদের সামনে মমতাকে পরদা বাঁচাইয়া চলিতে হয় না। মানুষগুলিকে বিশেষ পছন্দ করে না বলিয়া সে বড় তাহাদের সামনে যায় না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে না যাইতে পারে এমন নয়। আজ সে চটিজোড়া পায়ে দিয়া, সশব্দে নীচে নামিয়া চলিল। সিঁড়ির পাশেই সুরেশ্বরের খাস বসিবার ঘর, বড় ড্রয়িংরুমটি একটু সামনে।

পায়ের শব্দে সকলেই চাহিয়া দেখিল। সুরেশ্বর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছ মা?"

মমতা বলিল, "বেশী রাত হয়ে যাচ্ছে, তাই তোমায় ডাকতে এসেছি। খাবার সময় হয়ে গিয়েছে।"

সুরেশ্বর মনে মনে চটিলেও এতগুলি মানুষের সামনে কিছু বলিলেন না। আর মমতাকে কিছু বলা তাঁহার নিয়মও ছিল না। একেই তাহার বাপের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ নাই, যদি আরও কমিয়া যায় সেই এক ভয়। হয়ত যামিনীই মেয়েকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সে-কথা মমতাকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। অগত্যা তাঁহাকে উঠিতে হইল। বন্ধুদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কত অভিভাবক জুটেছে দেখছ ত? কাল তাহ'লে এস এখন," বলিয়া মমতার সঙ্গে উপরে উঠিয়া চলিলেন। বন্ধুর দল বিদায় হইয়া গেল।

মমতা কাছে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল; এবং শোবার ঘরে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বাতি নিবাইয়া তবে বিদায় হইল। মেয়ের যত্নে সুরেশ্বরের মন একটু নরম হইল বটে, কিন্তু যতটা হইতে পারিত, ততটা হইল না এই ভাবিয়া যে সমস্তটাই যামিনীর শেখান, এবং ইহার তলে তাঁহার একটা মতলব আছে।

পরদিন সকাল-সকাল স্নান করিয়া কাপড় পরিয়া মমতা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। যামিনী তাহার উৎসাহ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সকালে অনেক কাজ, সে-সব শেষ না করিয়া তিনি নড়িতে পারিবেন না। বিকালের সব ব্যবস্থাও ভাল করিয়া বিন্দু-ঠাকুরঝিকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে হইবে, না হইলে সুরেশ্বর আর রক্ষা রাখিবেন না।

সভায় ত যাইবেন, কিন্তু সেখানে গিয়া কি দিবেন, কি ভাবে দিবেন, ইহাই সারা সকাল যামিনী ভাবিতেছিলেন। কিছু ভালরকম না দিলে মমতা অত্যন্তই মুষড়াইয়া পড়িবে, এবং না দিলে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? যামিনীর গহনাগাঁটি নিজস্বও অনেক আছে, যাহা তিনি বাপের বাড়ী হইতে বা অন্যত্র হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। তাহা দান করিবার অধিকার তাঁহার যথেষ্টই আছে, কিন্তু সুরেশ্বর তাহা বুঝিবেন না, এবং জানিতে পারিলে মহা কোলাহলের সৃষ্টি করিবেন। গহনা দিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বেশী কারণ তাহা চেনা যায়। টাকা দেওয়া সহজ, কারণ টাকার গায়ে নাম লেখা থাকে না। তবে টাকা দিবার অধিকার তাঁহার নিজের কতটা আছে, তাহা যামিনী বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সাধারণ ভাবে, স্বামীর অর্থে স্ত্রীর অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাঁহার আর সুরেশ্বরের সম্বন্ধ সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত নয়। টাকা তাঁহার কাছে থাকে যথেষ্টই, সুরেশ্বর হিসাব কিছু বুঝেন না, কাজেই টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখিতেও চান না।

ভাবিয়া কিছু কিনারা হইল না। কোনও অন্যায় কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন না, ইহাই যথেষ্ট স্থির করিয়া যামিনী অবশেষে এক তাড়া নোট্ই বাহির করিয়া লইয়া হাতব্যাগের ভিতর রাখিলেন, এবং স্নানাদি করিয়া মেয়েকে লইয়া যাত্রা করিলেন। সুরেশ্বর নিজের শুইবার ঘরে বসিয়া ছিলেন, মমতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার নেমন্তন্ন নেই?"

মমতা বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আজ খালি মেয়েদের ব্যাপার বাবা, তা ছাড়া খোকাকে মামীমা ডাকলে ও যেতে চায় না।"

সুজিত বাপের পছন্দগুলি অনেকটাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে। মা বা মায়ের আত্মীয়স্বজন কাহারও প্রতি তাহার প্রীতি

নাই। সুরেশ্বর ইহাতে ছেলের উপর খুশীই, তবে সে যে পড়াশুনায় একেবারে মন দেয় না, ইহা তাঁহার ভাল লাগে না। সত্য বটে তাহাকে চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না, কিন্তু আজকাল শুধু টাকার গুণে মানুষের কাছে খাতির পাওয়া যায় না। তাহারা সামনে খোষামোদ করে বটে, কিন্তু আড়ালে বিদ্রূপ করে। সুরেশ্বরের আগে তাঁহাদের বংশে পড়াশুনার বেশী রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা দুই ভাইই কলেজের পর্ব্ব প্রায় শেষ করিয়াছিলেন; ছেলেটা যদি ম্যাট্রিকও পাশ না করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার নাম থাকিবে না। যামিনীর ইহাতে যথেষ্টই ত্রুটি আছে, তিনি ছেলের পড়াশুনা দেখেন না কেন?

"সবাই আছে নিজের তালে, ছেলেটা যে বয়ে যেতে বসেছে সেদিকে খেয়ালই নেই," বলিয়া তিনি বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া একখানা খবরের কাগজে মন দিলেন।

১৫

প্রভা বাহির হইয়া আসিল ননদকে অভ্যর্থনা করিতে, লুসি ত ছুটিয়া অসিয়া মমতাকে দুই হাতে জড়াইয়াই ধরিল। বলিল, "বাপরে বাপ্, তোমার আর দেখা পাবারই জো নেই, একেবারে ডুমুরের ফুল।"

মমতা বলিল, "আর তুমি বুঝি রোজ রোজ আমাকে দেখা দিতে যাও?"

লুসি বলিল, "আমার কি গাড়ী আছে তোমার মত?"

মমতা বলিল, "আহা গাড়ীখানা যা আমার তা আর ব'লে কাজ নেই। একবার চড়ে কলেজে যাই, এইমাত্র গাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, এখন গাড়ীর তর্ক থামিয়ে স্নানটা সেরে এস দেখি চট ক'রে। রান্নাবান্না কবে সেরে, আমি হাঁ ক'রে ব'সে আছি।"

লুসি স্নান করিতে চলিল। মমতা বাড়ীময় ঘুরিতে লাগিল, যামিনী বসিয়া ভাজের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "সভায় যেতে এত ব্যস্ত যে দিদি? তোমার ভাইটি ত একেবারে নারাজ, বলেন দিদির পয়সা আছে ব'লে কি ক'রে ওড়াবে তাই খালি ভাবছে।"

যামিনী বলিলেন, "খুকী ছাড়ে না, তা ছাড়া আমিও কিছু দেওয়া দরকার মনে করছি। পয়সা যাদের দৌলতে, তারাই মরতে বসেছে, এ

সময় কিছু না-করাটা অমানুষের কাজ। উনি ত নিজের শরীর নিয়ে এমন ব্যস্ত যে কিছু করবার কথা ভাবতেই পারেন না।"

প্রভা বলিল, "তা ত ঠিকই। তোমরা যদি গরিবদুঃখীকে না দেবে ত দেবে কে? আমাদের না-হয় ক্ষমতাই নেই, কিন্তু দেওয়া যে কতখানি দরকার তা ত বুঝি। নিজেরা যারা অভাবে থাকে, তারাই বোঝে অভাবগ্রস্তের দুঃখ।"

প্রভার অবশ্য দু-হাতে ছড়াইবার টাকা নাই, তাই বলিয়া হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থাও তাহার নয়। কিন্তু সুবিধা পাইলেই যামিনীকে সে নিজের দুঃখের কথা জানাইয়া রাখে। কখন কাজে লাগিয়া যায় বলা যায় কি?

ইতিমধ্যে লুসি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া খাইতে বসিলেন। প্রভা বলিল, "আজ মাছটা লুসি রেঁধেছে, কেমন হয়েছে দিদি?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ ত হয়েছে, লুসি ত দেখি কাজকর্ম্ম দিব্যি শিখছে। খুকী ত এখনও রান্নাবান্না পারে না।"

মমতা বলিল, "তুমি শেখাও না কেন? আমি ত শিখতেই চাই।"

প্রভা বলিল, "তোমার দরকারই বা কি? রাজরাণী হবে, কোনওদিন হাঁড়ি হাতেও করতে হবে না। আমাদের ছেলেপিলেকে খেটে খেতে হবে, তাদের সবই জানাশোনা দরকার।"

যামিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "অমন আশীর্ব্বাদ ক'রো না বৌ। রাজরাণী যেন ওকে না-হ'তে হয়, দুঃখের ভাত সুখের ক'রে খেতে পারে তাহলেই ঢের।"

মমতা আলোচনাটায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বাস্তবিক

রান্নাবান্না শিখিবার,তাহার সখ খুবই, কিন্তু মা বিশেষ কিছু তাহাকে বলেন না, তাই তাহারও শিখিবার চাড় হয় না। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, সে বিন্দুপিসীর কাছে কালই রান্না শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিবে।

খাওয়া হইয়া গেল। প্রভার দিনে ঘুমান অভ্যাস, যামিনী কখনও দিনে ঘুমান না। তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া নিজে ঘুমান ঠিক হইবে কি না ভাবিয়া প্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যামিনী অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "তুমি একটু গড়িয়ে নাও বউ, আমি একটু এই বইগুলো নাড়ি-চাড়ি।"

লুসি এবং মমতা খাটে শুইয়া গল্প জুড়িয়াছিল। প্রভা নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। যামিনী একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া মাসিক-পত্র উল্টাইতে লাগিলেন। সভা হইবে বিকালবেলায়, সে এখনও ঢের দেরী। চা খাইয়া বাহির হইলেই চলিবে।

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া আসিল। প্রভা উঠিয়া চায়ের আয়োজন করিয়া ফেলিল। লুসি মমতাকে বলিল, "দিদি, তুমি কাপড়-খানা ছাড়বে ত? বড্ড যে ধাম্‌সে গিয়েছে, প'রে বেরনো যায় না।"

সত্যই মমতা এত গড়াগড়ি দিয়াছে যে শাড়ীখানির দুর্গতির আর কিছু বাকী নাই। অগত্যা তাহাকে লুসির শাড়ীই একখানা পরিতে হইল। যামিনী সারা দুপুর বসিয়াছিলেন, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভালই ছিল। যথাসময়ে তাঁহারা যামিনীর গাড়ী চড়িয়া সভাস্থলে যাত্রা করিলেন।

পার্কে তখন রীতিমত ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে অনেক কষ্টে তাঁহারা চারজন মেয়েদের দিকে গিয়া বসিলেন। যামিনী একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, কাছাকাছি তাঁহার চেনাশোনা

কেউ আছে কি না। দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে কেহই নাই। বাস্তবিক তাঁহাকে চেনেই বা কে? কোথাও তিনি নিজে যান না, মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কই চুকিয়া গিয়াছে। কুমারী অবস্থায় যাও বা দু-চার জন বাহিরের মানুষের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল, এখন তাহাদেরও দেখিলে চিনিতে পারেন কিনা সন্দেহ। নিজের বাপের বাড়ীর আত্মীয় কয়টি ছাড়া, তাঁহার বাড়ীতেও বিশেষ কেহ যায় না।

মমতা এধার-ওধার চাহিয়া আবিষ্কার করিল, কলেজের মেয়েরা কয়েক জন আসিয়াছে। তাহার ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে ছায়াকে কাছে দেখিতে পাইল। দুই জনে চোখে চোখে সংবাদের আদান-প্রদান একটু হইল বটে, কিন্তু লোকের ভীড় ঠেলিয়া কাছে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না।

সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গোলমাল সারাক্ষণই চলিতেছিল, কাজেই বক্তাদের সব কথা ভাল করিয়া শোনা যাইতেছিল না। লাল চাঁদার ঝুলি হাতে এধারে-ওধারে মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঝুলিতে টাকাটা-সিকিটা ফেলিয়া দিতেছে। বেশীর ভাগ অপেক্ষা করিয়া আছে, কাছে আসিয়া চাঁদা চাহিলে তখন দিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সভার উদ্যোক্তারা বুঝিতে পারিলেন, ইহার পর লোকজন চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং এইবার চাঁদা-আদায়ের কাজ আরম্ভ হইল। মমতা উৎসুকভাবে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। সব মানুষই কিছু কিছু দিতেছে। মা কি আনিয়াছেন, তাহা সে ঠিক জানিত না। নিশ্চয়ই ভাল রকম কিছু আনিয়াছেন। কিন্তু নিজে সে খালি-হাতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার দুঃখ হইতে লাগিল। যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া চাঁদার ঝুলি ধরিবে, তখন তাহাকে

কেমন অপ্রস্তুত হইতে হইবে? ... অনেকখানি দূরে বসিয়া, এখন তাঁহার কাছ হইতে কিছু সংগ্রহ করাও কঠিন।

হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। অনেকগুলি মানুষ টাকা সংগ্রহ করিতেছিল, সকলের মুখের দিকে মমতা অত চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ একজন যুবক ঝুলি হাতে করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মমতা চাহিয়া দেখিল, ... অমরেন্দ্র। ইহাকেও কিনা রিক্তহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে? ছিঃ, মমতাকে কি সে মনে করিবে? সে ত জানে, মমতা ধনীর কন্যা। নিশ্চয়ই অমর মনে করিবে, মমতা অতি অমানুষ, হৃদয়হীনা, গরীবের আর্ত্তের দুঃখে তাহার মনে কিছু মাত্র বেদনার সঞ্চার হয় না।

বিস্ফারিত নেত্রে সে অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। কত লোক কত কি দিতেছে। একটি মেয়ে হাত হইতে একগাছি চুড়ি খুলিয়া ঝুলির ভিতর ফেলিয়া দিল। এইবার মমতার পালা, অমর ঠিক তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মমতা চোখ তুলিয়া চাহিতে গিয়া চাহিতে পারিল না, ভাল করিয়া ভাবিবার ক্ষমতাও যেন তাহার চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে গলার হার-ছড়া খুলিয়া ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হারটা ঝুলিতে দিয়াই কি একটা অদৃশ্য শক্তির টানে সে আবার চোখ তুলিয়া চাহিল। অমরেন্দ্র তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু তখনই সে মমতার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। মমতা তাহার চোখের দৃষ্টিতে কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, কি যেন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মমতার সমস্ত অস্তিত্বের উপর দিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, কেন, যে তাহা সে বুঝিতে পারে না। বুকের কম্পন তাহার

থামিতে চাহে না কেন? এমন ত কিছু ঘটে নাই, তবু মমতার শরীর মন এমন করিয়া থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে কেন?

যামিনী দূর হইতেই মমতার দান দেখিতে পাইলেন। তিনি ঝুলিতে পাঁচ শত টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন, মমতা আর কিছু না দিলেও চলিত। কিন্তু দিয়াছে যে তাহার জন্য দুঃখ নাই, এখন সুরেশ্বর জানিতে পারিয়া চেঁচামেচি না করেন তাহা হইলেই হয়।

যে-ছেলেটির ঝুলিতে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, সে একখানা খাতা বাহির করিয়া বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা একবার লিখে দিতে চাই।"

যামিনী বলিলেন, "আমি নাম দিতে চাই না, 'জনৈক মহিলা' ব'লেই লিখে নিন্।" যুবক অগত্যা সরিয়া গেল।

সভা এইবার ভাঙিবার মুখে, লোকজন অনেকেই উঠিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মমতা উঠিয়া পড়িয়া, লোক ঠেলিতে ঠেলিতে যামিনীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি কি কীর্ত্তি করেছি জান মা?"

যামিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখলাম ত।"

মমতা বলিল, "তুমি রাগ কর নি ত মা?"

যামিনী বলিলেন, "আমি রাগ করি নি মা, খুশীই হয়েছি, তবে তোমার বাবা জানলে হয়ত বিরক্ত হবেন।"

মমতা ক্ষুব্ধভাবে চুপ করিয়া রহিল। বাবার কথা তখন তাহার একেবারেই মনে ছিল না। ভাল কাজেও বিরক্ত হওয়া তাঁহার এক স্বভাব। কি আর করা যাইবে? অদৃষ্টে বকুনি থাকে, বকুনি খাইতে হইবে। বকুনি খাইলে সে কিছু মরিয়া যাইবে না, বরং দান করার

জন্য কিছু দুঃখ যে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইহাতে দানটা সার্থকই হইবে। কিন্তু বাবা যদি ইহার জন্য মায়ের উপর জুলুম করেন, তাহা হইলে মমতার পক্ষে তাহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় হইবে। বাবার যা স্বভাব, তাহাই ঘটিয়া বসা আশ্চর্য্য নয়।

মেয়ের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া যামিনী বলিলেন, "থাক, অত ক'রে ভেবে আর কি হবে? তুমি ত অন্যায় কাজ কিছু কর নি? যাতে ওটা তোমার বাবার চোখে না পড়ে তারই চেষ্টা করতে হবে আর কি।"

মমতার মুখের অন্ধকার খানিকটা কাটিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দিলে মা?"

যামিনী বলিলেন, "পাঁচ-শ টাকা দিয়েছি।" লুসি এবং প্রভা অনেক চেনা মানুষ খুঁজিয়া পাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল, যামিনী মমতাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ্ ত তোর মামীমাকে এদিকে আন্‌তে পারিস কিনা। বাড়ী ফিরতে বেশী রাত হ'লে উনি আবার বকাবকি করবেন।"

লুসির সাহায্যে মমতা গিয়া প্রভাকে ডাকিয়া আনিল। প্রভা কাছে আসিয়াই বলিল, "মা মেয়ে মিলে খুব কাণ্ডই করলে যাহোক্।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার চোখে কিছুই এড়ায় না দেখি। এখন চল ত, রাত হয়ে আস্‌ছে।"

প্রভা গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "যাক্, আমি যে বিশেষ কিছু দিতে পারি নি, তার জন্যে কোনও দুঃখ রইল না। বোনের দেওয়াও যা, ভাইয়ের দেওয়াও তাই।"

তাঁহার দানের গৌরবটা প্রভাকে বেদখল করিতে দিতে যামিনীর কিছু আপত্তি ছিল না, কিন্তু প্রভা পাছে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ায় সেই এক ভয়। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল, "সে ত ঠিকই, এক জন দিলেই

হ'ল, যে হোক্। তুমি কিন্তু ভাই এ-কথাটা কাউকে যদি না বল ত ভাল হয়। জান ত ওঁকে, অল্পেই এখন ওঁর মেজাজ যায় বিগড়ে, আর তাহলেই শরীরও তখনই খারাপ হ'তে আরম্ভ করে।"

প্রভা বলিল, "ওমা, তুমি আমাকে কচি খুকী পেয়েছ নাকি? লোককে বল্‌তে যাব কেন? আমার পেট থেকে কথা বার করা অমনি সহজ ব্যাপার নয়।"

প্রভা ও লুসিকে নামাইয়া দিয়া যামিনী বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। মমতা সারাটা পথ আর কোনও কথাই বলিল না। হার-দেওয়ার ব্যাপারটা তাহাকে বড় বেশী বিচলিত করিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল অমরেন্দ্রের চোখের গভীর দৃষ্টি, আর হৃৎপিণ্ডের গতি তাহার যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছাইয়া দেখা গেল, নীচের ঘরে মহোৎসাহে সুরেশ্বর আড্ডা জমাইতেছেন। এ-রকম বাড়াবাড়ি করিলে শরীর খারাপ হইতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইবে না। কিন্তু যামিনীর হাত নাই কিছু ইহাতে। এক রকম তাঁহার উপর শোধতোলার উদ্দেশ্যেই যখন আড্ডাটি আহ্বান করা হইয়াছে, তখন তাঁহার অনুরোধে সুরেশ্বরকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাইবে না। তবে তাঁহারা ফিরিবা মাত্রই যে ছুটিয়া আসিয়া সুরেশ্বর হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন না, ইহাতে যামিনী খানিকটা আশ্বস্তও হইলেন।

উপরে উঠিয়া গিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া আর এক ছড়া হার বাহির করিলেন। এটিও অনেকটাই মমতার আগের সেই হারটিরই মত। মেয়ের গলায় সেটা পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রায় এক রকমই দেখতে।"

স্বরেশ্বরের ইচ্ছা ছিল সেদিন বেশ ভাল করিয়া রাত করেন, এবং খাওয়াদাওয়ার অনিয়মও অনেকটা করেন। কিন্তু হঠাৎ মাথাটা ধরিয়া উঠাতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া উপরে শুইতে চলিয়া গেলেন।

চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাবার এইখানেই নিয়ে আসব কি?"

স্বরেশ্বর তাহাকে ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তিনি খাইবেন না।

চাকর গিয়া যামিনীকে খবর দিল। যামিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজেই খবর লইতে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতে চাইছ না কেন? শরীর কি বেশী খারাপ বোধ হচ্ছে?"

স্বরেশ্বর বলিলেন, "এত রাত্রে খেলে আর রক্ষা থাকবে, ভুগে মরব ত আমিই?"

যামিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "সময় মত খেলেই হ'ত।"

স্বরেশ্বর গলা চড়াইয়া বলিলেন, "মানুষগুলো এল, তাদের ফে'লে চ'লে আসা যায় কখনও? একটা সাধারণ ভদ্রতা ত আছে? আর একলা-একলা জেলের কয়েদীর মত মানুষ থাকতেও পারে না। লোকের মুখও ত একটু দেখতে ইচ্ছা করে?"

এত রাত্রে খাইলে সত্যই হয়ত আরও শরীর খারাপ হইবে ভাবিয়া যামিনী চলিয়া আসিলেন, এক রাত নাই-বা খাইলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। সকাল বেলাটা কাটাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারও বিপদ্ কাটিয়া যায়। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস স্বরেশ্বরের খানিকটা আছে। আজকার সভার বিবরণ পড়িয়া, তাঁহার মনে যদি কোনও সন্দেহ

হয় এবং তিনি সোজাসুজি যামিনীকে প্রশ্ন করিয়া বসেন তাঁহা হইলেই মুস্কিল। তাঁহার কাছে কথা লুকান চলে, কিন্তু একেবারে মিথ্যা উত্তর দেওয়া ত যামিনীর দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে না, মেয়েকেও সে-পরামর্শ দিতে তিনি পারিবেন না।

১৬

মমতা দেবেশকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলেও, দেবেশ তাহাকে একেবারেই যে ভোলে নাই, তাহার পরিচয় কয়দিন পরে আবার পাওয়া গেল। গোপেশবাবু সুরেশ্বরকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার ছেলে দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে। মমতাকে ত তাহার খুবই পছন্দ হইয়াছে। আগের কালের কথা হইলে অতঃপর দই-সন্দেশের বায়না দিতে কোন বাধা থাকিত না। তবে এ-সব হইল আধুনিক যুগের ব্যাপার, বর এবং কনে দু-জনেই আধুনিক, সুতরাং তাহাদের মতামত খানিকটা না লইলে চলে না। তিনি ছেলের মত জানিয়াছেন, বিবাহে তাহার সম্পূর্ণ মত আছে। সুরেশ্বর কন্যার মত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাহার পর একটা পাকাপাকি আশীর্ব্বাদ হইয়া যাক। বিবাহ ত দেবেশ বিলাত ঘুরিয়া না আসিলে হইবে না, সুতরাং সম্প্রতি আর কিছু করিবার নাই। তিনি যদিও আধুনিক সমাজের নিয়মকানুন বিশেষ জানেন না, তবু তাঁহার মনে হয়, দেবেশ এবং মমতাকে খানিকটা এখন মেলামেশা করিবার সুবিধা দেওয়া উচিত।

সুরেশ্বর চিঠি পড়িয়া, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু দেখিতে পাইলেন না। এ-সব ত জানা কথাই। দেবেশ বিলাত গিয়া আই-সি-এস

হইয়া আসিবে, তিনি দশ-পনর হাজার টাকা তাহাকে দিবেন এবং সে মমতাকে বিবাহ করিবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া আছে। নিয়মমত তাহারা আসিয়া কন্যা দেখিয়াছে এবং পিতাপুত্র উভয়েই পছন্দ করিয়াছে। না করিবেই বা কেন? তাঁহার মেয়ের মত সুন্দরী, সুশিক্ষিতা মেয়ে ত অলিতে গলিতে গড়াগড়ি যাইতেছে না? আর মমতা যদি সুন্দরী বা সুশিক্ষিতা নাও হইত, তাহা হইলেও কেবলমাত্র তাঁহার কন্যা বলিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। অবশ্য দেবেশের সঙ্গে না হইতে পারিত, কারণ সে যুবক, এবং যৌবনে পুরুষের চোখে সুন্দরী নারী অপেক্ষা কাম্য আর কিছুই থাকে না। ইহা সুরেশ্বর নিজে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, এবং এই জাতীয়, নিজে পছন্দ করিয়া, বিবাহের উপর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি সম্পূর্ণরূপে চটিয়া গিয়াছে। বিবাহ করিয়া তাঁহার না হইল সুখ, না হইল শান্তি। নামেই তাঁহাদের সংসার, নামেই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী। ছেলে মেয়ে দুইটা না থাকিলে, এতদিনে দুই জনে দুই পথে চলিয়া যাইতেন। সুতরাং তিনি এবং গোপেশবাবু কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিবাহটা দিয়া ফেলিতে পারিলে, সুরেশ্বর সব দিক্ দিয়া খুশী হইতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইবার উপায় নাই, পাত্র নিজেই বিরোধী। সে নব্য যুবক, নব্য মতেই কোর্টশিপ করিয়া বিবাহ করিতে চায়। পাত্রীও নব্যা তরুণী, অন্ততঃ বয়সে। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার কোনও সুস্পষ্ট মতামত আছে কিনা তাহা সুরেশ্বর জানেন না। কিন্তু মমতার কথা ত পরে, এই বিবাহ, আধুনিক বা সনাতন, কোনও ভাবেই হওয়ার পথে যে মস্ত একটি বাধা রহিয়াছে তাহা সুরেশ্বর ভুলিতে পারেন না। সে বাধাটি তাঁহার পত্নী যামিনী। দেবেশকে তাঁহার পছন্দ হয় নাই, তাহা সুরেশ্বর উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যদিও অপছন্দের কারণ যে কি তাহা তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু

ঠিক করিতে পারেন নাই। যামিনীর কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।

সকালবেলা হইতেই মেঘলা করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, মধ্যে মধ্যে আবার একটুখানি ফরশা হইবারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এমন দিনে নিজের মনের ভিতর আনন্দের খোরাক যাহার কিছু সঞ্চিত নাই, তাহার মন ভার হইয়া থাকা বিচিত্র নয়। সুরেশ্বর ত রীতিমত বিরক্ত হইয়াই বসিয়া আছেন। এই চিঠি লইয়া যামিনীর সঙ্গে আর এক পালা ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইবে, তাহা জানা কথা। তাঁহার তূণীরে যত চোখা চোখা বাক্যবাণ আছে সবই তিনি প্রয়োগ করিবেন, কারণ স্ত্রী সম্বন্ধে দয়ামায়া বা ভদ্রতাজ্ঞান কোনটাই তাঁহার নাই। কিন্তু এত করিয়াও কোনও বার ত নিজের জেদ তিনি রাখিতে পারেন না। যামিনী চেঁচানও না, গালও দেন না, তবু তাঁহার কথাই থাকে, সুরেশ্বরকে পিছন হটিতে হয়। ইহার কারণ, তিনি ছেলেমেয়েকে ভয় করেন, না হইলে যামিনী সামান্য নারী মাত্র, তাঁহাকে দমাইয়া দিতে আর কি লাগে? তাঁহাদের বংশে স্ত্রী কি করিয়া জব্দ করিতে হয়, তাহা সকলেই জানে, তিনিই কি আর জানেন না? কিন্তু মেয়েকে মা যে হাতের মুঠিতে রাখিয়াছে? মমতা যে জলভরা চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিবে, তাঁহাকে নররূপী পশু মনে করিবে, ইহা সুরেশ্বর সহ্য করিতে পারিবেন না। এই মেয়েটিকে তিনি ভালবাসেন বেশী, না ভয় করেন বেশী, তাহা নিজেও সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইহারই নীরব ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহাকে পদে পদে স্ত্রীর কাছে হার মানিতে হয়।

তাঁহার সকালের চা খাওয়া অনেক ক্ষণ হইল চুকিয়া গিয়াছে। বিছানার পাশে, ছোট টেবিলের উপর এখনও পেয়ালা, পিরিচ, প্লেট সব

ছড়ান। চিঠিখানা পড়িয়া, নানা ভাবনা-চিন্তায় ডুবিয়া ছিলেন, তাই চাকরকে ডাকিবার কথা মনে হয় নাই। তাঁহার বিছানার পাশে সর্ব্বদাই ছোট একটি ঘণ্টা থাকে, তাহা বাজাইলে তবে চাকরবাকর ঘরে আসে। বিনা-আহ্বানে আসিয়া ঘট ঘট করিলে তিনি গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেন।

হঠাৎ কাক আসিয়া একটা পেয়ালা উল্টাইয়া দিল। ভাগ্যে নীচে পড়িল না তাই, না হইলে দামী জিনিষটা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। এ সংসারে সব ব্যবস্থাই এইরূপ। নিজে যাহা না দেখিবেন, তাহা তখনই নষ্ট হইবে। বিরক্ত মুখে সুরেশ্বর ঘণ্টাটা অনাবশ্যক জোরের সহিত বার দুই টিপিয়া দিলেন।

চাকর আসিয়া পেয়ালা পিরিচ গুছাইয়া ট্রেতে উঠাইতে লাগিল। তাহার দিকে চাহিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, "তোদের মাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

চাকর চলিয়া গেল। রান্নাঘরের সামনে বাসন মাজিবার স্থান। সেখানে ট্রেখানা নামাইয়া রাখিয়া আবার উপরে চলিল যামিনীর সন্ধানে। তাঁহাকে বারান্দায়, শয়নকক্ষে বা মমতার ঘরে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দিদিমণি!"

মমতা ভিতর হইতে সাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ?"

চাকর বলিল, "বাবু মাকে একবার ডাকছেন।"

যামিনীর আজ মাথা ধরিয়াছিল, তাই তিনি সকাল সকাল স্নান করিতে ঢুকিয়াছেন। চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইলে হয়ত বাবা আবার চটিয়া বসিয়া থাকিবেন, এই ভয়ে মমতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। চাকরকে বলিল, "আচ্ছা তুই যা। আমি যাচ্ছি বাবার ঘরে।"

যামিনীর আগমন-প্রত্যাশায় মুখখানা যথাসম্ভব বিরক্ত করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর বসিয়া ছিলেন। মমতাকে ঢুকিতে দেখিয় তাঁহার মুখের উপরের ঘন মেঘের আবরণ অনেকখানিই যেন সরিয়া গেল মেয়েকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এস মা এস। চা-টা খাওয় হয়েছে ?"

মমতা বলিল, "হয়েছে বাবা। মা এখন চান্ করতে ঢুকেছেন, তুমি কি চাও, তাই দেখতে এলাম।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "চাইব আর কি ? এই একখানা চিঠি এসেছে গোপেশবাবুর কাছ থেকে, সেই বিষয়ে একটু কথাবার্ত্তা কইবার ছিল। কথাটা বলিয়াই তিনি মেয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। বিবাহে কথায় মমতার মুখখানা গোলাপফুলের মত রাঙা হইয়া ওঠা উচিত ছিল কিন্তু তাহা না হইয়া যেন আশঙ্কায় কাল হইয়া উঠিল। সুরেশ্বর আবা চটিয়া উঠিলেন। আগাগোড়া কুশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এ মেয়েকে না হইলে সতের-আঠার বছরের মেয়ে, বিবাহের নাম শুনিলে খুশী হ না, এমন বাঙালীর ঘরে কে কবে দেখিয়াছে ? যা-তা পাত্র আনিয় ধরিয়া দিতেছেন, তাহাও তন্নয় ? ভাল ঘরের সু সুশিক্ষিত ছেলে কালে ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে। ইহার চেয়েও বেশী মে ক চায় শুনি তিনি কি তাহার জন্য আকাশের চাঁদ পাড়িয়া আনিবে

বিবাহ সম্বন্ধে মেয়ের সঙ্গে কোনওদিন কোনও কথা সুরেশ্ব সোজাসুজি বলেন নাই। কিন্তু আজ রাগটা তাঁহার বড় বেশী হইয়াছিল ইহার একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে। মমতাকেই তিনি জিজ্ঞাস করিবেন, তাহার বর পছন্দ হইয়াছে কি না, আর যদি না হইয়া থাকে ত কেন হয় নাই।

বলিলেন, "গোপেশবাবুর ইচ্ছা, দেবেশ আর তুমি একটু আলাপ-পরিচয় কর, তাই তাকে আর এক দিন ডাকব মনে করছি।"

মমতা দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার সরিয়া গিয়া জানলার পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ আরও যেন ম্লান এবং কাতর দেখাইতে লাগিল। মেয়েকে এই সব কথা বলিতে সুরেশ্বরের যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আজ কিছুতেই পিছু হটিবেন না স্থির করিয়াই তিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোনওমতে যদি তিনি মমতাকে দিয়া বলাইয়া লইতে পারেন যে দেবেশকে তাহার পছন্দ হইয়াছে, বা পিতার নির্দ্দেশ মত বিবাহ করিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই, তাহা হইলে যামিনীকে একেবারে উড়াইয়া দিতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধিবে না। কন্যার বিবাহ দিবার মালিক তিনি, তাঁহার স্ত্রী ত নয়? মেয়ের অমতেও তিনি বিবাহ দিতে পারেন, তবে আজকালকার হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ছেলেমেয়ে, ইহাদের উপর জোরজবরদস্তি করিতে গেলে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তি হইয়া বসে, তাহার চেয়ে তাহাদের মতে কাজ করাই ভাল।

তিনি আবার সুরু করিলেন, "দেখ মা, তোমাকে কয়েকটা কথা বল্‌ছি, তাতে লজ্জা পেয়ো না। তুমি বড় হয়েছ, সব কথা বুঝতে শিখেছ। দেবেশের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে তা তোমার মায়ের কাছে শুনেছ বোধ হয়। ওরাও তোমায় দে'খে খুবই পছন্দ করেছে। আগেকার কালে দুই পক্ষের অভিভাবকদের মত হ'লেই যথেষ্ট হ'ত, আজকাল আবার বড় বড় মেয়ে ছেলের বিয়ে হচ্ছে, কাজেই তাদের মতামতও জানতে হয়। দেবেশের সম্পূর্ণ মত আছে। তোমার মতটাও জানতে চাই। অবিশ্যি বিয়ে এখন হবে না তাও জান বোধ হয়। দেবেশ বিলেত গিয়ে আই-সি-এস পাস ক'রে এলে পর তখন বিয়ে হবে।"

মমতার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, কিছু না বলিলে যদি চলিত, তাহা হইলে সে চুপ করিয়া থাকিত। পলাইতে পরিলে সে বাঁচে। কিন্তু উত্তরের আশায় যেমন উৎসুকভাবে বাবা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, একটা কিছু না বলিলে তিনি কি ছাড়িবেন? বার-বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন বোধ হয়। অগত্যা কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "আমি এম্-এ অবধি পড়তে চাই বাবা।"

সুরেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অত পড়বার আমি ত কিছু দরকার দেখি না। তোমাকে ত আর প্রফেসার হ'তে হবে না, ব্যারিষ্টারও হ'তে হবে না। মেয়েমানুষ একেবারে পুরুষ হয়ে উঠুক এ কেউ চায়ও না, তাতে সংসারে সুখশান্তি কিছু বাড়ে না, কমেই। দেবেশ যত দিন বিলেতে থাকবে, তার মধ্যে তোমার আই-এ পাস করা হয়ে যাবে, তা হলেই ঢের। তা ছাড়া বাড়ীতে ত তুমি গান-বাজনা, শেলাই, এ-সব শিখছই। ইংরিজী কথাবার্ত্তাটা ভাল ক'রে অভ্যাস করবার জন্যে এক জন মেম রেখে দেব ভাবছি।"

মমতার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি দারুণ বিপদের মেঘ তাহার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে? দেবেশকেই শেষে তাহার বিবাহ করিতে হইবে নাকি? মাগো! বিবাহের অর্থ এখন ত সে কিছু কিছু বুঝিতে শিখিয়াছে। সে পারিবে না, কিছুতেই দেবেশকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। হঠাৎ সে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি পারব না, আমি বিয়ে করব না।" মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া সুরেশ্বর ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই জাতিটির সঙ্গে পারিয়া ওঠা ভার। সব কথায় ইহারা কাঁদিয়া জিতিয়া যায়—নিজের বিবাহের পরও কতবার স্ত্রীর চোখের জলের

কাছে পরাজয় মানিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। এখন অবশ্য যামিনী আর কাঁদেন না, তিনিও ওসব মায়াকান্নায় ভোলেন না, কিন্তু মমতার কথা স্বতন্ত্র। সে যে তাঁহার নিজের সন্তান, তাহার উপর ছেলেমানুষ। বলিলেন, "ও কি মা, ছিঃ। কাঁদছ কেন? কাঁদবার কথা ত আমি কিছু বলি নি? বাঙালী হিন্দু ঘরে কুড়ি বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া নিয়ম, সেইটাই আমিও ভাল মনে করি। আর বিয়ে করবে না, এ-সব ছেলেমানুষি কথা, ও-সব আমাদের দেশে চলে না।"

মমতা উত্তরে কি বলিত কে জানে? হয়ত শুধু কাঁদিয়াই আকুল হইত। কিন্তু উত্তর তাহাকে আর দিতে হইল না। হঠাৎ যামিনী ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার মেয়ের দিকে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি, কাঁদছ কেন মা?"

মাকে দেখিয়া মমতা চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল। সুরেশ্বর যথেষ্টই অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, সেটা ঢাকিবার চেষ্টায় বলিলেন, "কাঁদবার যে কি কারণ হয়েছে, তা ত বুঝলাম না। তোমার মেয়ের বয়সই হয়েছে শুধু বয়সের উপযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধি কিছু ত হয় নি।"

যামিনী তখনও বুঝিতে পারেন নাই, ব্যাপারখানা কি। একটা কিছু আন্দাজ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ওকে কি জিগ্‌গেস করছিলে? আমায় বল্‌লেই ত হ'ত? যা খুকি ঘরে যা।"

মমতা উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ্বর বলিলেন, "কি আবার এমন হাতী-ঘোড়া জিগ্‌গেস করব? বিয়েতে তার মত আছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। বয়স ত হয়েছে, মতটা ত জানা আবশ্যক?"

মমতা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যামিনী তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "হঠাৎ ওকে ও-সব জিগ্‌গেস করবার কি এত তাড়া পড়ল?

যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! মেয়েটাকে একে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। বিয়ে কি আজই হচ্ছে?"

মমতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সুরেশ্বরের রাগ একেবারে অগ্ন্যুৎপাতের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একেবারে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খালি আছ বাদ সাধতে। কি হয় মেয়েকে এ সব বল্‌লে? তাকেই ত বিয়ে করতে হবে, তা কাকে জিগ্‌গেস করব? আজ না হোক দু-দিন পরে ত হবে? তার জোগাড়-যাগাড় করতে হবে না? খুঁট ধ'রে ত ব'সে আছ, মেয়ে নিজে প্রেমে না পড়লে তাকে বিয়ে দেবে না, তা মেয়েকে সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখলে সে প্রেমে পড়বে কি ক'রে?"

যামিনী বলিলেন, "ভাল, তালা দিয়ে রাখতে চাই, আমি না তুমি? কোথাও মেয়েকে পাঠাবার নামে তোমারই না মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, পাছে সে দুটো মানুষের মুখ দে'খে ফেলে? তুমি যাকে টাকা দিয়ে কিনে এনে দেবে, তাকেই ওকে ভালবাসতে হবে, এই ত তোমার ইচ্ছা? মানুষের মন অত সহজ জিনিষ নয়।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "না তা বাস্‌বে কেন? ভালবাসবে যত মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান ভিখিরী ছোঁড়াদের। সেই হ'লে তুমি খুব খুশী হও, না? মা হয়ে সন্তানের ভালমন্দ বোঝে না, নিজের জেদ রাখতে চায়, এ কেবল তোমার মধ্যেই দেখলাম। বুদ্ধি কি তোমার ঘটে একেবারে নেই? তিনকাল গিয়ে ত এককালে ঠেকেছে, দুনিয়াটাকে চিনবে কবে?"

যামিনী চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "সন্তানের ভালমন্দ আমি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি ব'লেই তোমার ধমকানিকে এবং অভদ্র কথাবার্ত্তাকেও আমি উপেক্ষা করতে পারি। নইলে তাইতে ভয়

পেয়ে, শান্তি রাখবার জন্যে তোমার মতে মত দিতাম। দুনিয়াটাকে আমি বেশ চিনি, অন্ততঃ মেয়েদের কাছে দুনিয়া যে কি, সেটা বেশ জানি। জানি ব'লেই বল্‌ছি, যদি মেয়ে ভালবেসে সত্যি ভিখিরীর গলায়ও মালা দেয়, তাতেই আমি খুশী হব। ওতেই তার সুখ হবে, ধ'রে বেঁধে বড় মানুষ বরের সঙ্গে বিয়ে দিলেই মেয়ে একেবারে সুখের সাগরে ভাসতে থাকবে, এ যদি মনে কর ত সেটা তোমার ভুল, তুমিই এখনও দুনিয়াকে চিনতে শেখ নি।"

সুরেশ্বর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ও সব কথা থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়িয়ে বল্‌লে বেশ শোনায়, হাততালিও খুব পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের ঘরে ব'সে ওসব কথা কেউ বলে না, বল্‌লেও যারা শোনে, তারা বিশ্বাস করে না। কোনওদিন অভাব কা'কে বলে তা ত জান্‌তে হয় নি, দু-হাতে মুঠো মুঠো ক'রে টাকা উড়িয়েছ, আর পায়ের উপর পা দিয়ে পালঙ্কে ব'সে আছ, হাত ধোবার জলটিসুদ্ধ দাসীতে এগিয়ে দিচ্ছে। তাই ওসব কাব্যি-রোগে ধরেছে আর কি? দু-বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হত, আর ছেলের কাঁথা কাচতে হ'ত, তাহলে বুঝতে কত ধানে কত চাল হয়, আর জগতে ভালবাসার মূল্য কতখানি।"

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যামিনীর মুখে ফুটিয়া উঠিতে-না-উঠিতেই মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ঐ ভাবে থেকেই মানুষে সুখী হতে পারে। পালঙ্কে ব'সে আমি ত সুখের সাগরে ভাসছি। খুকীর অদৃষ্ট আমার মত না-হয়, এই আমি চাই।"

সুরেশ্বর চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন, বলিলেন, "নিজের সৌভাগ্য বুঝতে পার সেটুকু বুদ্ধিও তোমার নেই। খুকীর কপাল তোমার মত হ'লে, জেন যে তার বহু জন্মের তপস্যা ছিল। তবে তুমি যা

তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, শেষ অবধি কি ঘটিয়ে তুলবে তা ভগবানই জানেন।”

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “মেয়ের মঙ্গল চায় না, এ ত সংসারের নিয়ম না? আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে আছ, তুমি তার কি বুঝবে? আমার মত কপাল সত্যিই যেন আমার মেয়ের না-হয়, তার চেয়ে সে যেন চিরকুমারীই থাকে এই আমার প্রার্থনা।” বলিয়া নিজকে সম্বরণ করিতে না পারিয়াই যেন তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশ্বর রাগে তখনও দাঁত্ কিড়মিড় করিতেছেন। কিন্তু রাগ ঝাড়িবেন কাহার উপরে? নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, “কালই আমি উকীল ডেকে উইল্ ক'রে ফেল্‌ব। এত আস্পর্দ্ধা আর সহ্য হয় না। আমার মুখের উপরে এত কড় কথা!”

১৭

সারাটা দিন মমতার যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। বুক খালি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, দুই চোখ শুধু শুধুই জলে ভরিয়া উঠে! কি হইয়াছে তাহার? মায়ের সামনে বাহির হইতে তাহার লজ্জা করিতেছে কেন? সে যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে তাঁহার কাছে।

মায়ের কাছে ধরা না পড়ুক, আসলে সে আজ নিজের কাছে অনেকখানিই ধরা পড়িয়াছে। বিবাহের নামেও তাহার ভয় হয় নাই, সেজন্য সে কাঁদেও নাই। হিন্দুর মেয়ে সে, আজ না হোক কাল বিবাহ তাহার হইবেই, সে ত জানা কথা। এ চিন্তা নিজে কতবার সে করিয়াছে, লুসির সঙ্গে গল্পও কত হইয়াছে, কই কখনও ত তাহার কান্না পায় নাই? যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের স্বপ্ন, আনন্দময় বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন কোন্ কিশোরী বা তরুণী না দেখিয়াছে? তাহাতে দেহে মনে সুখের শিহরণই খেলিয়া যায়, এমন মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না ত?

আসলে বিবাহ করিতে মমতার আপত্তি নাই, তাই বলিয়া যাহাকে তাহাকে সে বিবাহ করিয়া বসিতে পারে না। দেবেশকে তাহার ভাল লাগে নাই, তাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না। কেন যে ভাল লাগে নাই, তাহা ত বলা কঠিন। যামিনী দেবেশকে পছন্দ করেন নাই

বলিয়া? সবটা তাহাও ত নয়? দেবেশ তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছে, ইহা ত মমতা শুনিয়াছে, সাধারণ অবস্থায় তাতেই তাহার মন দেবেশ সম্বন্ধে খানিকটা অনুকূল হইয়া উঠিত। ভালবাসাই ভালবাসাকে জন্ম দেয়। কিন্তু দেবেশের পছন্দের কথা শুনিয়াও মমতার মন একটুও নরম হইল না কেন? তবে কি তাহার মন অন্য কোনওদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে? এইবার মমতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, একটা আকুল পুলকের শিহরণ বুকের ভিতর খেলিয়া গেল, কিন্তু চোখে আবার জলও আসিয়া পড়িল।

মমতা কি সত্যই অমরেন্দুকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? নিজের কাছে তাহা সে অস্বীকারও করিতে পারে না, আবার স্বীকার করিতেও মন ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। ভয় কিসের? তাহাও সে ভাল করিয়া বোঝে না, কেমন অস্পষ্টভাবে শুধু মনে হয় এইবার তাহাকে অনেক ব্যথা পাইতে হইবে। ভালবাসার ভিতর আনন্দ যতখানি, বেদনাও যে ততখানিই? সে কি পারিবে এত ব্যথা সহ্য করিতে? কে তাহাকে এখন পথ দেখাইবে? মাকে এতকাল সব কথা সে বলিতে পারিয়াছে, আজ কিন্তু এই নূতন অনুভূতিটিকে তাঁহার কাছ হইতে লুকাইয়াই রাখিতে সে চায়, তাঁহাকে ইহা জানাইতে মমতার বড় লজ্জা।

যামিনীও মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সকালে সুরেশ্বর তাহাকে যথেষ্ট জ্বালাইয়াছেন, এখন কিছুক্ষণ তাহাকে মন শান্ত করিবার জন্য সময় দেওয়া উচিত ভাবিয়া তিনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরেও মেয়ের খোঁজ করিলেন না। কিন্তু বিকাল গড়াইয়া যায়, তবুও মমতা লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। ইহার কারণ কি? সুরেশ্বর অবশ্য মেয়েকে ঠিক কি বলিয়াছেন, তাহা শুনিবার অবসর যামিনীর হয় নাই, কিন্তু কি বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা ত তিনি শুনিয়াছেন?

তাহার ভিতরে এতখানি বিচলিত হইবার কি থাকিতে পারে? দেবেশের সহিত মমতার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহা ত মমতা জানেই? কনে দেখিতে যে মানুষ কি কারণে আসে তাহা কি আর সে বুঝে না? বিবাহ আজ বা কাল হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও সে জানে। তবে এ ত ভাবনা কেন? মায়ের কাছে সুদ্ধ সে আসিতে পারিতেছে না, এমন কি তাহার হইয়াছে?

বিকাল হইয়া আসিল। নিত্যকে ডাকিয়া যামিনী বলিলেন, "ওরে, খুকীকে ডেকে আন্, চুলটা বেঁধে দিই।" নিজের অতবড় চুলের গোছা মমতা বাগাইতে পারে না, আবার ঝিদের চুলবাঁধা তাহার পছন্দও হয় না, তাই এ কাজটা এখন পর্য্যন্ত মায়ের হাতেই আছে।

নিত্য খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে ছাদের উপর গিয়া তবে মমতাকে আবিষ্কার করিল। বলিল, "ও মা দিদিমণি, একলাটি এই ছাদে কি করছ? মা ডাকছেন যে তোমায়; আমি গোটা-বাড়ী খুঁজে তোমায় দেখতে পাই না।"

যামিনী তাহাকে ডাকিতেছেন, ইহার ভিতর অবাক্ হইবার কিছুই নাই, তবু মমতা যেন চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

নিত্য বলিল, "কেন আবার? চুলটুল বাঁধতে হবে না? বেলা গড়িয়ে এল যে?"

মমতা তখন তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া চলিল। ফিতা কাঁটা আনিবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, মা তাহারই ঘরে খাটের উপর বসিয়া আছেন। মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "আয় চুলটা বেঁধে দিই। সারাটা দিন ছিলি কোথায়?"

মমতা উত্তর না দিয়া, ফিতা কাঁটা লইয়া চুল বাঁধিবার জন্য মায়ের

সামনে গিয়া বসিল। যামিনী তাহার চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "পড়াশুনো ত আজ কিচ্ছু করলি না, তারপর কাল সকালে উঠে তাড়াহুড়ো ক'রে মরবি। এদিকে ত আটটা বাজতেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসবে।"

মমতা নীচু গলায় বলিল, "আজ আমার ভাল লাগছে না মা।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে, শরীর খারাপ নাকি ?"

মমতার কোনও কথা মায়ের কাছে লুকান সহজ নহে, কারণ জন্মাবধি কখনও মা তাহাকে কিছু লুকাইতে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি ত শুধু মা নয়, সখী, সঙ্গিনী সবই তিনি। কাজেই মমতা বিপদে পড়িয়া গেল; একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "বাবা বড় সব কথা নিয়ে জেদ করেন মা, আমার ভাল লাগছে না, বড় ভয় করছে।"

যামিনী বিনুনী করিতে করিতে বলিলেন, "এক-একজন মানুষের অমনি স্বভাব থাকে, তারা চায় জগতের সব মানুষ তাদের মতেই চলুক। কিন্তু তা ত আর হয় না? সব মানুষেরই মত ত আছে, আর সেই অনুসারে চলাই তাদের উচিত। ভয় করিস নে, ভয় ক'রে কিছু লাভ হয় না। মন শক্ত করতে চেষ্টা কর্, বড় ত হচ্ছিস্ ?"

মায়ের কথা শুনিয়া মমতার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। ভয়ের কারণ সত্য সত্যই কি কিছু ঘটিয়াছে? সবটাই তাহা হইলে তাহার কল্পনা নয়? মা ত কখনও এমন করিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলেন না? তবে বাবা কি সত্যই জোর করিয়া ঐ গোপেশবাবুর ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিবেন নাকি? সে জলভরা চোখে মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবা কি সত্যি আমার এখনই বিয়ে দিয়ে দেবেন? আমি বিয়ে করব না মা!"

যামিনী বলিলেন, "এখনই বিয়ের কোনও কথা হয় নি, শুনেইছিস ত

ছেলেটি বিলেত যাবে। সেখান থেকে পাশ ক'রে না এলে বিয়ে হবে না। বিয়ে করবি না কেন? বিয়ে না ক'রে বাঙালীর মেয়ে ক'টা আর ব'সে থাকে?"

মমতা কি করিয়া সব কথা মায়ের কাছে খুলিয়া বলিবে? অমরেন্দ্র বলিয়া কেহ যে জগতে আছে তাহা কি তিনি জানেন? ছায়ার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া, মমতা কি তাহার কথা মায়ের কাছে বলিয়াছিল? সভাতে গিয়া হার যে সে অমরেন্দ্রের ঝুলিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা সে মাকে বলিতে পারে নাই। তিনি কি ভাবিবেন শুনিলে? মেয়ে বিগড়াইয়া গিয়াছে মনে করিবেন না ত?

বলিল, "আমার অনেক পড়াশুনো করতে ইচ্ছা করে মা! বিলেত বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "সব ইচ্ছেই কি আর মানুষের পূর্ণ হয় মা? তা যাক্ গে, এখন ও নিয়ে অত মাথা ঘামাস্ না, ও ঢের পরের কথা। এখন পড়াশুনো করছিস্ কর্, কেউ কিছু বললেই ভয়ে দিশাহারা হয়ে যাস্ নে। মা ত তোকে চিরকাল আগলে রাখতে পারবে না? নিজের ভার নিজেও এক সময় নিতে হবে। মনে জোর কর্, যাতে নিজের মতে চলতে পারিস্, না হ'লে দুঃখের অবধি থাকবে না।"

মা যদি তাহার দুঃখ-দুর্ভাবনা ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, ত মমতা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তিনি যেন আজ সমানে সমানে কথা বলিতেছেন। সত্যই তাহা হইলে অচিরে মমতাকে কোনও একটা বাস্তব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে? সে বিপদটা যে দেবেশকে বিবাহ সম্বন্ধেই তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে অবস্থায় কি করিবে সে? একলা কোনও বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ত তাহার অভ্যাস নাই।

চুল বাঁধা শেষ হইল বটে, কিন্তু আঁধার মুখে সে সেইখানেই বসিয়া রহিল।

যামিনী হাসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "নে নে, অত ভাবতে হবে না। নামে খুকি ত কাজেও খুকি। যা ছাদে বেড়াগে যা। লুসিটা তোর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু খুব পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে।"

মমতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "হুঁ, পাকা হওয়া বুঝি ভাল? তুমিও ত পাকামি করলে বকো?"

যামিনী বলিলেন, "তাই ব'লে চিরকাল কাঁচা থাকলেও ত চলে না? যে বয়সের যা নিয়ম সে-রকম ত হ'তে হবে? আমার মা আমাকে ধেড়ে অবধি খুকি ক'রে রেখেছিলেন, তার ফলে আমার যা সুবিধে হ'ল তা ব'লে কাজ নেই।"

মমতা সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, কি অসুবিধে হয়েছে?"

কি যে অসুবিধা তাহা ত নিজের মেয়ের কাছে খুলিয়া বলা যায় না? যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "সব কথা কি আর তোর কাছে খুলে বলা যায়? তবে নিজে যা ভাল বুঝেছিলাম, সে মতে কাজ করতে পারি নি, এইটুকু জেনে রাখ্। আর নিজের বিবেচনাকে বলি দিলে সুখ কখনও হয় না, অন্ততঃ মেয়েদের হয়ে না, এটাও জেনে রাখ্।"

মমতা সব না বুঝুক, কিছু কিছু বুঝিল। মা যে সুখী নহেন, তাহা ত চোখেই সে দেখিতেছে। সুরেশ্বরের ব্যবহারকে ভুল বুঝিবার উপায় নাই, মমতার চেয়ে অনেক ছোট ছেলেমেয়ের চোখেও তাঁহার রূঢ়তা ধরা পড়ে। ইহার কারণ কি, মমতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। বাবা ত

আর কাহারও সঙ্গে অমন ব্যবহার করেন না? অমন যে ভূতের মত সব বন্ধুবান্ধব, তাহাদের সঙ্গেও তিনি দিব্য ভদ্র আর অমায়িক ব্যবহার করেন। আর মায়ের বেলাই অন্য মূর্ত্তি কেন? তাহার মায়ের খুঁৎ কোথায়? যে তাঁহাকে দেখে সেই মুগ্ধ হইয়া যায়, অথচ বাবা সারাক্ষণ তাঁহার উপর অমন চটিয়া থাকেন কেন?

মমতা এখন জগৎ সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, সংসারী মানুষের কত রকম দুঃখ, ব্যথা, অভাব-অভিযোগ থাকে, তাহাও বুঝিতে শিখিতেছে অল্পে অল্পে। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত দেহে কিশোরী হইলেও মনে মনে শিশুই ছিল, সে, মায়ের স্নেহ ছাড়া জগতের আর কিছু বুঝিত না। কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। প্রেমের সোনার কাঠি তাহার হৃদয়ের সুপ্ত নারীত্বকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, নানা রকম সঙ্গিনী জুটিয়াছে, তাহারাও মমতাকে কম জ্ঞান দান করে নাই। কত রকম কত গল্পই যে সে শুনিয়াছে, শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি লুসি আছে, তাহার ত এ ছাড়া ভাবনাই নাই। রোমান্সের জগতেই সে বাস করে, রাত্রেও বোধ হয় প্রেমের স্বপ্ন ছাড়া অন্য স্বপ্ন দেখে না। কাজেই মমতারও সে শিশুভাব কাটিয়া গিয়া, তরুণীর মনোভাব ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে ঝাপসা ভাবে বুঝিতে পারে, বাবা মায়ের ভিতর যে সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে সম্বন্ধ নাই। তাই কি মা এত অসুখী? হইতেই পারে। নারীর জীবনে সুখশান্তি কোথা হইতে থাকিবে, যদি প্রেমই না থাকে?

কিন্তু মাকে ত আর এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না? তাহার জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হইবে, মায়েরও তাহাকে

কিছু বলিতে সঙ্কোচ হইবে। এ-সব লুকান ব্যথা, লুকাইয়া রাখিতে দেওয়াই ভাল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলে ব্যথা বাড়িয়া যায় বই কমে না।

তাই আর কিছু না বলিয়া মমতা উঠিয়া দাঁড়াইল। যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়াই যেন মমতা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ মা, নিজের মতে চলতে হ'লে যদি বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'তে হয়, তাহ'লে কি করব?"

যামিনী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সোজাসুজি বলা চলে না যে অবাধ্য হও, কিন্তু এইমাত্র যিনি মেয়েকে উপদেশ দিলেন যে কষ্ট সহ্য করিয়াও নিজের মতে চলা ভাল, তিনি কি করিয়া বলিবেন যে মা-বাবার অবাধ্য কোনও অবস্থাতেই হওয়া চলে না? একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "ছোটখাট বিষয়ে, অবাধ্যতা না করাই ভাল মা, কারণ বাবা মা তোমার যাতে মঙ্গল তাই চাইবেন, অমঙ্গল ত চাইবেন না? কিন্তু এমন কোনও বিষয়ে যদি বাপ-মায়ের সঙ্গে মতবিরোধ হয়, যার সঙ্গে তোমার চিরজীবনের সুখশান্তি জড়ান রয়েছে, তখন অবাধ্য হওয়া ছাড়া গতি কি? এই এক জায়গায় একটা মানুষ আর এক জনের হয়ে বিচার ক'রে দিতে পারে না মা, তা অনেক ঠে'কে শিখেছি। তোমার শরীর কি খেলে ভাল থাকে, কি রকম শিক্ষা পেলে তুমি মানুষের মত মানুষ হ'তে পার, এ সবই আমরা তোমার হয়ে ঠিক ক'রে দিতে পারি, শুধু পারি না ঠিক ক'রে দিতে ঐ একটি জিনিষ। কা'কে পেয়ে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে, সে মানুষকে এক তুমিই বেছে নিতে পার মা।" বলিয়া যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মমতা যাহা রাখিয়া-ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, যামিনী স্পষ্টভাবেই তাহার উত্তর দিয়া গেলেন। বিবাহ-বিষয়ে নারীর নিজের মত বজায় রাখা উচিত, ইহাই ত তিনি বলিলেন। তবে আর মমতার ভয় কিসের? মা যদি কষ্ট না পান, তাহা হইলে আর সে কিছুকে ভয় করে না। তাহার অনভিজ্ঞ চোখে সংসার তখনও আনন্দেরই স্থান, কোনও বিভীষিকার সন্ধান সে আজ পর্য্যন্ত সেখানে পায় নাই।

যামিনী বুঝিতেছিলেন, আড়াল হইতে স্বামীর বিরুদ্ধতার সহিত যুদ্ধ করিবার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুরেশ্বর স্থির করিয়াছেন, এবার তিনি গায়ের জোরে কাজ হাঁসিল করিবেন, সুতরাং যামিনীকেও এবার সমরাঙ্গণে নামিতে হইবে। এক্ষেত্রে সব কথা মমতাকে খুলিয়া না বলিলে চলিবে কিরূপে? তাহাকেই লইয়া যখন এ বিরোধ? মমতার মন যদি দেবেশের প্রতি প্রতিকূলই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিবাহের প্রস্তাবে আর কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। মমতা বাহিরের সমাজে বিশেষ ত মেশে না, কাজেই অন্য কাহাকেও তাহার ভাল লাগিয়াছে, ইহা তত সম্ভব নয়। কিন্তু হইতেও ত পারে? যামিনীর মাও যামিনীকে এমনই ঘরের কোণে, আঁচলের আড়ালে মানুষ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের দেবতা তাহারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া যামিনীকে কি কাঁদাইয়া যান নাই? তাঁহারই মেয়ে মমতা, অদৃষ্টও তাঁহারই মত হওয়া বিচিত্র নয়। যদি তাহার কাহাকেও ভাল লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবেশকে ইহজন্মে কোনওদিনও আর তাহার ভাল লাগিবে না, তবে মিছামিছি এই সব মেলামেশার আয়োজন, এই সব কোর্টশিপের ভড়ং করিয়া লাভ কি?

কিন্তু এ-সব কথা কাহাকেই বা তিনি বুঝাইবেন? সুরেশ্বর যাহা

বুঝিতে চান না, তাহা কোনওদিনই বুঝিতে পারেন না। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে দেবেশের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেনই, যামিনীর বিরুদ্ধতায় তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। মমতা যদি নিজের মুখে তাঁহাকে আপত্তি জানায়, তাহা হইলে কিছু কাজ হইলেও হইতে পারে, যদিও সে-বিষয়েও স্থিরতা নাই। সুরেশ্বর টাকার বড়, পদমর্য্যাদার বড় জগতে আর কিছু দেখিতে পান না। যে কখনও ভালবাসে নাই, সে ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিবে কি করিয়া? যামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি পৃথিবী উল্টাইয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিলেন বটে, সে কিন্তু কেবলমাত্র রূপের মোহে, নূতনত্বের মোহে। প্রকৃত প্রেম যে তাঁহার জীবনকে কোনওদিন স্পর্শ করে নাই, তাহা এত বৎসর ধরিয়া যামিনী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। মেয়ের যেন এইরূপ স্বর্ণকারায় বন্দিনী হইবার দুর্ভাগ্য না হয়।

সুরেশ্বর সারাটা দিন দারুণ অসোয়াস্তির ভিতর দিয়া কাটাইয়া দিলেন। মেয়েকে ত কাঁদাইলেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে সোজাসুজি উত্তর ত কিছু পাওয়া গেল না? এম্-এ পড়িবে, কুমারী থাকিবে, ইত্যাদি বাজে কথা ত ঢের বলিল, কিন্তু দেবেশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে আপত্তি আছে কিনা, তাহা ত কিছু জানা গেল না?

আরও মুস্কিল যে সারাদিনের মধ্যে স্ত্রী বা মেয়ে কেহই তাঁহার ঘরের ছায়া মাড়াইল না। রাগিয়া তিনি বন্ধুদের দরজার গোড়া হইতেই বিদায় করিয়া দিলেন, এবং সন্ধ্যার খাবার সবটাই প্রায় ফেলিয়া দিলেন। তবু যামিনীর ঘরের দিক্ হইতে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না।

সুরেশ্বর রাগিয়া প্রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। অন্যকে উপেক্ষা, অবহেলা, এমন কি অপমান করিতেও তাঁহার কোথাও একটুও বাধিত

না বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে। কিন্তু নিজে ঐ তিনটি জিনিষের আঁচমাত্রও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, বিশেষ করিয়া যামিনীরই কাছ হইতে পারিতেন না। কিন্তু স্ত্রীকে জোর করিয়া তাঁহাকে ভালবাসাইবার বা শ্রদ্ধা করাইবার কোনও উপায় তাঁহার জানা ছিল না, তাই নিজের মনে গজ্‌রাইয়া বেড়াইতেই বাধ্য হইতেন।

অবশেষে আর না পারিয়া রাত্রে তিনি যামিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মমতা, সুজিত, দুই জনেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যামিনী বসিয়া সংসারের হিসাব লিখিতেছিলেন। কেন যে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না, মনটা একবার যেন ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল, আবার জোর করিয়া শক্ত হইয়া তিনি সুরেশ্বরের শয়নকক্ষের দিকে চলিলেন।

সুরেশ্বর ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, "এবার ঘরসংসার চালাবার ভারটাও কি আমি নেব?"

যামিনী বলিলেন, "কোন্ ভারটা আবার তোমায় নিতে কে বল্‌ল?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা নয় ত কি? এ-সব বিয়ে, বৌভাতের আয়োজন, উদ্যোগ করা ঘরের মেয়েদেরই কাজ। তা তুমি ত দেখি দিব্য হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছ। কি যে জগৎ উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত আছ, তাও ত কিছু বুঝছি না।"

যামিনী বসিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমার মত নেই ব'লেই হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি।"

সুরেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মত নেই কেন শুনি? ছেলে খুব ভাল, এ আমি তোমায় বল্‌ছি। মানুষ কি তুমি আমার চেয়ে বেশী চেন?"

যামিনী বলিলেন, "ও-সব পুরনো তর্ক আমি আর তুলতে চাই না বাপু। ও ছেলেকে আমার মেয়ের মনে ধরে নি, কাজেই ঐ বিয়ে আমি দিতে চাই না।"

সুরেশ্বরের মুখ একেবারে ঝড়ের আকাশের মত কালো হইয়া উঠিল। তিনি চাপা গলায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মা মেয়েতে এই সব পরামর্শ হচ্ছে বুঝি? মেয়েটার মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছ? আচ্ছা, এ রোগের ওষুধ আমি জানি। তোমার গুণের মেয়েকে বল গিয়ে যে যদি আমার মতে বিয়ে করে তবে গহনাগাটি বাদে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক পাবে। সে এখনও নাবালিকা, ইচ্ছা করলে ঘাড় ধ'রে আজই আমি তার বিয়ে দিতে পারি যেখানে খুশী, কিন্তু সেটা করতে চাই না। এখন যদি বিয়ে নাও হয়, সাবালিকা হ'লেও আমার অমতে বিয়ে করলে তাকে এক কাপড়ে এ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। জন্মে আমি আর তার মুখ দেখব না।"

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা তাই তাকে বলব।"

সুরেশ্বর আবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আর তোমার ব্যবস্থাও ভালমতে আমি ক'রে যাব, ভাবনা নেই।"

যামিনী উত্তর না দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

১৮

সাংসারিক অশান্তির আগুন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে এইবারে শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। যামিনী মনকে প্রাণপণে দৃঢ় ও সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্যার মঙ্গলের জন্য আজ যদি কঠিনতম দুঃখ ও অপমানও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে,—তাহাও সহিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মমতাও রকম দেখিয়া বুঝিল, কঠিন একটা পরীক্ষা সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার এবং মায়ের। এবার নিজেকেও তাহার এই সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে, শুধু মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাকে লইয়াই যখন এত কাণ্ড, তখন সে ত নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না?

সুরেশ্বরের রাগটা এবার সত্যই মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এত দিন স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য যাহা হইয়াছে তাহা ঘরের ভিতরেই ঘটিয়াছে, এবং বেশীর ভাগ খুঁটিনাটি লইয়াই ঘটিয়াছে। বাহিরের লোকে এ-সবের খবর জানে নাই, বড়জোর যামিনীর বাপের বাড়ীর লোকেরা কিছু কিছু জানিয়া থাকিতে পারে। এবারে কিন্তু যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধতায় তিনি কন্যার বিবাহ দেবেশের সহিত না দিতে পারেন, তাহা হইলে ত্রিসংসারে কাহারও সে-কথা জানিতে আর বাকী থাকিবে না। মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধের কথা যথেষ্ট লোকজানাজানি হইয়াছে।

গোপেশ বাবু বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিবার সম্ভাবনায়ই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কথাটা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইয়াছেন। সুরেশ্বরও ভাবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জামাইরূপে পাইবার আশায় কথা গোপন করিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। এতখানি অগ্রসর হইবার পর যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কেন যে হইল না তাহা লোকে খোঁচাইয়া বাহির করিয়া তবে ছাড়িবে। তখন সুরেশ্বরের মান থাকিবে কোথায়? এত বড় প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার, এতগুলি প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া, তিনি শেষে স্ত্রীর কাছে হারিয়া যাইবেন? মনুষ্যজাতির মধ্যে নারীজাতি অধম, নিজের স্ত্রী যে, সে ত অধমেরও অধম, সে-ই কিনা সুরেশ্বরের উপর জয়লাভ করিবে? ভাবিতেই প্রায় সুরেশ্বরের গায়ের রক্ত মাথায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

উকীলবাবুকে সকালেই ডাকিয়া পাঠাইবেন কি না তাহাই ভাবিতেছিলেন। যামিনীকে অবশ্য তিনি কালই চরম শাসান শাসাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিও যথেষ্ট আস্পর্দ্ধা দেখাইয়া উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এখন সুরেশ্বর ইচ্ছা করিলেই উইল করিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু আর একবার বলিয়া দেখা উচিত কি না তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। এ ত সত্য সত্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নয়? পারিবারিক সংগ্রামে খানিকটা বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিতে হয়, কারণ এক্ষেত্রে জেতা-বিজেতার সম্পর্ক যে চুকিয়া যাইবার সম্পর্ক নয়? মেয়েকে না-হয় রাগের মাথায় তিনি কিছু না-ই দিলেন, কিন্তু শাস্তি ত শুধু মমতা পাইবে না, মমতার বাবাকেও কিছু কিছু পাইতে হইবে। যামিনীকে শাস্তি দিতে অবশ্য সুরেশ্বরের সে-ধরণের কোনও আপত্তি নাই। তিনি ব্যথা পাইলে সে ব্যথা সুরেশ্বরের বুকে কোনওদিনই বাজে নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী দীনহীন ভাবে ভাইয়ের

সংসারে পড়িয়া থাকিলে, বা স্কুলে চাকরি করিয়া খাইলে, তাঁহার মানহানি হয় ত? আর যা গুণবতী স্ত্রী! যদি কোনওমতে জানিতে পারে যে এই উপায়ে স্বামীকে লোকের চোখে খানিকটাও ছোট করিতে পারিবে, তাহা হইলে তখনই তাহা করিতে ছুটিবে। কাজেই পাঁচবার না ভাবিয়া হট্ করিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলা চলে না। যা তাঁহার শরীর, উইল করিবার পরদিনই যে তিনি মারা যাইবেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যামিনীকে ডাকিয়া আর একবার অন্ততঃ ধমক-ধামক করা দরকার, এবং মমতাকেও একবার বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী সকাল হইতে নিজের অভ্যস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। তিনি চিরদিনই স্বল্পভাষিণী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কাজেই দাসদাসীতে আজ তাঁহার বিশেষ কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। শুধু মমতা বুঝিতে পারিতেছে, মায়ের অন্তরে কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তিনি গম্ভীর হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু মমতাকে দেখিলে ত তাঁহার মুখে হাসি ফোটে। আজ মেয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রাজার মেয়েকে তিনি যে কাঙালিনী করিবার দায়ও ঘাড়ে লইতেছেন, ইহাতে কন্যার সত্যই মঙ্গল হইবে ত? না নিজের দারুণ আশাভঙ্গের দুঃখ তাঁহাকে ভ্রান্ত পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে?

নয়টা বাজে, মমতা মায়ের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি আজ কলেজে যাব ত?"

যামিনী একটু যেন বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা যাবে না কেন? শরীর ভাল নেই নাকি?"

মমতা বলিল, "না মা, শরীর ত ভালই আছে। কাল থেকে সবাই বাড়ীসুদ্ধ কেমন যেন হয়ে রয়েছে, তাই বলছি।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ঝগড়াঝাঁটি আর কোন্ বাড়ীতে না হয়? তাই ব'লে কি কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে? তুমি যেমন কলেজে যেতে তাই যাও। বেলা হয়ে এল, যাও চান ক'রে এস।"

মমতা স্নান করিতে চলিয়া গেল। মা তাহাকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল, কিন্তু মনের ভিতর তাহার সে আশ্বাস পৌঁছিল না। সত্যই এবার ছেলেখেলা নয়। ভগবান্ কোনও এক নিদারুণ ভাবেই তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে সে আজ মায়ের কোলের শিশু নয়, সে আজ হৃদয়ব্যথাতুরা নারী। প্রিয়কে যদি সে লাভ করিতে চায়, নিজেই তাহাকে পথের কাঁটা মাড়াইয়া, বরণমালা বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মা আজ আর কোলে করিয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুল পথ পার করিয়া দিতে পারিবেন না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র চলিতে পারিবেন।

কোনও কাজেই তাহার মন লাগিতেছিল না। কাজেই অবশেষে সে যখন কলেজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ক্লাসের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। কোনও কোনও ক্লাসে পড়ানও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা অধ্যাপকের আশায় মেয়েরা উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে। মমতার ক্লাসে তখনও ইংরেজীর অধ্যাপক প্রবেশ করেন নাই, সে নিজে রাস্তায় তাঁহাকে ট্রাম হইতে নামিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ছুটিয়া ক্লাসে ঢুকিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া মমতা ফিরিয়া তাকাইল। ছায়া এত পরে আসিতেছে কেন? হাঁটিয়াই বা আসিল কেন? সে ত অন্যান্য দিন কলেজের গাড়ীতেই আসে?

ছায়া কাছে আসিবামাত্র মমতা ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর এত দেরি কেন হ'ল রে? হেঁটে এলি নাকি?"

ছায়া বলিল, "আজ অমরদা চ'লে গেল যে। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তার মোটা মোটা খদ্দরের জামা সেলাই করতে গিয়ে বাস্ ধরতে পারলাম না। তাই ট্রামে ক'রে এতক্ষণে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি।"

মমতার গলাটা একটু যেন কাঁপিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেলেন ?"

"সেই যে বন্যার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাবে বলেছিল, সেইখানেই গেছে।"

আর কথাবার্ত্তা কলিবার সুবিধা হইল না, প্রফেসার ক্লাসে আসিয়া পড়িলেন। মমতা আর ছায়া তাড়াতাড়ি গিয়া নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গা দখল করিয়া বসিল। কিন্তু সমস্ত দিনের ভিতর মমতার আর কোনও-কিছুতে মন বসিল না। কে পড়াইলেন, কি পড়াইলেন, কিছুই যেন সে দেখিলও না, শুনিলও না। বন্যাবিধ্বস্ত কোনও অচেনা অদেখা গ্রামে তাহার মন কাহার সন্ধানে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্লাসগুলি শেষ হইয়া গেল, ঘণ্টা বাজিয়া সেদিনকার মত কাজ চুকিল। মেয়েরা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল। তখন মমতা আবার ছায়াকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা কত জন স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছেন ভাই ? কোথায় গিয়েছেন ?"

মমতার কথায় ছায়া একটু যেন অবাক্ হইল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে সেটুকু প্রকাশ পাইল, মুখের কথায় নাই পা'ক্। মমতা তাহা বুঝিল, লজ্জায় যেন তাহার মাথা কাটা গেল, তবু এই কথাটিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে কিছুতেই যেন থাকিতে পারিল না।

ছায়া বলিল, "বিশ-পঁচিশ জন ত একসঙ্গে গিয়েছে।" কোন্ জায়গায় যে তাহারা গিয়াছে সেটার নামও সে বলিয়া দিল।

মমতার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। এ স্থান ত তাহার চেনা, এ যে তার পিতার জমিদারীর ভিতরেই। বাল্যকালে একবার সেখানে সে বেড়াইয়াও আসিয়াছে। সেখানকার মস্তবড় কাছারি-বাড়ী, পুকুর, মাঠ, ঘাট আজও তার অল্প অল্প মনে পড়ে।

তাহার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই মমতাকে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতে হইল। বুকের ভিতরটা তাহার ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল, কেন যে তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিল না। যাহাকে চোখে সে দু-তিন বারের বেশী দেখে নাই, দেখিবার কোনও আশাও ছিল না, সে কলিকাতায় থাকিলেই বা কি, আর দূরে চলিয়া গেলেই বা কি? ভালবাসার জগতে তরুণী মমতার এই প্রথম প্রবেশ। এ রাজ্যের নিয়ম যে ব্যবহারিক জগতের নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ আলাদা, তাহা সে এখনও বুঝিতে শিখে নাই।

বাড়ীর আবহাওয়া তেমনই থম্‌থমে হইয়া আছে, বাহিরেও শান্তি নাই, ঘরেও নাই। বেচারী মমতা যায় কোথায়? আজ লুসির জন্যও তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সে থাকিলে ত দুইটা কথা বলিয়া মনের ভারটা অন্ততঃ হাল্‌কা করিয়া ফেলা যাইত। মায়ের কাছে এ দুঃখ লইয়া সে যাইতে ত পারে না! তাঁহার সহানুভূতিই সে পাইবে হয়ত, কিন্তু লজ্জা আসিয়া মমতাকে বাধা দেয়। নিজের ঘরেই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, নিত্য তাহার জলখাবার ঘরেই পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

যামিনী খানিক বাদেই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মমতা ঘরে আসিতে বলিলেন, "চুলটা হয় নিজে বাঁধতে শেখ্, না-হয় নিজে এসে বাঁধিয়ে নিয়ে যা, আমাকে রোজ ডাকাডাকি করতে হয় কেন?"

মমতা উত্তর না দিয়া মুখ ভার করিয়া মায়ের সামনে গিয়া চুল বাঁধিতে

বসিল। যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সত্যিই শরীর ভাল নেই নাকি? সকাল থেকে কেমন যেন হয়ে রয়েছিস্?"

মমতা প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন মা?"

যামিনী বলিলেন, "ভালই আছেন বোধ হয়, খাওয়া-দাওয়া ত করেছেন।"

চুল বাঁধা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় মমতা হঠাৎ বলিয়া বসিল' "চল মা, আমরা কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চ'লে যাই।"

যামিনী তাহার খোঁপায় কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন, "এটা ত চেঞ্জে যাবার সময় নয়? এখন যেতে চাস্ কেন? আর তোর বাবা ত কলকাতা থেকে কোথাও নড়তে চান না, তঁকে ফে'লে আমাদের যাওয়া ত শক্ত।"

মমতা বলিল, "বাবারই ত যাওয়া সব চেয়ে দরকার? তাঁর প্রজারা সব কি রকম কষ্টে আছে, তাদের সাহায্য করতে বাইরের কত লোক ছুটে যাচ্ছে। তাঁর ত গিয়ে একবার দেখাও উচিত?"

যামিনী বলিলেন, "ও-কথা ত পুরনো হয়ে গেছে বাছা। যা তিনি নিজে বুঝবেন না, তা তাঁকে বোঝাবে কে? জমিদারীতেই তুই যেতে চাইছিস্ নাকি?"

মমতা বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবা না যান, খোকাকে আর তাঁকে রেখে চল আমরা গিয়ে দে'খে আসি। ঘরে ব'সেও খানিক-খানিক সাহায্য ত মানুষকে করা যায়? তুমি যাবে মা?"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করলেই কি আর আমি হট্ ক'রে চ'লে যেতে পারি? তোমার বাবার মত ত দরকার?"

বাবার মত যে পাওয়া সহজ নহে, তাহা মমতার ভাল করিয়াই জানা ছিল। কথাগুলি সে বিশেষ কিছু ভাবিয়া বলে নাই, কেমন যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কলিকাতায় তাহার প্রাণ কেন এমন ছটফট করিতেছে, তাহা নিজেও কি সে ভাল করিয়া বোঝে? এইখানেই জন্ম, এইখানেই সে বরাবর থাকিয়াছে, শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুখ-দুঃখের বিচিত্র লীলা তাহার জীবনের উপর খেলিয়া গিয়াছে, এইখানেই। আজ কেন তবে কলিকাতাকে তাহার হুতাশন-বেষ্টিত গৃহের ন্যায় ভয়াবহ বোধ হইতেছে? প্রায় অচেনা একটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর সকল আলো, সকল আনন্দ এমন নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল কেমন করিয়া?

মনের কাছে না-হয় সে স্বীকার করিল, যে অমরকে সে ভালই বাসে। কিন্তু অন্য লোকের কাছে এমন অদ্ভুত ভালবাসার কথা কি বলা চলে? অমরকে সে তিনবারের বেশী দেখে নাই, চার-পাঁচটার বেশী কথা সে তাহার সঙ্গে বলে নাই। ছায়ার কাছে অবশ্য অমরেন্দ্রের গল্প সারাক্ষণই শুনিতেছিল। কিন্তু ইহাই কি ভালবাসার পক্ষে যথেষ্ট? দুইটি মানুষ পরস্পরকে একেবারে না-জানিয়া না-চিনিয়া কি ভালবাসিতে পারে? দুই জনই বা কোথায়? অমর যে মমতার কথা ভুলিয়াও একবার মনে করে তাহার প্রমাণ কি? ক্ষণিকের চোখের দৃষ্টি মাত্র মমতার সম্বল। সে দৃষ্টির অর্থ মমতা ভুলও ত বুঝিয়া থাকিতে পারে? হয়ত আশাতীত দানলাভের কৃতজ্ঞতাই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মমতা তাহাকে অন্য ভাবে বুঝিয়াছে। কে জানে? জানিবার উপায় ত কিছু সে ভাবিয়া পায় না। আবার না জানিয়াও প্রাণ যে কেবল ছটফট করে।

যামিনী মমতাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,

"তুই দেখ্ না তোর বাবাকে একবার ব'লে? হয়ত রাজী হতেও পারেন।"

মমতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মা, বাবার কাছে যেতে আমার ভয় করে।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ভয় আবার কিসের? তিনি ত তোকে কোনওদিন কোনও শক্ত কথা বলেন না?"

মমতা বলিল, "আবার যদি ঐ সব কথা তোলেন? কাল যা বলছিলেন?"

যামিনী বলিলেন, "তা তোলেন তুল্‌বেন, তোর যা বলবার আছে বলবি। একটু শক্ত হ'তে শেখ্ দেখি। অত ভয় পেলে চলে? বিয়ে ত তোর জোর ক'রে দিয়ে দিতে পারবেন না?"

মমতা বলিল, "কেন মা, এখনই এ সব কথা ওঠে? আমি পড়াশুনো শেষ করি আগে?"

যামিনী বলিলেন, "কথা নানা রকম ওঠেই আমাদের দেশে। তাতে কি?"

মমতা বলিল, "বাবা যদি খুব বেশী জেদ করেন, তখন কি করব?"

যামিনী বলিলেন, "তখন তোকেও জেদ করতে হবে। যা একমাত্র তোরই বুঝবার জিনিষ, তা তোর হয়ে অন্য কেউ বুঝে দিতে পারে না।"

মমতা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর বিস্মিতা যামিনীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই উঠিয়া একেবারে ছাদে পলায়ন করিল। যামিনী হয়ত তাহার পিছন পিছন যাইতেন, এমন সময় নূতন এক উৎপাতের আবির্ভাবে শঙ্কিত হইয়া সেইখানেই থাকিয়া গেলেন।

সুরেশ্বরের ঘর হইতে উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। কথাগুলি যে কি তাহা যামিনী বুঝিতে পারিলেন না, তবে সুরেশ্বর বেশ চটিয়া উঠিয়া কাহাকেও ধমক দিতেছেন তাহা বোঝা গেল। যা তাঁহার শরীরের অবস্থা, কোথা দিয়া কি ঘটিয়া বসে ঠিকানা নাই। যামিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চলিলেন।

সিঁড়ির সামনে আসিতেই দেখিতে পাইলেন, জমিদারীর এক নায়েব সদাশিব অতি বিরস বদনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে। যামিনীর দিকে চোখ পড়িতে মাঝ-সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে নত হইয়া একটা নমস্কার করিল, কিন্তু কথা বলিবার জন্য না দাঁড়াইয়া যেমন নামিতেছিল, নামিয়া গেল।

যামিনী সুরেশ্বরের ঘরে না ঢুকিয়া আবার নিজের ঘরেই ফিরিয়া গেলেন। গোলমাল কোথাও একটা কিছু ঘটিয়া থাকিলে তাঁহার জানিতে দেরি হইবে না। স্বামীর সুখের ভাগ তিনি না পান, দুঃখ, যন্ত্রণা, উৎপাতের ভাগ পূরামাত্রায় বা তাহার চেয়ে বেশী মাত্রাতেই তিনি পাইয়া আসিতেছেন। এদিক্ দিয়া সুরেশ্বর তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীর সম্মান হইতে কোনও দিনই বঞ্চিত করেন নাই।

খানিক বাদেই রান্নাঘরের চাকর আসিয়া খবর দিল যে একজন লোক বেশী খাইবে বলিয়া পিসিমা আবার ভাঁড়ারের চাবিটা পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। চাবির তাড়া চাকরের হাতে দিয়া যামিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, নায়েবকে ডাকাইয়া তাহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিবেন কি না। স্বচ্ছন্দেই ডাকিতে তিনি পারেন, ইতি-পূর্ব্বে আমলা, কর্ম্মচারীদের বহুবার তিনি এমন ডাকিয়া কাজকর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সুরেশ্বর এখন যেমন মারমুখো হইয়া

আছেন, আগে ততটা থাকিতেন না। এখন হঠাৎ চটিয়া উঠিতেও পারেন।

আবার একটি চাকরের আগমন হইল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবুমশায় একবার ডাকছেন।"

যামিনী উঠিয়া আবার সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চলিলেন।

১৯

ঘরময় কাগজপত্র ছড়াইয়া সুরেশ্বর বসিয়া আছেন। সচরাচর ঘর গোছান এবং পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে চাকর-বাকরকে তিনি যথেষ্ট উপদেশ দেন এবং যামিনী যে দাসদাসীদের অতিশয় প্রশ্রয় দেন সে-বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন না। তাঁহার বিশেষ রকম মেজাজ খারাপ না হইলে, ঘরের এমন অবস্থা হইত না। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য যামিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলেন।

সুরেশ্বর বলিলেন, "আমি যেন বেড়া আগুনের মধ্যে পড়ছি, কোনও দিকে আমার নিষ্কৃতি নেই। সব যদি আমি করব, আমি দেখব, তাহ'লে ম্যানেজার নায়েবই বা আছে কি করতে, আর স্ত্রী-পুত্রই বা আছ কি করতে? তার উপর এই ব্লডপ্রেশারের উৎপাত। মরলে হাড় জুড়োয়।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদাশিবকে দেখলাম, সে কি করতে এসেছে?"

সুরেশ্বর নিজের মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খেতে। আমাকে নাকি মহলে অতি-অবশ্য যেতে হবে, নইলে জমিদারী রক্ষা হবে না। প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, খাজনা দিতে চাচ্ছে না। দু-চার জায়গায় মারপিটও হয়ে গেছে। বানের জলে তাদের নাকি সব ভেসে গেছে। জোচ্চোর বেটারা!

গিয়ে সবাইকে দে'খে নেব। খাজনা মাপ করাচ্ছি ভাল ক'রে। যত সব ঘুষ্‌খোরকে মাইনে দিয়ে পোষার ফল এই আর কি ?"

যামিনী বলিলেন, "যাওয়াই ঠিক করেছ ?" খানিক আগেই মমতা যাইবার জন্য কি রকম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়া তাঁহার অবাক্‌ লাগিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিলেন, "ঠিক পেয়াদাতেই করিয়েছে। টাকাকড়িকে যতই তুচ্ছ কর, সেগুলি না হ'লে ত কারও চল্‌বে না ? কাজেই জমিদারী রক্ষা করার ব্যবস্থাও করতে-হবে। কর্ত্তাদের আমলে হামেসা মহলে যাওয়া-আসা ছিল, প্রজারা সব তাতে বশে থাকত। আর আমরা সব সাহেব-মেম হয়েছি, যে দেশে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেখানে যাবার নামেই মূর্চ্ছো যাই। কাজেই জমিদরীর এই হাল। একবার সবাইকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে, তবে সব টের পাও। গরিব প্রজাদের দুঃখে ত সব গ'লে যাও, তারাও যে আদৎতে কিরকম পাজী, তাও তোমাদের জেনে রাখা ভাল।"

যামিনী শান্তভাবেই বলিলেন, "তা চল না নিয়ে। আমি ত যেতে কোনওদিন আপত্তি করি নি। ছেলেমেয়েরাও যেতে অরাজী নয়।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "হ্যাঁ, এবার যাব সকলকে নিয়ে, পরশুই বেরব। তোমরা প্রস্তুত থেক। ছেলেমেয়ে দুটি ত দিব্যি ফিরিঙ্গী তৈরি হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের পানাপুকুরের জল কিছু পেটে না পড়লে ওরা সায়েস্তা হবে না। ডাক্তার হতভাগাকে আবার সঙ্গে নিতে হবে। তাঁকে খবর দিই এখন। যা বনগাঁ, একটা গোবদ্যিও নেই সেখানে, ব্লড্‌প্রেশার মাপবে কে ?"

যামিনী বলিলেন, "চাকরবাকর যাবে ত সঙ্গে ?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "না গেলে আর চল্‌ছে কই? খালি খাওয়া আর শোয়া, এ ছাড়া কেউ ত কিছু করতে শেখ নি?"

যামিনী হাসি চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যামিনীকে মানুষ করার ভার অবশ্য সুরেশ্বরের উপর ছিল না, যামিনী যাহা হইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার মা-বাবার শিক্ষাই সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু মমতা আর সুজিতকে ফিরিঙ্গী শিক্ষা দিবার জন্য এবং সকল বিষয়ে বনিয়াদী ঘরের উপযুক্ত ভাবে মানুষ করিবার জন্য, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলার জন্য, সুরেশ্বর প্রথম হইতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছেন। মমতা যে একেবারে অকেজো মোমের পুতুল হয় নাই, তাহা কেবলমাত্র যামিনীর প্রাণপণ চেষ্টায়। সুজিতকে অবশ্য সুরেশ্বর যেমন চাহিয়াছেন সেই শিক্ষাই দিয়াছেন, ফলে ইহারই মধ্যে সে একটি নররূপী বানরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ছেলেমেয়ের যেখানে যাহা খুঁৎ বাহির হইবে, তাহার জন্য যামিনীই যে একমাত্র দায়ী, সুরেশ্বরের এ ধারণা যাইবার নয়। যামিনী প্রথম প্রথম তাঁহার এ সব অযৌক্তিক কথার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু কোনই ফল হয় না দেখিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। যামিনী নিজের শুইবার ঘরের আলোটা জ্বালিয়া দিয়া নিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকি কোথায় আছে খুঁজে দেখ্ দেখি, বল্ যে আমি ডাকছি।"

নিত্য খানিক বাদেই ছাদ হইতে মমতাকে ডাকিয়া আনিল। মা ডাকিলেই এখন মমতার কেমন ভয়-ভয় করে, না জানি তিনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন। ভিতরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

যামিনী বলিলেন, "তোর উপর আজ ভগবান্ সদয় খুকি, কলকাতা ছেড়ে যেতে চাইছিলি, তারই ব্যবস্থা নিজের থেকেই হয়ে গেল।"

মমতা বড় বড় চোখে বিস্ময় ভরিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে মা? আমরা কোথায় যাব?"

যামিনী বলিলেন, "উনি জমিদারী দেখতে যাচ্ছেন, আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তোরা বড় হয়ে ত কখনও ওদিকে যাস্ নি, একবার গিয়ে সব দে'খে আসা ভাল। কাছারি-বাড়ীগুলি ত ভালই, থাকার অসুবিধা কিছু হবে না, তবে বর্ষাকাল, সময় ভাল না, এই যা।"

মমতার বুকে তখন আনন্দের জোয়ার ডাকিয়া যাইতেছে, সে বলিয়া উঠিল, "কিছু অসুখ হবে না, তুমি দেখো মা, আমরা খুব সাবধানে থাকব আর সব রকম ওষুধবিষুধ সঙ্গে নিয়ে যাব। কবে আমরা বেরব মা? কলেজেও ত একটা চিঠি দিতে হবে বাবাকে?"

যামিনী বলিলেন, "তা ত হবেই। বোধ হয় পরশু বেরনো হবে, ওঁর কথায় যত দূর বুঝলাম। জিনিষপত্র খানিকখানিক এখন থেকেই গোছ গাছ করতে হবে। খোকা যেতে চাইবে কি না কে জানে? যা সুখী স্বভাব ছেলের। কি কি নিয়ে যেতে হবে একটা ফর্দ্দ কর্ দেখি। আমিও একটা করছি। ওখানকার গরিব-দুঃখীদের কাজে লাগে এমন জিনিষ যদি কিছু বাড়ীতে থাকে তাও নিয়ে যাওয়া ভাল। ঝিচাকরও গোটা দুই-তিন নিতে হবে। নিত্যটা বড় অকেজো, দৌড়ধাপের কাজ মোটে পারবে না। ও থাক, তার চেয়ে মুখী, হরি আর রাঁধুনীটাকে নিলেই হবে।"

মমতা মায়ের কথা শুনিল কি না কে জানে। আপন মনে কি ভাবিতে ভাবিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কাপড়ের আল্মারি, বইয়ের আল্মারি, বাক্স ডেস্ক খুলিয়া, জিনিষপত্র ছড়াইয়া এমন ধুম বাধাইয়া দিল যেন আজ রাত্রেই তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে হইবে।

সুজিত খবর শুনিল, তাহার পরদিন সকালে। খবরটা দিল মমতাই, কারণ একমাত্র সে-ই এই বর্ষাকালে বন্যাবিধ্বস্ত পল্লীগ্রাম-যাত্রার ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখিয়াছিল। সুরেশ্বর যাইতেছিলেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, আর যামিনী যাইতেছিলেন কর্ত্তব্যবোধে।

সুজিতের ত সুখবর শুনিয়া চোখ প্রায় কপালে উঠিয়া গেল। পড়িবার টেবিলের উপর এক কিল মারিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "Damn it! যাব না আমি। বাবার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মমতা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, কথার কি বা ছিরি! বাবার মাথা খারাপ হোক বা নাই হোক, তোমার পুরোমাত্রায় হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি।"

সুজিত খ্যাকাইয়া উঠিল, "তুমি যাও দেখি এখান থেকে, লম্বা লম্বা লেক্‌চার ঝাড়তে হবে না। আমি না যাই যদি? আমার ইচ্ছে আমি যাব না সেই ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে।"

মমতা বলিল, "বেশ ত আমি যাচ্ছি। তোমার মত গুণবানের সঙ্গে কথা ব'লে ত আমার সপ্তম-স্বর্গ লাভ হবে আর কি? বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া তুমিই ক'রো, তখন অত তেজ বজায় থাকে, তাহলেই বুঝি।"

মমতা চলিয়া গেল। বাপের কাছে তেজ দেখাইবার সাহস যে সুজিতের হইবে না তাহা সুজিতের নিজেরও জানা ছিল। কিন্তু অতখনি রাগ যে তাহার হইয়াছে, তাহা একেবারে প্রকাশ না করিলেই বা চলে, কি প্রকারে? কাজেই বোনকে খ্যাকাইয়া, চাকরকে গাল দিয়া, পোষা কুকুরটাকে লাথি মারিয়া, যতটা পারিল নিজের গায়ের ঝাল সে মিটাইয়া লইল। তাহার পর নিজের জিনিষ গোছানর ভার মা এবং চাকরের উপর দিয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

সারাটা দিন বাড়ীর সকলে মিলিয়া প্রাণপণে খাটিয়া জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল। মমতা ত প্রায় নাওয়া-খাওয়াই ভুলিয়া গেল। পাড়াগাঁয়ে কি জিনিষের প্রয়োজন, কতখানি প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তাহার স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না, কাজেই পোঁটলা-পুঁটলির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিল। যামিনী তাহাকে বাধা দিলেন না, মেয়েটা নানা হাঙ্গামে যে-রকম মন-মরা হইয়া আছে, একটা কিছু লইয়া খানিক ভুলিয়া থাকিলেই ভাল। স্থরেশ্বরেরও এখন সমস্ত মন জুড়িয়া আছে, দুষ্ট প্রজাদের অনাচার, সম্প্রতিকার মত মেয়ের বিবাহের ভাবনা এবং স্ত্রীকে সায়েস্তা করার সঙ্কল্প দুই-ই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের যাইতে হইবে খানিক দূর ট্রেনে, খানিক নৌকায়, খানিক পাল্কীতে। স্থরেশ্বরের জন্য হাতী আসিবে, তিনি সেটা তত পছন্দ করিতেছেন না। কিন্তু ওসব জায়গায় মোটর চলিবার মত রাস্তা সর্ব্বত্র নাই, কি আর করা যায়। স্থজিত হুকুম করিয়াছে, তাহার জন্য ভাল একটা ঘোড়া যেন তৈয়ারী থাকে। ওসব হাতীটাতি তাহার পোষাইবে না। ব্যাপারটা যদি পিক্‌নিকের মত খানিকটাও হয়, তাহা হইলে না-হয় কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ সে খানিকটা ভুলিতে পারে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সকাল-সকাল সারিয়া লইয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। পিছনে ঠিকাগাড়ীর সারি, আগাগোড়া জিনিষপত্র বোঝাই হইয়া চলিল। যামিনী ঝি-চাকর তিন জন লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কারণ সেখানে গিয়া খাটিবার লোক যথেষ্টই পাইবেন। স্থরেশ্বর তাহার উপর আর-একজন চাকর যোগ করিলেন, তাহা না হইলে নাকি তাঁহার চলিবে না।

ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহাদের বেশ খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

সুরেশ্বর ভীতু মানুষ, ট্রেন পাছে ফেল হয়, এই ভয় যাত্রার আরম্ভেই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া থাকে, কাজেই ঘণ্টা খানেক আগে সর্ব্বদা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হন। এখনও গাড়ী ছাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টাই বাকী আছে দেখিয়া তিনি ওয়েটিং-রুমে বসিয়া সঙ্গের চামড়ার বাক্স খুলিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যামিনী মেয়েকে এবং ঝিদের সঙ্গে করিয়া মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া গেলেন। সুজিত প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিতে লাগিল।

মমতার বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। সে বার-বার দরজার কাছে আসে আবার ফিরিয়া যায়। তাঁহাদের সঙ্গী ডাক্তারবাবু এখনও আসিয়া পৌছান নাই, সুরেশ্বর তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম্মে আসি[illegible]তা বাঁচে, গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া তবু কল্পনা করা যায় যে তাহারা সত্যই ক[illegible]কাতা ছাড়িয়া চলিয়াছে।

সুরেশ্বরের চিঠিলেখা খানিক পরে শেষ হইল। বাড়ীর দরোয়ান জিনিষপত্রের খবরদারি করিতে সঙ্গেই আসিয়াছিল। চিঠি খামে বন্ধ করিয়া, তাহাকে ডাকিয়া সুরেশ্বর আদেশ করিলেন, চিঠিখানা গোপেশবাবুর বাড়ী পৌছাইয়া দিতে।

মমতা কথাটা শুনিতে পাইল। তাহার বুকের ভিত[illegible] ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে পলাইতে চায় কি সে সাধে? এখানে যে রাক্ষসের মত হাঁ করিয়া বসিয়া আছে ঐ গোপেশবাবু আর তাহার ছেলে, মমতাকে গ্রাস করিবার জন্য। বাবা কি ঐ মানুষগুলাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না? কি যে তিনি তাহাদের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। সংস্কৃতের একটি শ্লোক তাহার মনে হইল, অনেক

সময় অনেকের মুখে সে ইহা শুনিয়াছে। পিতা নাকি কন্যার জন্য বিদ্বান্ পাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, মাতা ধনবান্ পাত্র চান, আর কন্যার নিজের পছন্দ রূপবান্ পাত্র। তাহার ক্ষেত্রে সবই প্রায় উল্টা, ভাবিয়া মমতার হাসি পাইল। দেবেশের বিদ্যা কতদূর তাহা সে জানে না, যতই হউক, বিদ্যার জন্য সুরেশ্বর তাহাকে কামনা করিতেছেন না। মা ত তাহার ধনবান্ মানুষের নামেই এখন চটিয়া যান, ধনের অভিশাপ তাঁহার নিজের জীবনকে ত ছারখার করিয়া দিল। আর সে নিজে? সে যাহাকে চায় তাহাকে বাঙালীর ঘরে কেহই হয়ত. রূপবান্ বলিবে না, কারণ তাহার রং ফরশা নয়। দেবেশের আর কিছু থাক বা নাই থাক, রংটা ত ফরশা? কিন্তু পাত্ররূপে তাহাকে কল্পনা করিতেই ত মমতার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, ট্রেন অবশেষে প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল। মমতারা সকলে সুরেশ্বরের নির্দ্দেশমত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, লোকজন সকলে মিলিয়া মহা সোরগোল করিয়া জিনিষপত্র তুলিতে লাগিল। সুজিত খালি অতি বিরক্ত মুখে, নিজের পোষা কুকুরটাকে লইয়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরিতে লাগিল। এই দলটির যে সে কেহ নয়, তাহাই প্রমাণ করিতে সে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গাড়ী অবশেষে যখন ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা দিল, তখন সুজিত কুকুর লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং ডাক্তারবাবুও সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ্বর এতক্ষণে তবু নিশ্চিন্ত হইলেন, ডাক্তার যে না যাইবার মতলবেই এত দেরি করিতেছেন, সে-বিষয়ে প্রায় তিনি নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যামিনীর অবস্থা প্রায় ঢেঁকির

স্বর্গবাসের মত। সুরেশ্বর সারাক্ষণই বকবক ক[illegible]ছেন, এবং হাজার রকম ফরমাশ করিতেছেন। তবে ডাক্তার উপস্থিত [illegible]কাতে মন খুলিয়া বকিতে পাইতেছেন না, এইটুকুই যা রক্ষা। সুজিত এক বোঝা ইংরেজী ম্যাগাজিন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে তাহারই মধ্যে ডুবিয়া আছে। ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে সুরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন, মাঝে মাঝে একটু দিবানিদ্রা দেওয়া যায় কিনা, তাঁহারই চেষ্টা করিতেছেন। ঝি-চাকরদের ভিতর, একটি খালি এ গাড়ীতে আছে কর্ত্তার হুকুম তামিল করিবার জন্য, অন্যরা গিয়া থার্ড ক্লাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

খালি মমতার প্রাণ যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা দেখিতেছে, তাহারই উপর যেন কিসের অপূর্ব্ব আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার বাহিরের জগৎটাকে বেশী সে দেখে নাই বটে, কিন্তু একেবারেই যে দেখে নাই তাহা ত নহে? এত ভাল ত তাহার কোনওদিন লাগে নাই? যাত্রার শেষে কি সে পাইবে, কাহাকে সে পাইবে, যাহার জন্য এমন পুলকের শিহরণ তাহার সমস্ত দেহমনের উপর দিয়া খেলিয়া যাইতেছে? সে ভালবাসিয়াছে ইহাই যেন যথেষ্ট, ভালবাসা যে ফিরিয়া নাও পাইতে পারে, সে ভয় কি একেবারে তাহার নাই?

মমতা সবে বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনে পা দিয়াছে। ভালবাসার দেবতাটিকে এখনও সে ভালরূপে চেনে না, তাঁহার ভীষণ রমণীয়তাকে এখনও সে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহার এক হস্তে মালা, আর এক হস্তে কৃপাণ। কোন্‌টা মমতার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা সে জানে না। সে-ভয়ও বিশেষ তাহার নাই। এমন করিয়া যে

তাহাকে ডাক দিয়া পথে বাহির করিয়াছে, সে কি তাহাকে চাহিবে না? জগতে এত বড় নিষ্ঠুরতাও কি ঘটিতে পারে? ভাগ্য-বিধাতা এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কি করিতে পারেন?

চারিদিকের যে-সব মানুষের মধ্যে সে বাস করে, তাহাদের জীবনের অন্তরতম ইতিহাস জানা থাকিলে, মমতার এই বিশ্বাস, এই মুগ্ধ আনন্দ চূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু অল্প বয়সে জগতের মুখোসের পশ্চাতে যে কি আছে তাহা কয়টা মানুষই বা জানিতে পারে?

ট্রেনের পালা শেষ হইয়া যখন নৌকার পালা সুরু হইল, তখন সকলেই অল্পবিস্তর অসন্তোষের গুঞ্জন তুলিল, খালি মমতার আনন্দে ইহাতেও ম্লান হইল না। সুজিত ত পারিলে সব কয়জনেরই মুণ্ডপাত করিয়া দেয়, এমনই হইল তাহার মেজাজ। এই বিশ্রী নোংরা বজরাটার মধ্যে, লোক-জনের সঙ্গে গাদাগাদি করিয়া কতক্ষণ সে থাকিতে পারে? সবে মাত্র সে লুকাইয়া সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের সামনে ত খাইতে পারে না? অথচ অসোয়াস্তির তাহার সীমা নাই। সুরেশ্বর ঝিচাকর, মাঝিমাল্লা, স্ত্রী সকলকেই বেশী করিয়া বকিতেছেন। তাঁহাকে যে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইল, তাহার মূলে এই সব মানুষের অপদার্থতাই ত? না হইলে সুরেশ্বরকে কেন কষ্ট পাইতে হইবে?

যামিনী নীরবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুধু ঝিচাকরদের বলিয়া, দলসুদ্ধর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কি রকম কি ব্যবস্থা আছে তাহা জানা নাই, কাজেই কলিকাতা হইতেই তিনি প্রচুর আয়োজন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতাটাকেই

তিনি কেন বহন করিয়া আনিতে পারেন নাই, তাঁহার এই অপরাধ তাঁহার স্বামী ও পুত্র কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি[illegible]ন না।

দুই তীরে বন্যার প্রকোপের চিহ্ন এখনও জাজ্জ্বল্যমান। সুরেশ্বর ইচ্ছা করিয়া সে-সব দিকে তাকাইতেছেন না। যামিনীর চোখে ঐগুলিই অত্যন্ত বেশী করিয়া পড়িতেছে। মমতা উহা দেখিতেছে, কিন্তু ভাবিতেছে অন্য কথা। সুজিত অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছে, এই যমালয়ে কেন সে মরিতে আসিল। এখানে থাইতে[illegible]য়ত ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ঘোড়ায় চড়া যা হইবে, তাহা বুঝাই যাইতেছে।

২০

নৌকাযাত্রা যখন শেষ হইল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতে বসিয়াছে। সন্ধ্যাসূর্য্যালোকপ্লাবিত চারিদিকের পল্লীদৃশ্য মমতার চোখে যেন স্বপ্নলোকেরই মত অপূর্ব্ব সুন্দর লাগিল। মস্ত বড় বাঁধাঘাটে নৌকা আসিয়া থামিয়াছে। তীরে বহু লোক সমবেত হইয়াছে ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য। সঙ্গে তাহাদের পাল্কী, ডুলি, ঘোড়া, হাতী, কত কি। দেশের অবস্থা নিতান্ত খারাপ, জনসাধারণ বন্যাপীড়িত, বুভুক্ষু, না হইলে বাদ্যভাণ্ড, আতসবাজি কিছুরই অভাব হইত না।

কাছারীর নায়েব, গোমস্তা সকলে নৌকায় উঠিয়া সুরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। যামিনী মমতাকে লইয়া আড়ালেই রহিলেন, কারণ এখানে তাঁহাদের খানিকটা পর্দ্দানশীনভাবে থাকিতে হয়, না হইলে সুরেশ্বরের মর্য্যাদার হানি হয়। মমতা এখন তরুণী, তাহাকেও এখন কিছু কিছু পর্দ্দা মানিতে হইবে।

নৌকা হইতে দুই ধারে পর্দ্দা ঝুলাইয়া তবে মহিলারা নামিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। দাসীদের জন্য ডুলি আসিয়াছিল, তাহারা তাহাতেই চড়িয়া চলিল। সুরেশ্বর হাতীতে উঠিলেন অনেক কষ্টে, ভয় যে কিছু না হইল তাহা নয়, তবে ডাক্তারবাবু সঙ্গে চলিলেন, ইহাই যা ভরসা। সুজিত ঘোড়াটির রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, তবে

কাদায়-ভরা রাস্তা দেখিয়া সে-সন্তোষ তাহার মুহূর্ত্তমধ্যে উবিয়া গেল। সঙ্গের লোকজন কতক হাঁটিয়া, কতক ঘোড়ায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

মমতার এমন সুন্দর জায়গায় বন্ধ-করা ঘেরাটোপ-দেওয়া পাল্কীতে যাইতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। পিতার রাগের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া সে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। যামিনীরও অবশ্য কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু এই লইয়া আবার স্বামীর সঙ্গে একটা হট্টগোল বাধিয়া যায়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কাজেই তিনি পর্দ্দা বজায় রাখিয়াই চলিলেন।

ঘণ্টা-দেড়েক এই ভাবে চলিয়া তাঁহারা কাছারি-বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন। চারিদিক্ লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই একটু যেন ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, সুরেশ্বর যে বিশেষ খোশ মেজাজে মহাল তদারক করিতে আসেন নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল।

কাছারি-বাড়ীখানি মস্ত বড় দু-মহলা। আগে আগে কর্ত্তারা প্রায়ই এ সব দিকে আসিতেন, অনেক সময় সপরিবারেও আসিতেন। কাজেই অন্দরমহল একটা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এতকাল উহা বন্ধই পড়িয়া ছিল, অব্যবহার এবং মধ্যে মধ্যে অপব্যবহারে খানিকটা নষ্টও হইয়া গিয়াছিল। যামিনীদের আসিবার সংবাদ পাইয়া নায়েব-মহাশয় কয়েকদিনের মধ্যে ঘরগুলি যথাসাধ্য মেরামত ও পরিষ্কার করাইয়াছেন। তবু কলিকাতায় আজন্মপালিতা জমিদারগৃহিণী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যার হয়ত অত্যন্ত অসুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া ছিলেন।

যামিনী পাল্কী হইতে নামিয়া একবার সমস্ত বাড়ীখানা ঘুরিয়া

দেখিলেন। ঘর তিন-চারখানা আছে, এবং আসবাবপত্রও কাজচলা-গোছের রহিয়াছে। প্রজার দল এবং কর্ম্মচারীর দল এখন ঘণ্টা-দুই সুরেশ্বরকে বাহিরেই আটক করিয়া রাখিবে, সুজিতও অন্ততঃ তামাসা দেখার খাতিরে সেইখানেই থাকিবে। ইহারই মধ্যে ঝি চাকর ও কন্যার সাহায্যে তাঁহাকে ঘরদোর গুছাইয়া এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে, না হইলে সুরেশ্বর আর রক্ষা রাখিবেন না।

সঙ্গের বড় বড় পেট্রোম্যাক্স্ লণ্ঠনগুলি জ্বালাইবার আদেশ দিয়া তিনি মমতাকে লইয়া কে কোন্ ঘরে থাকিবে তাহা ঠিক করিয়া ফেলিলেন, এবং বিছানার পোঁটলা-পুঁটলি খোলাইয়া প্রথমেই শয়নের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। শুইবার ঘর দুখানা বেশ বড় আছে, একখানায় তাঁহারা মাতা ও কন্যায় থাকিবেন, অন্যখানি সুরেশ্বরের জন্য প্রস্তুত করা হইল। মমতা বলিল, "ভালই হ'ল মা, বাবার ঘরটা অনেক দূরে, না হ'লে আমরা ঘরে ব'সে একটু মন খুলে কথা ও বল্‌তে পারতাম না।"

যামিনী মেয়ের কথার উত্তরে শুধু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, "খোকার ঘরটা বড় ছোট হ'ল, ও তাই নিয়ে আবার হৈ চৈ না করে।"

ভাই সম্বন্ধে মমতার সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। সে সুন্দর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা কি করা যাবে এখন? তার ভাল না-লাগে ত সে সামনের মহলে গিয়ে থাক।"

যামিনী বলিলেন, "তা কি আর হয়? একলা ঐ সব কর্ম্মচারীদের মধ্যে থাকতে পারবে কেন?"

তাহার পর রান্নার পালা। নায়েব-মহাশয়ের হুকুমে মাছ-মাংস, দুধ-ঘি,

যেখানে যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে, সবই নির্ব্বিচারে তাঁহার লোকেরা আনিয়া হাজির করিয়াছে। যামিনী খানিক খানিক নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন, কারণ এত জিনিষ এক রাত্রে খাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের কয়জনের একেবারেই ছিল না। সঙ্গের ঠাকুর উনান ধরাইয়া রান্নাবান্নার যোগাড় করিতে লাগিল। দাসীরা তাহার সাহায্য করিতে লাগিল।

মমতা মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসিয়া জুটিতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া যাইতেছিল বা ছাদে উঠিয়া বসিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, বাহিরে কিছু একটা বড় দেখা যায় না। তবু এই ক্ষীণ আলোতেই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মমতা কাহাকে যেন আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কোথায় সে আছে কে জানে? কাছারি-বাড়ীর পরেই আমলা পাইকদের পাড়া, তাহার পর আসল গ্রামের আরম্ভ। এই গ্রামখানির পরে আরও কত গ্রাম পরে পরে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় তাহারা আছে, কে মমতাকে বলিয়া দিবে? জিজ্ঞাসাই বা সে কোন্ লজ্জায় কাহাকে করিবে? ছায়া ত এ জায়গারই [illegible] করিয়াছিল। কিন্তু এতদিন কি স্বেচ্ছাসেবকের দল একই স্থানে আ[illegible] না কাজের ঠেলায় অন্য কোনও দিকে চলিয়া গিয়াছে? ছায়াকে [illegible] অমর চিঠিপত্র লেখে? কে জানে? তাহা হইলে ছায়ার কাছে কিছু খবর মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু তাহাকেই বা খোলাখুলি অমরের কথা কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়?

নীচে হইতে মুখী ঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, নীচে নেমে এস, মা-ঠাকরুণ ডাকছেন।"

মমতা নীচে নামিয়া গেল। ঘরদোর ইহারই ভিতর বেশ গোছান,

বাস-যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যেন মৃণ্ময়ী প্রতিমার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। কে বলিবে যে ইহা বহুকাল-পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ী? মানুষের কণ্ঠস্বরের এমন এক বিচিত্র শক্তি আছে যে মুহূর্ত্তের মধ্যে মাটির স্তূপকে সে আনন্দের নিকেতনে পরিণত করিতে পারে।

যামিনী বলিলেন, "কোথায় একলা গিয়েছিলে মা, অন্ধকারে? এ সাপখোপের দেশ, এখানে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। অন্ধকারে কখনও কোথাও যেও না।"

মমতা হাসিয়া বলিল, "একটু ছাদে উঠেছিলাম মা। সাপ যে সত্যি কোথাও ছাড়া অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, তা কেমন যেন আমার বিশ্বাসই হয় না। কলকাতায় ত চিড়িয়াখানা আর সাপুড়ের থলি ছাড়া সাপ কখনও দেখি নি?"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখানেও বেশী না দেখতে হ'লেই ভাল। অনেক বছর এ দিকে আসি নি, কিন্তু সাপের উৎপাত ছিল তা এখনও মনে আছে।"

সদরে এতক্ষণ ধরিয়া সুরেশ্বরের দরবার চলিতেছিল, এখন বোধ হয় তাহা ভাঙিয়া গেল। আলো-হাতে চাকর তাঁহাকে আগ বাড়াইয়া আনিতে চলিল। সুজিতেরও এতক্ষণ কোনও সন্ধান পা ্যা যায় নাই। এ-সব ব্যাপার তাহার কাছে একেবারেই নূতন, তাই গভীর মনোযোগ সহকারে সে এতক্ষণ সব ব্যাপার দেখিতেছিল। সভা ভাঙিয়া যাওয়ায় সেও চলিয়া আসিল।

ক্লান্তিতে সুরেশ্বরের শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, স্ত্রীর খুঁৎ ধরিবার মত শক্তিও তাঁহার অবশিষ্ট ছিল না। ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং পরিপাটী করিয়া বিছানা পাতা আছে দেখিয়া তিনি

বর্ত্তিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া শুইয়া পড়িলেন। খাবারও তাঁহাকে বিছানার পাশে ছোট টেবিলে আনিয়া দেওয়া হইল, কারণ খাইতে উঠিতেও তিনি আর রাজি হইলেন না।

সুজিত ছেলেমানুষ, অত দমিয়া অবশ্য যায় নাই, কিন্তু সেও ত সুখী মানুষ, পরিশ্রম করা বা অসুবিধা সহ্য করা তাহারও কোনও দিন অভ্যাস নাই। কাজেই সেও খাইয়া শুইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যামিনী, মমতা ও সুজিত সকলেই খাইয়া-দাইয়া শুইতে চলিয়া গেলেন, কারণ রাত্রের খাওয়া চুকাইয়া দিলে এই পল্লীগ্রামে আর কিই বা করা যাইতে পারে? এখানে বিজলীর বাতি নাই, চারিদিকে আঁধারের বান ডাকিতেছে। শব্দের মধ্যে শুধু শেয়ালের ডাক আর ঝিল্লীধ্বনি। থিয়েটার নাই, বায়োস্কোপ নাই, মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই। বন্ধুবান্ধব নাই যে রাত একটা অবধি জাগিয়া আড্ডা দেওয়া যাইবে, কাজেই ঘুমাইয়া পড়া ছাড়া গতি নাই। সুজিত কখনও এত সকাল সকাল ঘুমায় না, কিন্তু অবস্থাচক্রে তাহাকেও আজ ঘুমাইতে হইল। একলা ঘরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া জাগিয়া থাকিতে পারে এক কবি, নয় যাহার প্রাণে শোকের আগুন জ্বলিতেছে সে। সুজিত কোনও দলেই পড়ে না, সুতরাং মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং এমনই নিস্তব্ধতার গুণ, যে খানিক পরে ঘুমাইয়াও পড়িল। কলিকাতায় আজন্ম বাস করা সত্ত্বেও যামিনীর বেশ ভোরে উঠা অভ্যাস ছিল। সূর্য্যোদয় না দেখিলে তাঁহার প্রাণে যেন তৃপ্তি আসিত না। তাই এখানেও তাঁহার ভোরবেলাই ঘুম ভাঙিয়া গেল। অস্পষ্ট আলোয় ঘরের চারি পাশ দেখা যাইতেছে, পাশে মমতা তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। পথশ্রমে সেও কাল বড় কাতর হইয়াছিল, যদিও মনে আনন্দের জোয়ার ডাকিয়া

যাওয়ায় সে ক্লান্তিকেও আমল দেয় নাই। অন্য দিন সে প্রায় মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠে, আজ আর উঠে নাই। সস্নেহে একবার নিদ্রিতা কন্যার দিকে তাকাইয়া, মশারি তুলিয়া যামিনী বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ঝি, চাকর, ঠাকুর সকলেই উঠিয়াছে বটে, তবে অভ্যস্ত কর্ম্মস্রোতে কলিকাতার বাড়ীতে যেমন অনায়াসে সকলে গা ঢালিয়া দেয়, নূতন স্থানে তেমন পারিতেছে না, সকল দিকেই তাহাদের বাধিতেছে। যামিনীকে দেখিয়া সকলেই নানা রকম নালিশ লইয়া আসিয়া হাজির হইল।

এমন সুন্দর সকালবেলাটা ঝি-চাকরের কচকচি শুনিতে যামিনীর ভাল লাগিল না। "নূতন জায়গায় একটু অসুবিধে ত হবেই, দে'খে-শুনে কাজ চালিয়ে নাও," বলিয়া তিনি মুখ ধুইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর ছাদে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লৌহকারা হইতে বহু বৎসর তিনি মুক্তি পান নাই। ভিতরে ভিতরে কতখানি যে তিনি হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আজ এই দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন। শহরে থাকিয়া থাকিয়া মানুষ কি খানিকটা যন্ত্রের মত হইয়া যায় না?

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন; মমতা ইহারই মধ্যে উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, মায়ের পিছন পিছন ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যামিনী বলিলেন, "আমি তোকে ডাকলাম না আর একটু ঘুমবি ব'লে, এরই মধ্যে উঠে পড়েছিস্?"

মমতা হাসিয়া বলিল, "এমন সুন্দর জায়গায় ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না মা। দেখ দেখি পূবের দিকে চেয়ে। কি আশ্চর্য্য

সুন্দর রং! এ রকম কলকাতার আকাশে দেখা যায় না। ঐ মাঠটায় নেমে গিয়ে বেড়ালে হয় না মা?"

যামিনী মেয়ের উচ্ছ্বাসে হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবা তা'হ'লে ভয়ানক চ'টে যাবেন। এখানে একেবারে ঝুড়ি-চাপা হয়ে থাকা নিয়ম, না হ'লে মান থাকে না!"

মমতা বলিল, "কি জ্বালা, বাপ্ রে বাপ! এ সব বোকামি কি ক'রে যে প্রথমে মানুষের মনে এল তাই ভাবি। আমি ঠিক বলব বাবাকে।"

যামিনী বলিলেন, "তা বলিস্। একেবারে ভোরে না বেরলেই ভাল তবু, একটু ফরসা হ'লে যাস্।"

নীচে ঝি ডাকাডাকি করিতেছে। তাঁহাদের চা ইহারই মধ্যে প্রস্তুত। কলিকাতায় মা এবং মেয়ে সর্ব্বদা একসঙ্গে থান, সুরেশ্ব[illegible]নও তাহাদের ছায়া মাড়ান না, সুজিত একদিন আসে ত পনর দিন আসে[illegible]

নীচে একটি বড় হল-ঘর, তাহাই খাওয়ার ঘর, এবং মেয়েদে[illegible] বসিবার ঘর রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। সুরেশ্বরের ত বাহিরের [illegible]কখানা পড়িয়াই আছে। সুজিতের বসিবার ঘরের কোনও প্রয়োজ[illegible] হবে না, কারণ এখানে তাহার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই, এবং বসিয়া থা[illegible]র ইচ্ছাও বিশেষ নাই। যে ক'দিন বাধ্য হইয়া তাহাকে এখানে থাকিতে হইবে, তাহা সে ঘোড়ায় চড়িয়া, মাছ ধরিয়া, এবং সাঁতার শিখিবার চেষ্টা করিয়া কাটাইয়া দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

মমতা চা খাওয়ার আয়োজনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "মা, এরা কি মনে করে আমরা রাক্ষস? এত কখনও খাওয়া যায়?"

যামিনী বলিলেন, "এত যে খাই না তা তারা বেশ জানে। আদরযত্ন

করার আমাদের দেশে এই পদ্ধতি। যা দরকার, তার দশ গুণ দিয়ে নষ্ট না করলে যথেষ্ট খাতির করা হয় না।”

একটু পরে বলিলেন, “ডাক্তারবাবু বেচারা বেশ ও-মহলে একঘরে হয়ে আছেন। তাঁকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিই।”

মমতা বলিল, “আগে ভজাকে জিগ্‌গেস কর যে তিনি উঠেছেন কি না।”

চাকর খবর দিল যে ডাক্তার বাবু উঠিয়া হাত মুখ ধুইতেছেন। যামিনী ছোট ট্রেতে করিয়া চা ও জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন।

চা খাওয়া শেষ করিয়া মা ও মেয়ে আবার ছাদে বেড়াইতে গেলেন। মমতা বলিল, “এলাম ত চ'লে, এখন দিনগুলো কি ক'রে যে কাটাই তাই ভাবছি। কলেজও নেই, পড়াও নেই, চেনাশুনা মানুষও নেই।”

যামিনী বলিলেন, “মানুষ ঢের এসে জুটবে এখন, তার জন্যে ভাবনা নেই, তবে তোর তাদের পছন্দ হবে কি না জানি না, ঠিক কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়েদের মত তারা নয়। একটু বেলা হ'তে দে, তখন দেখিস্।”

মমতা বলিল, “এখানকার গ্রামের মেয়েরা ত? আমার তাদের ভালই লাগে মা, তবে বিয়ে হয় নি শুনে তারা এমন আকাশ থেকে পড়ে যে তাতেই বিরক্ত লাগে।”

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, “অত অল্পে বিরক্ত হ'লে চলবে কেন? এখন ত সব জায়গায়ই মেয়েদের বড় বয়সে বিয়ে হয়, লোকের চোখে খানিক সয়ে গেছে। আমাদের কালে, আমরা যেখানে গেছি, লোককে একেবারে চমক লাগিয়ে দিয়েছি। এত বিশ্রী লাগত যে কোথাও যেতেই চাইতাম না।”

এতক্ষণে পরিবারস্থ পুরুষগুলির যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সুরেশ্বর চাকরকে ডাকিতেছেন, সুজিতের সহচর কুকুরটিও একবার চেঁচাইয়া উঠিল, তাহা প্রভুর লাথি খাইয়া কি অন্য কোনও কারণে, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

যামিনী নামিয়া আসিলেন। সুরেশ্বরের কাছে পান হইতে চূণ খসিবার জো নাই, তাহা হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে।

সুরেশ্বর উঠিয়া মুখ ধুইতেছেন, চাকর তাঁহার খাবার ঠিক করিতেছে। স্থানমাহাত্ম্য এমনই যে তিনিও সকালবেলাটায় অকারণেই একটু প্রসন্ন হইয়া আছেন। এমন কি যামিনীকে দেখিয়াও ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন না।

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে ভাল ক'রে ঘুম হয়েছিল ত বাবা ?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "নূতন জায়গায় তেমন কি আর ভাল ঘুম হয় ? দেখ না, কত সকালে উঠে পড়েছি ? এর পর সারাদিন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে।"

যামিনী বলিলেন, "এক দিনেই বেশী বাড়াবাড়ি না করা ভাল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "বাড়াবাড়ি করি কি আর সাধে ? একে প্রজারাই পাজি, তারপর এক দল কলকাতার ছোঁড়া এসে জুটেছে, তাদের উস্‌কবার জন্যে। সেগুলিকে আবার টিট করতে হবে।"

২১

স্নানাহার সারিতে একটু বেলা হইয়া গেল। এখানে ঝি-চাকরও ঠিক সময় মত কাজ গুছাইয়া করিতে পারিতেছে না, মনিবরাও সারাক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া নাই, কাজেই সব কাজের সময়ই খানিক পিছাইয়া যাইতেছে। সুরেশ্বর সকালে চা খাইয়া বাহির বাড়ীতে গিয়া বসিয়াছিলেন, বারটা বাজিতে তবে ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিয়াছেন। যামিনী স্নান আগেই সারিয়াছিলেন, তবে খাওয়া দাওয়া করেন নাই। এখানের মানুষগুলি গিন্নীকে কর্ত্তার আগে খাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে এত অধিক মাত্রায় বিস্মিত হইবে যে তাহার ধাক্কা সামলান হইবে দুষ্কর।

কিন্তু ছেলেমেয়ের ত বাবার আগে খাইতে বাধা নাই, তাহাদের আর কেন দেরি করান? যামিনী সুজিতের খোঁজ লইয়া জানিলেন সারাদিন সে ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, এই সবে ফিরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছে। কিন্তু মমতা গেল কোথায়? সে তাঁহারই পরে স্নান করিতে গিয়াছিল, স্নান ত বহুক্ষণ শেষ হইয়াছে। ঘরে ত সে নাই? তবে কি এই দুপুর রোদে ছাদে গিয়া বসিয়া আছে? মেয়ে তাঁহার সকল দিকেই পাগল। মেয়ের সন্ধানে যামিনীও ছাদে উঠিয়া আসিলেন।

সত্যই মমতা ছাদেরই এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। যামিনী পিছন

হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এই রোদে দাঁড়িয়ে মাথাটার চাঁদি উড়ে যাবে যে? এখানে কি করছিস্?"

মায়ের গলার স্বরে চকিত হইয়া মমতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। যামিনী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তাহার দুই চোখে জল টল্‌টল্ করিতেছে, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মনের আবেগে কি রোদের ঝাঁজে তাহা অবশ্য বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি মেয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা? চোখে জল কেন?"

মমতা নিজেকে সম্বরণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। তবু মায়ের কথার উত্তর দিতে তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। বলিল, "বাবা কেন গরিবদের ওপর এত অত্যাচার করেন মা? নিজে ত তাদের জন্যে কিছু করবেন না, অন্যে যদি তাদের সাহায্য করতে আসে, তাদেরও বাধা দেবেন?"

যামিনী বলিলেন, "কেন, এখানে আবার কি হ'ল?"

মমতা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল; যে-কোণটায় তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, সেখান হইতে বৈঠকখানার বারান্দার একটা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্দার উপরের বেঞ্চিতে কয়েক জন যুবক বসিয়া আছে, সকলেরই মুখ গম্ভীর। নীচে উঠানে একদল প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা চোখ মুছিতেছে, কেহ বা অপরের সঙ্গে হাত মুখ নাড়িয়া কথা বলিতেছে।

মমতা বলিল, "দেখ মা, এই ছেলেগুলি কত কষ্ট সহ্য ক'রে এই সব গাঁয়ের লোকদের সাহায্য করতে এসেছে। আর বাবা তাদের ডেকে ধমক-ধামক করছেন, এইটাই কি তাঁর উচিত হচ্ছে?"

যামিনী বলিলেন, "উচিত ত নয়ই মা। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? যা তোমার বাবা নিজে বুঝবেন না, তা তাঁকে কেউ বোঝাতে পারবে না, কাজেই বাধ্য হয়ে ওসব দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি।"

মমতা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমি কিন্তু পারব না মা, আমি ঠিক বাবাকে বলব। তাতে তিনি আমায় যতই বকুন না কেন।"

যামিনী একটু অবাক্ হইয়া গেলেন। দীনদুঃখীর প্রতি সুরেশ্বরের সমবেদনা কোনও দিনই নাই, মমতা তাহা বরাবর জানে। তাহাতে দুঃখ পায় বটে, লজ্জিতও হয়, কিন্তু এতখানি উত্তেজিত ত কোনওদিন হয় নাই? এখানে আসিয়া হঠাৎ তাহার মনে এমন ভাবের কেন আবির্ভাব ঘটিল? মেয়েকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, "ওঁকে ও সব ব'লে কিছুই লাভ নেই তা ত তুমি জানই মা! অনর্থক রাগারাগি ক'রে শরীরটাকে আরও বেশী ক'রে খারাপ করবেন।"

মমতা বলিল, "তবে তুমি ওদের ডেকে পাঠাও মা, বল যে আমরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব। অমলাদেরও বারণ ক'রে দাও, তারা যেন ওদের উপর কোনও অত্যাচার না করে।"

যামিনী বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যি কি মা? তাতে মন্দই হবে, উনি চ'টে যা তা করতে থাকবেন। এখন নীচে চল, খাওয়া দাওয়া করবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

মমতা তাঁহার সঙ্গে নীচে চলিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, "খেতে টেতে আমার কিচ্ছু ইচ্ছে করছে না মা।"

খাবার ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখা গেল, সুরেশ্বর কাছারিঘর হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকেও যথেষ্ট উত্তেজিত ও বিরক্ত দেখাইতেছে।

স্ত্রী ও কন্যাকে সামনে দেখিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন, "কি, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? আমি ত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরব না বোধ হয়, যা এক দল ডাকাতের হাতে পড়া গেছে। তারা আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ ক'রে তবে ছাড়বে।"

যামিনী বলিলেন, "খানিকটা গোলমাল সইতে হবে জেনেই ত এখানে আসা? যতটা পার সামলে চল। অনেক বেলা হয়ে গেছে, স্নান ক'রে খেয়ে নাও।"

সুরেশ্বর স্নান করিবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া, একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "সামলে চলব কি, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র সুরু করেছে কি ক'রে আমায় ফাঁকি দেওয়া যায়। এই কলকাতার ছোঁড়াগুলো সবার ওঁছা, ওদের যে কিছুতেই বাগ মানান যাচ্ছে না?"

মমতা ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তারা কি করছে বাবা?"

সুরেশ্বর অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "দেশোদ্ধার করছেন, পরোপকার করছেন, অর্থাৎ আমার পিণ্ডির ব্যবস্থা করছেন। প্রজা ক্ষ্যাপানির মতলব আর কি? আজ ডেকে পাঠিয়েছিলাম সবগুলোকে, তা পাঁচ-ছটা মোটে এল, সে কি বক্তৃতার ঘটা, যেন আমাকে কচি খোকা পেয়েছে।"

মমতা আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, যামিনী সুরেশ্বরের অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "তোরা দু-জন খেতে ব'স্, বেশী বেলায় খেলে আবার অসুখ-বিসুখ করতে পারে। এ-সব ত কোনও কালে অভ্যাস নেই।"

সুজিত স্নান করিয়া আসিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। সুরেশ্বরও চেয়ার

ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। মমতা আর সুজিতের খাবার আসিল, তাহারা খাইতে বসিল। যামিনী সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। চাকর বাহির বাড়ীতে ডাক্তার-বাবুর খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

দুপুরে একটু না ঘুমাইলে সুরেশ্বরের চলিত না। তিনি খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মমতা কেমন আন্‌মনা হইয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুজিত বন্ধুর অভাবে কয়েক জন পাইককে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘোড়া, কুকুর, বাঘ, ভাল্লুকের গল্প জুড়িয়া দিল। যামিনী খাইতে বসিলেন সবার শেষে, তাঁহার খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল।

দুপুরে এখানে কিই বা করা যায়? কলিকাতা হইতে খান-কয়েক বই আনিয়াছিলেন, তাহারই একটা হাতে করিয়া খাটের উপর গিয়া বসিলেন। যদি একটু ঘুমাইতে পারেন ত মন্দ হয় না। নূতন জায়গায় আসিয়া পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্যে কাল রাত্রে তাঁহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই।

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ, চুড়িবালার শিঞ্জন, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলার আওয়াজ। যামিনী ফিরিয়া তাকাইলেন। দরজার কাছে পাঁচ-ছয়টি নারীমূর্ত্তি, ঘোমটায় মুখ ঢাকা, শুধু পানের রসে লাল ঠোঁটগুলি দেখা যাইতেছে, চেহারা যে কাহার কি প্রকার তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পরনে চওড়া পাড়ের দিশী শাড়ী, পায়ে আল্‌তা, গায়ে সকলেরই কিছু কিছু গহনা আছে। সঙ্গে গুটিকয়েক শিশু, তাহারা অপরিসীম কৌতূহল চোখে ভরিয়া যামিনীর দিকে তাকাইয়া আছে। মুখী ঝি তাহাদের ভীড় ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া খবর দিল, "মা, এরা সব গ্রামের ভিতর থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

যামিনী বই সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আসুন, ঘরের ভেতর আসুন। মুখী, এদের বসবার জায়গা দে।"

মেয়ের দল ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখী খুঁজিয়া পাতিয়া মস্তবড় একটা শতরঞ্জি আনিয়া ঘরের মেঝেতে পাতিয়া দিয়া বলিল, "বসুন আপনারা।"

ছেলেমেয়েগুলিই আগে বসিয়া পড়িল, তাহাদের মা-মাসীর দলও একে একে বসিল। চোখ কিন্তু সকলেরই যামিনীর উপর, যেন এক দণ্ডের জন্য অন্য দিকে চোখ ফিরাইলে কি একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবে। ঘোমটা-গুলিও অল্পে অল্পে সরিতে আরম্ভ করিল। নানা রকম, নানা বয়সের কতকগুলি নারীমূর্ত্তি এইবার ভাল করিয়া দেখা গেল।

যামিনী খাট হইতে নামিয়া তাহাদের দলে বসিবার যোগাড় করিতেই তিন-চার জন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "ও কি, ও কি, আপনি খাটের উপরে বসুন মা, নীচে কেন বসবেন?" জমিদার-গৃহিণীকে তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া তাহারা একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনেক ক্ষণই কথা না বলিয়া বসিয়া থাকিবার আদেশ লইয়া তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। শিক্ষিতা প্রভুপত্নীর সম্মুখে অনাবশ্যক বাচালতা যাহাতে প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে সকলেই পতি-দেবতাদের নিকট হইতে হুকুম শুনিয়াছে। কিন্তু যামিনীকে এমন অ-বনিয়াদী ব্যাপার করিতে দেখিয়া তাহারা সে-সব তালিম দেওয়া ভুলিয়া গেল।

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, নীচেই বসি। আপনারা পাঁচ-জন এসেছেন, একসঙ্গে বসাই ভাল। মুখী যা ত রে, খুকী কোথায় আছে দেখ্। তাকে ডেকে দে এখানে।"

যামিনী নীচেই বসিলেন। অভ্যাগতারা জড়সড় হইয়া এক কোণে ঘেঁষিয়া বসিল, যাহাতে যামিনীর মর্য্যাদার কোনও হানি না হয়।

কেহই আর কথা বলে না, খালি হাঁ করিয়া তাকাইয়াই আছে। শিশুরা দুষ্টামি করিবার চেষ্টা করিলে, বয়োজ্যেষ্ঠারা অন্তরটিপুনি দিয়া তাহাদেরও ধীরস্থির করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যামিনীর বসিয়া বসিয়া অতিশয় অস্বস্তি লাগিতে লাগিল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা সব সামনের পাড়া থেকেই আসছেন, না?"

দুই-এক জন মাথা হেলাইয়া জানাইয়া দিল যে তাহাই বটে। একটি মুখরা বধূ আর থাকিতে না পারিয়া এক জন প্রৌঢ়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ইনি নায়েব-মশায়ের ভাজ।" স্ত্রীলোক হইয়া কতক্ষণ স্ত্রীলোকের সামনে মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকা যায়?

এমন সময় মুখীর সঙ্গে মমতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তৎক্ষণাৎ সবাইকার দৃষ্টি একযোগে গিয়া পড়িল তাহার উপর, যামিনীর সম্বন্ধে কাহারও আর কোনও কৌতূহল রহিল না। অতগুলি চোখের দৃষ্টির আঘাতে বিব্রত হইয়া মমতা মায়ের কাছ ঘেঁসিয়া তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

নায়েব-মশায়ের ভাজ একটু গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটি মেয়ে বুঝি?"

যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ।"

যে বউটি প্রথম কথা বলিয়াছিল সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয় নি মা? কই সিঁদুর ত নেই মাথায়?"

মমতার মুখ বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিল। এই সুরু হইল উৎপাত। বিয়ে ছাড়া এই মেয়েগুলির কি বলিবার কোনও কথাই নাই? যামিনী

মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "না, এখনও কলেজে পড়ছে। পড়াশুনো শেষ হ'লে তবে বিয়ে হবে।"

আর এক জন শীর্ণকায়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর ছেলেপিলে কি মা?"

যামিনী বলিলেন, "ছেলে একটি আছে।"

একটি বছর তিন-চারের অত্যন্ত রোগা মেয়ে ক্রমাগত কাশিয়া চলিয়াছে। তাহার এমন চেহারা যে তাহার দিকে তাকাইলেই কষ্ট বোধ হয়, কণ্ঠার হাড়গুলি দুই ইঞ্চি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, পাঁজরগুলি গুণিতে পারা যায়। গায়ে পাতলা আধছেঁড়া একটা জামা, আর কোনও পরিচ্ছদের বালাই নাই। মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি হয়েছে, এত কাশছে যে?"

নায়েব-মশায়ের ভাজ বলিলেন, "ওর জন্মাবধি এই রকম সর্দ্দির ধাত। শীতকাল বর্ষাকাল এই রকমই থাকে, গরম পড়লে সামলায়।"

যামিনী বলিলেন, "ওষুধপত্র খায় না কিছু?"

সেই শীর্ণা মহিলাটি বলিলেন, "ওষুধ খেয়ে কি হবে মা? ওষুধে কি আর ধাত বদলায়? তা ছাড়া অবস্থা ভাল না, ওসব কোথা থেকে করবে? মা-টাও বারোমাস সূতিকায় ভোগে, দেখতে শুনতে পারে না। বছর বছর হচ্ছে, এর পরেও দুটো আছে। আমি আসছিলাম, তা আমার সঙ্গে দিয়ে দিলে, আমি ভাবলাম তা চলুক, মা-টার হাড় দু-দণ্ড জিরোক।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাঁয়ে এখন জরজাড়ি খুব হচ্ছে বুঝি?"

নায়েব-মশায়ের ভাজই দলের নেত্রী হইয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন, "এখনও ততটা নয়, তবে বর্ষা শেষ হ'তে-না-হ'তে ঘরে ঘরে সব শয্যা নেবে। যা ম্যালেরিয়ার ঘটা! কোনও ঘরে আর বিকেলে হাঁড়ি চড়াতে হয় না। এখনও হচ্ছে, তা সে-সব সর্দ্দি-জর। কল্‌কাতার

সব ছেলেরা এসেছে, ঘরে ঘরে ঘুরে ওষুধ দিচ্ছে, তাতেই ততটা বাড়াবাড়ি হয় নি।"

সেই বধূটি বলিল, "আর যা রাগ আমাদের পাঁচকড়ি কবিরাজের, বলে, আমার ভাত মারবার জন্যে শহর থেকে এই বারো ভূতের আমদানী হয়েছে। তাকে কেউ ডাকছে না কিনা ?"

কবিরাজ-মহাশয়ের একটি দূর সম্পর্কের ভগিনী বসিয়াছিলেন, তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "তা বাছা, বলবেই ত ? এই সময় যা একটু দু-চার পয়সা পায়, তাও লোকে বাদ সাধলে সহ্যি হয় ?"

মমতা অবাক্ হইয়া এই অপরূপ ঝগড়া শুনিতেছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও বলে নাই। হঠাৎ বলিল, "যারা পরের উপকার করতে এসেছে তাদের এ রকম ক'রে বলা উচিত নয়। নিজের স্বার্থের জন্যে ত আর তারা কারও ভাত মারছে না ?"

মেয়ের উত্তেজনায় যামিনী একটু বিস্মিত হইলেন। নায়েবের ভাজ বলিলেন, "তা ত ঠিক মা, তবে ছোটলোকদের এরা বড় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা ভাল কাজ না। এমনিতেই আজকাল' নানা রকম কথা শুনে তারা নিজেদের বামুন কায়েত সবার সমান মনে করে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ছেলেগুলি আছে কোথায় ?"

একটি আট-ন, বছরের মেয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "সব ত পছিমের মাঠে তাঁবু পেতেছে, ঘর বেঁধেছে, সেই হাড়িপাড়ার কাছে। মেজখুড়ী বলে ওরা ভদ্দর নোক না, তাহ'লে হাড়িদের কাছে থাকবে কেন ?"

মেজখুড়ী উপস্থিত ছিলেন, তিনি ভাসুরঝির কথায় অপ্রস্তুত হইয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

মমতার মন ক্রমেই ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া আসিতেছিল। এই

নাকি পল্লীগ্রামের বিখ্যাত সরলতা আর মানব-প্রীতি? ইহার চেয়ে দেখি শহরের লোকও ভাল, তাহারা তবু একটু বুঝিতে পারে। ইহাদের উপকার করিতে আসাও ঝকমারির কাজ।

যামিনী বলিলেন, "এ-সব দিকে বানে খুব ক্ষতি করেছে, না ততটা নয়?"

মহিলারা বুঝিলেন জমিদার-গৃহিণী এইবার কাজের কথায় নামিলেন, প্রজাদের আসল অবস্থা জানাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। নায়েব-মশায়ের ভাজ বলিলেন, "তা ক্ষেতি হয়েছে বই কি মা, খুবই হয়েছে, ঘরদোর পড়েছে, গরু-বাছুর ভেসে গেছে। ধান ত একেবারে গেল, কি যে এবার মানষে খাবে তার ঠিকঠিকানা নেই।"

একটি কিশোরী বলিল, "জলটা ত প্রায় আমাদের কোঠার কাছাকাছি এসেছিল, আর একটু এগুলে আমাদের ঘরও পড়ে যেত।"

সে বধূটি বলিল, "নামোপাড়ায় যা কাণ্ড হ'ল। ঘরদোর ডুবে গেল, মানুষ গিয়ে চালে উঠল। কলকাতার ছেলেগুলো শেষে নৌকো ক'রে এসে মই দিয়ে তবে তাঁদের নামায়। সে যা মুস্কিল!"

একটি বালিকা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "মুটকীপিসী কেমন কুমড়ো-গড়াগড়ি গেল মা?"

যামিনী ঝিদের পানমশলা লইয়া আসিতে বলিলেন। কলিকাতার মানুষ হইলে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু এখানে সেটা চলিবে কিনা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া তাঁহারা কায়স্থ, ইহাদের ভিতর ব্রাহ্মণকন্যাও কেহ থাকিলে থাকিতে পারে।

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ছেলেমেয়েদের হাতে চকোলেট দেব মা? কল্‌কাতা থেকে অনেক নিয়ে এসেছি।"

যামিনী বলিলেন, "দাও।" মমতা চকোলেট আনিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবকের দল কোথায় আছে তাহা ত জানা গেল, কিন্তু কোনওদিন অমরের সঙ্গে তাহার দেখা হইবে কি? হইলেও কি চক্ষে সে মমতাকে দেখিবে কে জানে? মমতার বাবা ত খোলাখুলি এখন তাহাদের শত্রুপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, যথাসাধ্য তাহাদের কাজে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। মমতাকেও অমর শত্রুই মনে করিবে নাকি? মমতার দুই চোখ এই কথা ভাবিতেই জলে ভরিয়া উঠিল।

২২

প্রথম দিনটা ত কোনও মতে কাটিয়া গেল, তাহার পর সময় যেন আর কাটিতে চায় না। মমতা ভাবিয়া পায় না, বারোটা ঘণ্টা সে কি করিবে। কাজকর্ম্ম কিছুই নাই, একটা কাজ করিবার তিনটা করিয়া মানুষ আছে। পড়িবার বই সব সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু পড়ায় সে এক মিনিটও মন দিতে পারে না। বাহিরের আকাশ, চারিদিকের উন্মুক্ত প্রান্তর, দিগন্তে বিলীয়মান গাছের শ্যামশ্রেণী তাহার দুই চোখকে টানিয়া নেয়, মন তাহারই ভিতরে ডুবিয়া যায়, হাতের বই কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে—তাহার খেয়াল থাকে না। কিন্তু শুধু বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সারাটা দিন ত কাটে না? মনের ভিতরটা কেবলই অস্থির অশান্ত হইয়া উঠে, কেমন যেন হু হু করিতে থাকে। এখানে আসিয়া সে শান্তি পাইবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু শান্তি পাইল কই? কলিকাতার চেয়েও যেন এখানটা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছে। সেখানে সে নিশ্চয় করিয়া জানিত যে অমরের দেখা পাইবে না, কারণ অমর সে দেশেই নাই। কিন্তু এখানে সে যে অতি নিকটে, একেবারে ঘরের পাশে, দৈব সদয় থাকিলে মমতা তাহাকে দিনে দশবার দেখিতে পাইত। এখানেও কেন নিষ্করুণ ভাগ্য তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করে? চোখে একবার দেখা, তাহাও কি এত বেশী? এটুকুও কি পাইতে নাই?

বাড়ীর অন্য সকলেরও সময় ভাল কাটিতেছিল না। সুরেশ্বর আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, যে, সশরীরে উপস্থিত হইয়া একটু ধমক ধামক করিলেই দুষ্ট প্রজারা শিষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলেন, অবস্থা অত সহজ নয়। যাহাদের শেষ সম্বল খড়ের ঘর, গরুবাছুর পর্য্যন্ত বন্যাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা ধমক খাইলেও খাজনা দিতে পারে না। উৎপীড়িত হওয়া তাহাদের বহু শতাব্দীর অভ্যাস, মুখ বুজিয়া সব তাহারা সহ্য করে, কিন্তু টাকা দেয় না।

সুরেশ্বর স্থির করিলেন, এখানে বসিয়া মুষ্টিমেয় প্রজার উপর তম্বি না করিয়া সারা জমিদারী ঘুরিয়া বেড়াইবেন; তাহা হইলে কিছু কাজ হইলেও হইতে পারে। সব জায়গায়ই ত কলিকাতার এই দুষ্ট স্বেচ্ছা-সেবকের দল বসিয়া নাই? ইহারা এই স্থানে এমন করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া থাকাতেই যে এখানকার প্রজারা এত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সে-বিষয়ে সুরেশ্বরের সন্দেহমাত্র ছিল না। এখান হইতে নড়িবার আগে এই কলিকাতার ডেঁপো ছোক্‌রাদের কি ভাবে সায়েস্তা করিয়া যাইবেন সে বিষয়ে তিনি অনেক ফন্দি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যামিনীর দিন কলিকাতায়ও ভাল কাটিত না, এখানেও ভাল কাটিতে-ছিল না। সেখানে তবু কাজের একটা বাঁধাধরা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারই অনুসরণ করিয়া দিন এক রকম কাটিয়া যাইত। এখানে তত কাজ নাই, এবং কলিকাতার নিয়মে এখানে কাজ করাও কঠিন। ঠিক সময়ে কাজ করার এখানে মূল্য নাই, চাকরবাকর সুবিধামত যখন যাহা খুশী করে, অনেক বকাবকি করিয়াও তাহাদের শোধরানো যায় না। সব চেয়ে তাঁহার অস্বস্তি লাগিত নিজের অক্ষমতায়। এই যে দরিদ্র, উৎপীড়িত বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামবাসীর দল, ইহাদের দুর্গতি তিনি দিনের পর দিন চোখের

উপর দেখিতেছেন, অথচ কিছুই তাঁহার করিবার উপায় নাই। সুরেশ্বর তাহাদের পিষিয়া ফেলিয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু তাহাদের মারিয়া ফেলিলেও ত তাহারা জমিদারের থ... ...টাইতে পারিবে না? এ ত আর চোখে দেখা যায় না! বরং দূরে যখন ছিলেন, তখনই ভাল ছিলেন।

সব চেয়ে ভাল ছিল সুজিত, যদিও আসিবার সময় আপত্তি করিয়াছিল সে-ই সকলের চেয়ে বেশী। এখানে কি করিয়া যে একটা ঘণ্টাও কাটিতে পারে তাহাই ছিল তাহার ভাবনার বিষয়। কিন্তু আসিয়া দেখিল, কতকগুলি সুবিধা এখানে আছে, যা কলিকাতায়ও নাই। এখানে যত ঘণ্টা খুশী বসিয়া মাছ ধরা যায়। একটা ঘোড়া বেশ ভালই পাওয়া গিয়াছে, সকাল সন্ধ্যা খুব দৌড় করানো যায়। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী দুই ধারে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করে, তাহাও দেখিতে বেশ লাগে। মাইল দুই-তিন দূরে একটা বড় বিল আছে, সেখানে পাখী যথেষ্ট। একদিন গিয়া খানিকটা শিকার করিয়া আসা যায় কিনা, সে ভাবনাও সুজিত ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবী জমিদার রূপে এখানে যতটা সম্মান সে পায়, কলিকাতায় তাহার দশ ভাগের এক ভ...ও সে পাইত না। সুতরাং এখানে আসিয়া আর যেই ঠকুক, সে ঠকে ...ই।

তৃতীয় দিন সকাল হইতে আকাশটা একেবারে সুন্দর-পরিষ্কার হইয়া গেল। কোথাও মেঘের লেশমাত্র নাই। বর্ষা শেষ হইয়া এবার শরৎ যে দেখা দিবে, কলিকাতায় তাহা এত স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। ঘন নীল আকাশের দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে চাহিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, "এই রকম দিন থাকলে কালই বেরিয়ে পড়া যায়। আমি বাদলার ভয়েই দেরী করছিলাম।"

যামিনী বলিলেন, এর পর আর বিষ্টি থাকবে না বোধ হয়, আশ্বিন মাস প'ড়ে গেল।"

সুজিত বলিল, "কাদাটা ভাল ক'রে শুকিয়ে গেলে ঐ কাগমারী বিলটায় একদিন শুটিঙে যেতাম। খুব পাখী আছে নাকি ওখানে।"

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বড় সাপখোপ জায়গাটায়, গেলেও খুব সাবধানে যাবে।"

মমতা বলিল, "বাপ রে বাপ, এই একটা ঘরের মধ্যে ব'সে হাঁপিয়ে মরবার জো হয়েছে আমার। বিকেল অ... এই রকম পরিষ্কার থাকে, আমি ঠিক একটু বেড়িয়ে আসব।"

এই প্রস্তাবই যদি যামিনীর মুখ দিয়া বাহির হইত, তাহা হইলে সুরেশ্বর একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেন। কিন্তু মমতার কোনও অনুরোধ আজ পর্য্যন্ত তিনি ঠেলিতে পারেন নাই। বলিলেন, "তা যেও ঐ পূবদিকের মাঠটায়। বেশ পরিষ্কার; ঝোপঝাপ বেশী নেই, আর লোকজনের বসতিও তত নেই। এক জন ঝি আর এক জন দরোয়ান সঙ্গে নিও।"

কথাবার্ত্তা হইতেছিল সকালে চায়ের টেবিলে। মমতা আর যামিনী সকাল হইতেই চা খাইতেন, সুজিত আর সুরেশ্বরের অনেকটাই দেরী হইত। যামিনী দ্বিতীয় বার আসিয়া আবার চায়ের টেবিলে হাজিরা দিতেন, মমতা কোনও দিন আসিত, কোনও দিন আসিত না।

মমতা বেড়াইতে যাইবার অনুমতি লাভ করিয়াই উঠিয়া গেল। এক জায়গায় কিছুতেই সে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সুজিতেরও বাপমায়ের সান্নিধ্য বেশী প্রিয় ছিল না, সে দ্বিতীয় চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়াই উঠিয়া নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

যামিনীও উঠিবেন উঠিবেন করিতেছেন এমন সময় স্বরেশ্বর বলিলেন, "খুকীর এখনও বিয়ে হয় নি দে'খে প্রজারা বড় অবাক্ হয়েছে। এরকম প্রথা পাড়াগাঁয়ে এখনও চলে নি কি না?"

ইহার উত্তরে কি বলিলে স্বরেশ্বর চটিয়া উঠিবেন না, তাহা ভাব দরকার। কাজেই যামিনী চট করিয়া কিছু উত্তর দিলেন না।

স্বরেশ্বর নিজেই বলিয়া চলিলেন, "মেয়ের বিয়ে এই রকম জায়গায় দিতে পারলে স্ববিধে হয় অনেক। দুষ্ট প্রজা বশে আসে, দু-পয়সা বেশী তাদের কাছ থেকে পাওয়াও যায়। আমার বাবা গল্প করতেন যে মেয়ের বিয়েতে কখনও তাঁদের ঘর থেকে টাকা বার করতে হয় নি, প্রজারাই চালিয়ে দিয়েছে। অবশ্যি কল্‌কাতায় যে রেটে খরচ, এখানে সে রেটে খরচ হয় না।"

যামিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যা না তোমার প্রজাদের অবস্থা, তারা আবার তোমার মেয়ের বিয়ের খরচ দেবে। খেতে না পেয়ে সব শুকিয়ে মরছে।"

স্বরেশ্বর সৌভাগ্যক্রমে একেবারেই চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন না। বলিলেন, "হুঃ ওসব মামুলি বাঁধিগৎ। আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ প্রজা চড়িয়ে খেয়েছে, ওদের আমরা খুব চিনি। যে-বছর মাঠে সোনা ফলে সে-বছরেও ওদের মুখে ঐ বুলি শুনবে। চোখে গামছা না দিয়ে ওরা জমিদারের সামনে আসেই না।"

ঠাকুর আসিয়া কি একটা জিজ্ঞাসা করায় যামিনী বাঁচিয়া গেলেন। প্রতিবাদ স্বরেশ্বর সহ্য করিতে পারেন না, আর এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

ঠাকুরের সমস্যার মীমাংসা করিয়া যামিনী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া

দেখিলেন, মমতা কোথা হইতে একটা চরকা জোগাড় করিয়া সুতা কাটিতে বসিয়া গিয়াছে। সুতা কাটা কোনও জন্মে তাহার অভ্যাস নাই, চরকাও বোধ হয় এই সে প্রথম চোখে দেখিল। কাজেই সুতা যা হইতেছে তাহা বুঝাই যায়। মমতার কিন্তু ধৈর্য্যের অবধি নাই, ছেঁড়া সুতা ক্রমাগত জোড়া লাগাইয়া সে একমনে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যামিনী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি হচ্ছে, মা? চরকা কোথায় পেলে?"

মমতা মুখ তুলিয়া চাহিল। গালের কাছটা তাহার একটু লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "নিধুকে দিয়ে আনিয়েছি, মা। একেবারে অকর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকতে ভাল লাগে না, যদি একটুও সুতো তৈরী করতে পারি, তা বেচে যা দু-এক আনা পাব, তা আমার ইচ্ছামত ত খরচ করতে পারব?"

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা অবশ্যিই পারবে। কিন্তু দু-এক আনা পয়সাও কি আর তুমি ইচ্ছামত খরচ করতে পাও না? আমি ত তোমাকে কিছু বাধা দিই না। তোমার বাবাও তোমাকে কিছু বলেন না।"

মমতা বলিল, "তা জানি মা, কিন্তু টাকা ত সব বাবার। যেভাবে খরচ করলে তিনি রাগারাগি করবেন, সেভাবে খরচের জন্যে তাঁর টাকা নিতে ইচ্ছে করে না।"

যামিনী আন্দাজে বুঝিলেন মেয়ের ব্যথা কোনখানে, বলিলেন, "তা করে না বটে; তবে চরকাই কাট। পাড়াগাঁয়ে টাকা রোজগার করার আর ত কোনও উপায় দেখি না।"

দুপুর বেলা অনেকটাই মমতার চরকা লইয়া কাটিয়া গেল। সুতা হউক বা না-হউক সময় ত কাটিল, সেইটাই বা কি কম লাভ? বিকাল

হইতে-না-হইতে সে চুল বাঁধিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। যামিনীকে বলিল, "তুমি যাবে মা ?"

তিনি গেলে সুরেশ্বর হয়ত চটিয়া উঠিবেন। কিন্তু ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া যামিনীরই বা দিন কাটে কিরূপে ? তিনিও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা চল। দাঁড়াও, আমি গা ধুয়ে আসছি চট ক'রে।"

আধ ঘণ্টা পরেই যামিনী মেয়েকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে ঝি দরোয়ানও চলিল, যদিও কাহারও যাইবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না।

পূর্ব্ব দিকের মাঠটা পতিত জমি, গোচারণের জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়। এদিকে চাষও হয় না, লোকজনের বসতিও নাই। মোটের উপর পরিষ্কার, বেড়াইবার পক্ষেও ভাল। খানিক দূর আসিয়াই মমতা বলিল, "বিষ্টি যদি আর না নামে ত বাঁচা যায়। রোজ তা হ'লে এখানে বেড়াতে আসি।"

যামিনী বলিলেন, "তুমিই আসবার জন্যে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়েছিলে মা, তোমারই এখন একেবারে ভাল লাগছে না।"

মমতা আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল। কেন যে সে আসিতে চাহিয়াছিল, আর কেনই যে তাহার ভাল লাগিতেছে না, তাহা সে মাকে বুঝাইবে কিরূপে ?

খানিক পরে বলিল, "সারাদিন খালি একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে তা ত মনে করি নি ?"

যামিনী বলিলেন, "রোজ বেড়াতে বেরিও বিকেল বেলাটা, তাহ'লে অতটা খারাপ লাগবে না। এদিকে লোকজন নেই, তোমার বাবা আপত্তি করবেন না।"

সঙ্গের ঝি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ উত্তুর দিক্ থেকে কয়েকটি ছোক্‌রা বাবু আসতেছে মা। ফিরে যাবেন নাকি ?"

যামিনী তাকাইয়া দেখিলেন, চার-পাঁচটি যুবক আসিতেছে বটে। হাতে তাহাদের মস্ত মস্ত চটের থলি, এক জনের হাতে মস্ত একটা ঝুড়ি। বুঝিলেন, ইহারা কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবক দলের কেহ হইবে, কোথাও কাজে গিয়াছিল, এখন নিজেদের আড্ডায় ফিরিয়া চলিয়াছে।

মমতা কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ফিরে গিয়ে কি হবে মা ? আমরা যেমন যাচ্ছি যাই না ?"

কলিকাতায় তাহারা পর্দানশীন ভাবে থাকে না, সুতরাং এই কলিকাতার ছেলের দল তাঁহাদের দেখিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। যামিনী বলিলেন, "না ফিরব না, ওরা যাচ্ছে যাক না, তাতে কি ?"

ছেলের দল তখন বেশ খানিকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মমতার বুকের রক্ত উদ্দাম তালে নাচিয়া উঠিল, পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অমরকে সে চিনিতে পারিয়াছে। সেও কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ? মমতার কি তাহাকে না চিনিবার ভান করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত ? না দাঁড়াইয়া কথা বলা উচিত ? তাহার মা কি মনে করিবেন ? ঝি দরোয়ানই বা কি মনে করিবে ?

কিন্তু অমরই তাহার হইয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল। কাছে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনারা এসেছেন কয়েক দিন হ'ল শুনেছি। কিন্তু এত কাজ আমার ঘাড়ে যে সময় ক'রে দেখা করতে পারি নি।"

উত্তেজনায় মমতার সারা দেহ তখন কাঁপিতেছে। সর্ব্বনাশ, সে কি

পড়িয়া যাইবে, নাকি? গলা যেন তাহার বুজি[illegible]য়াছে, সে কথার উত্তর দিবে কি করিয়া?

যামিনী বিস্মিত ভাবে একবার মমতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ছেলেটি মমতাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে বুঝা গেল, কিন্তু মেয়ে অমন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে কেন? কোথায় ইহাদের আলাপ হইল, কেমন করিয়া? একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে খেলিয়া গেল।

মমতাকে একটু আড়াল করিবার জন্য তিনিই অমরের কথার উত্তর দিলেন, যদিও সে তাঁহার অপরিচিত। বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা দিন-চার হ'ল এসেছি, এখনও গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আজ এই প্রথম বাড়ী থেকে বেরলাম।"

মমতা প্রাণপণ বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "মা, ইনি আমাদের ক্লাসের ছায়ার দাদা অমরবাবু।" মায়ের পরিচয়টা আর অমরের কাছে দিবার দরকার হইল না। সে অব[illegible]ত হইয়া যামিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "একদিন আমাদের ক্যাম্পে যা[illegible]বেন, কেমন কাজ করছি সব দেখে আসবেন।"

তিনি ক্যাম্পে গেলেই হইয়াছে আর কি? সুরেশ্বর তাহা হইলে বোধ হয় যামিনীকে আস্ত গিলিয়া খাইবেন। কিন্তু সে কথা ত আর এই ছেলেটির সামনে বলা যায় না? সুতরাং বলিলেন, "চেষ্টা করব যেতে। কাজকর্ম্ম কি রকম চলছে?"

অমর বলিল, "ভালই, তবে আপনাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরও ভাল চলে। এখানকার কর্ম্মচারীরা আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝে না মনে হয়। মনে করে আমরা তাদের কোনও অনিষ্ট করতে এসেছি।"

যামিনী ইহার উত্তরে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কর্ম্মচারী-দের দোষ কি? খোদ কর্ত্তাই ত যত নষ্টের মূল? সচরাচর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার ভাল লাগে না, নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতেই তাঁহার এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু এই পরহিতব্রতী, সবল-দেহ যুবকটিকে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার বেশ ভাল লাগিতেছে। যে-সব মানুষের মধ্যে তাঁহার বাস, তাহারা স্বার্থ ছাড়া জগতের আর কোনও জিনিষ বুঝিতে পারে না। স্বার্থের খাতিরে লোকের গলায় ছুরি দিতেও তাহা-দের আটকায় না। এ ছেলেটি কিন্তু যেন অন্য জগতের মানুষ। তরুণ বয়সে যে দৃষ্টি দিয়া যামিনী জগৎকে দেখিতেন, সেই দৃষ্টির ঘোর এখনও যেন ইহার চোখে লাগিয়া আছে।

বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাদের ব'লে কয়ে দেখব। এ সব ক্ষেত্রে আমাদের কথা ত তত চলে না। ওঁকে আপনারা যদি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন ত হয়ত কিছু কাজ হ'তে পারে।"

মমতা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি বাবাকে আজই বলব।"

অমর তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলবেন নিশ্চয়ই। টাকাকড়িরও আমাদের এখন তত সুবিধে নেই, আরও কিছু হাতে এলে কাজের ক্ষেত্র আরও আমরা বাড়াতে পারি, ছোটখাটো হাসপাতালও একটা খুলতে পারি।"

পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া যামিনী বলিলেন, "এখন আমরা আসি তবে। বৃষ্টি নেমে পড়তে পারে।"

অমর তাঁহাদের নমস্কার করিয়া আবার নিজের সঙ্গীদের লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। যামিনী আর এক পাক ঘুরিয়া মমতাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। সারাপথ মা-মেয়েতে কোনও কথাই হইল না।

২৩

যামিনী বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঝড়ের ইঙ্গিত করিতেছে দেখিয়া চাকরেরা তখন সব ঘরের দরজা জানাল বন্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আলোও সবগুলি জালিয়া রাখিয়াছে সুরেশ্বর সন্ধ্যা হইতেই ঘরে দোর দিয়া একটি পশ্চিমা ভৃত্যকে দিয়া দলাই মলাই করান, ডাক্তার নাকি এই বিধান দিয়াছেন। তাই গৃহিণীর বেড়াইতে যাওয়া, বা আকাশে মেঘের সঞ্চার, কোনওটাই তাঁহার চোখে পড়ে নাই, তাহা না হইলে এতক্ষণে মহা চেঁচামেচি লাগিয়া যাইত।

মমতা ঘরে ঢুকিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া সোজা শুইয়া পড়িল। যামিনী বলিলেন, "কাপড়-চোপড় ছেড়ে শো না? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

মমতা মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহার খানিকটা খারাপই লাগিতেছে। মেয়ের কাছে যামিনীর অনেক কথা জানিবার ছিল, কিন্তু এখনই তাহাকে উত্যক্ত না করিয়া তিনি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। অমরের সঙ্গে হঠাৎ এ ভাবে সাক্ষাৎ হওয়াতে মমতা যে অত্যন্তই বিচলিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেই পারিয়াছিলেন। কারণটাও অনুমানে অনেকটাই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারই মেয়ে ত? অদৃষ্টও যে তাঁহার মত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু যামিনীর মা-ই তাঁহাকে আজীবন তুষানলে দগ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছিলেন, যামিনীকে এখন

ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তিনি কন্যার জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন। হয়ত নিজের ভবিষ্যৎ জীবন আরও কণ্টকাকুল হইয়া উঠিবে, কিন্তু মমতাকেও কি নিজের মত ধনৈশ্বর্য্যের রাক্ষসীর সম্মুখে তিনি বলি দিতে পারিবেন?

মমতা অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়া রহিল। মা নিশ্চয়ই এখন তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। মমতা সব তাঁহাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবে কি? মা হয়ত তাহার রকম সকম দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। সব জানাজানি হইয়া গেলে লোকে তাহাকে কি মনে করিবে? অমরই বা তাহাকে কি মনে করিল? মমতা ত জানে না, অমরের মনের ভাব কি? সবই ত তাহার আন্দাজ। অমরের হৃদয়ে মমতার হয়ত কোনও স্থানই নাই, কিন্তু মমতা যে তাহাকে কি চোখে দেখিয়াছে, তাহা ত সে বোধ হয় প্রকাশই করিয়া ফেলিল? মাগো, এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়?

যামিনী এমন সময় ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া মমতার পাশে আসিয়া বসিলেন। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কিছু ভাল বোধ করছ কি মা?"

মমতা বলিল, "হ্যাঁ মা, এইবার উঠব।"

যমিনী বলিলেন, "থাক, একেবারে খাবার সময় উঠো। ঐ অমর ছেলেটির সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হ'ল?"

মমতা বলিল, "ছায়ার জন্মদিনে যে তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আলাপ হয়েছিল।"

যামিনী বলিলেন, "ও, ঐ এক দিনেরই আলাপ?"

মমতার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে লাগিল। এক দিনের

আলাপে এমন করিয়া আর কেহ কি হৃদয় দান করিয়া বসিয়াছে? মা কি তাহাকে পাগল মনে করিতেছেন? সত্যই ত ক'টা কথাই বা সে অমরের সঙ্গে বলিয়াছে? ছায়ার কাছে গল্প অনেক শুনিয়াছে বটে, কিন্তু সে ত কত লোকেই কত লোক সম্বন্ধে শোনে? কিন্তু মাকে কি সে বুঝাইবে? চোখের দৃষ্টি যে কথা বলে, তাহা কি সে বুঝাইতে পারে? আবার ধীরে ধীরে বলিল, "সেই মিটিঙের দিনও দেখা হয়েছিল।"

যামিনীর কাছে অনেকগুলি জিনিষই পরিষ্কার হইয়া গেল,—মমতা কেনই বা গলার হার খুলিয়া দিল, কেনই বা কলিকাতা ছাড়িয়া এখানে আসিবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইল, তাঁহার সম্মুখে শুইয়া এ যেন মমতা নয়, তাঁহার কন্যা নয়। যামিনীই যেন নিজের হারানো তরুণী-জীবনে ফিরিয়া গিয়াছেন, তিনিই যেন অসহ্য হৃদয়বেদনায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। যাহাকে আর জীবনে কোনও দিন দেখিবেন না, সেই হতভাগ্য বঞ্চিত প্রতাপের মুখ তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। নিজের জীবনের যত জ্বালা, যত ব্যর্থতা, অপমান, সব ত তিনি সেই প্রথম জীবনের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। নারীর জন্মগত একমাত্র অধিকার, সে অধিকার প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার, অন্যের প্রাণঢালা ভালবাসা পাইবার। সেই সত্য তিনি ধনের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও সুখ বা শান্তি দিতে পারে নাই। আজ কি ভগবান্ এই ভাবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুবিধা জুটাইয়া দিলেন? যে-অধিকার হইতে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কন্যার জন্য সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় নিজেকে যদি ভিখারিণীও হইতে হয়, তাহা হইলে

তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি? হয়ত শেষ জীবনে তিনি শান্তি পাইবেন, যদি কন্যাকে তিনি সুখী দেখিয়া যাইতে পারেন।

মমতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কি করে?"

মমতা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বি-এ পাস করেছেন। ওঁর বাবা ল পড়তে বলেছিলেন, কিন্তু উনি দেশের কাজ করতে চান, তাই করছেন।"

যামিনী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, মেয়ে সব খবরই যোগাড় করিয়াছে দেখি। মাত্র একবার দেখা হইলে কি হয়? বন্ধু ছায়ার সাহায্যে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হইয়া গিয়াছে। মমতা যামিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু জমিদার সুরেশ্বরেরও মেয়ে। তাঁহার মত একেবারে সংসার-জ্ঞানহীনা হইতে পারে না।

কিন্তু এখন আর বেশী কথা বলাইয়া মমতাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিতে তিনি চাহিলেন না। ঘরের আলোটা যাহাতে তাহার চোখে না লাগে এমন ভাবে দরজার আড়ালে সরাইয়া দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সুবিধামত অমরকে ডাকিয়া ভাল করিয়া আলাপ করিতে হইবে। কিন্তু সুরেশ্বর আসিয়াই ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাই ত বিপদ্।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় আসিয়া পড়িল। এখানে সন্ধ্যারাত্রির পরই চারিদিক্ এমন গভীর নীরবতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে ঘুমাইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুর কথা মনেই আসে না। চাকরবাকর কলিকাতায় রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত হৈ চৈ করে, এখানে কিন্তু সাতটার মধ্যে সকলকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভাগ্যক্রমে সুরেশ্বরের সকাল সকাল খাওয়াই নিয়ম, তাই তাহারা খনিকটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

মমতা সকলের সঙ্গে খাইতে উঠিয়া আসিল। তবে খাইল না প্রায় কিছুই। কথাবার্ত্তাও বিশেষ কিছু বলিল না। সুরেশ্বর খাইতে খাইতে বলিলেন, "কালই সকালে বেরুব ভাবছি। ও মেঘ কিছু না, দেখ্‌লে ত? একটু জোরে হাওয়া দিতেই উবে গেল। সকালে উঠে কাপড়-চোপড় তিন দিনের মত গুছিয়ে নিতে হবে। রবিবারেই ফিরে আসব। খোকা যেতে চাস নাকি সঙ্গে?"

সুজিত বলিল, "তা যেতে পারি।" বেড়াতেই যখন সে আসিয়াছে তখন যতটা বেড়ানো যায় ততই ভাল। আর প্রজারাও যুবরাজকে চিনিয়া রাখুক, পরে ইহারই হুকুম মত ত তাহাদিগকে চলিতে হইবে?

মমতা হঠাৎ বলিল, "আমরা এখানে আর সব জড়িয়ে কত দিন থাকব বাবা?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "এক মাসের বেশী ত নয়ই। তোমার ও খোকার সব পড়া কামাই হচ্ছে। নিতান্ত দায়ে প'ড়ে আসা, না হলে এই বাজে সময়ে কেউ আসে? ওদিকে দেবেশেরও বিলেত যাবার সময় হয়ে এল, গিয়ে তাদের সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে।"

মমতার মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য সেটা তাহার মা ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিল না। গলা দিয়া কোনও খাদ্যই আর তাহার পার হইল না।

সুজিত সুরেশ্বরের তখনও খাওয়া শেষ হয় নাই। কাজেই টেবিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। মিনিট দশ পরে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখানকার প্রজাদের অবস্থা কি রকম দেখলে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "মন্দ কি? যেমন থাকে ছোটলোকের অবস্থা তেমনই আছে।"

মমতা যেন আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "এদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি করা একান্ত দরকার। কত দেশে কত কিছু করা হচ্ছে গরিবদের জন্যে, আমাদের দেশেই কেন হবে না?"

সুরেশ্বর হঠাৎ সাধু সাজিয়া বলিলেন, "সে সব দেশে কত কোটীপতি, লাখপতি আছে, তারা সখ ক'রে পরের উপকার ক'রে বেড়ায়, আমাদের দেশে সকলেরই প্রায় এক দশা, কে কাকে দেখে?"

মমতার আজ সাহসের সীমা ছিল না। সে বলিল, "তা কি ঠিক বাবা? আমাদের অবস্থা আর ঐ যে গ্রামের মানুষগুলো না খেয়ে, কাপড় না প'রে, মাঠে ঘাটে প'ড়ে মরছে, তাদের অবস্থা এক রকমই?"

সুরেশ্বর এবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, "পৃথিবীর সব মানুষ ত ঠিক এক অবস্থায় থাকতে পারে না। উঁচু নীচু থাকবেই, সমাজের সংসারের কল্যাণের জন্যেই এ নিয়ম। সবাই সমান হ'লে সংসার চলে না। ছোট একটা পরিবারেও ত দেখ যে কেউ উপরে কেউ নীচে।"

মমতা বাপের যুক্তি মানিল না, বলিল, "তাই ব'লে মানুষ হয়ে যারা জন্মেছে, তারা মানুষের মত থাকতে পারবে না? ওদের অবস্থা ত শেয়াল-কুকুরেরও অধম। ওদের জন্যে নিশ্চয় কিছু করা উচিত।"

যামিনী ক্রমেই তর্কের গতিক দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মমতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে এবং সুরেশ্বরও রাগিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইতে পারে, তাহাতে মমতার কিছু লাভ হইবে না। সুরেশ্বরেরও শরীর সুস্থ নয়, বেশী রাগারাগি করিলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাদের থামানো যায় কিরূপে?

সুরেশ্বরের কিন্তু মেয়ের সঙ্গে তর্ক করিবার তত ইচ্ছা ছিল না। যাহা নিজে মিথ্যা বলিয়া জানেন, ভাষার জোরে তাহাকে সত্য বলিয়া

প্রমাণ করার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল না। স্ত্রী হইলে না-হয় চীৎকার করিয়া, বকিয়া, থামাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু মেয়ের সঙ্গে ঠিক সে-রকম ব্যবহার করা চলে না।

সুতরাং তিনি অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওসব চেষ্টা করতে গেলে অনেক ভেবে করতে হয়। হট্ ক'রে কিছু করতে গেলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি।"

পাছে মমতা আরও কথা বাড়ায়, এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মমতা খানিকক্ষণ অস্বাভাবিক রকম মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর সেও টেবিল ছাড়িয়া শুইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে আর কাহারও সমাজতত্ত্ব আলোচনার সময় রহিল না। সুরেশ্বর দুই দিনের জন্যও কোথায়ও গেলে এমন পরিমাণ সোরগোল বাধিয়া যায় যে লোকে মনে করে সেনানী পল্টন এক দেশ হইতে আর এক দেশে চলিয়াছে। ভোর হইতে বেলা ন'টা-দশটা পর্য্যন্ত কাহারও আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। অবশেষে সুরেশ্বর খাইয়া-দাইয়া যখন হাতীতে চড়িলেন, তখন বাড়ীর লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মমতার নাওয়া-খাওয়া কিছুতেই আজ আর মন নাই। সে কেবল অস্থির ভাবে ঘর আর বাহির করিয়া বেড়াইতেছে। যামিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নে, শেষে কি একটা অসুখ-বিসুখ বাধাবি?

একজন ঝি মমতার চুলে তেল দিবার জন্য বাটী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এখনও সব রান্না হয় নি, এই ত সবে হাট থেকে আনাজপাতি নিয়ে এল।"

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, তাহারই উপর তিন-চারখানি গ্রামের নির্ভর। হাটের দিন ছাড়া অন্য দিনে কোথাও কিছু পাইবার উপায় নাই। যামিনীদের সংসারে অবশ্য এসব অসুবিধা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু গ্রামবাসীরা এ দুঃখটা বেশ পূরাপূরি ভোগ করে।

যামিনী বলিলেন, "তা হোক, ও স্নান ক'রে আসুক। ততক্ষণে সব রান্না হয়ে যাবে।" বলিয়া তিনি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

দুইজন চাকর তখন রান্নাঘরের প্রশস্ত রোয়াকের উপর ঝুড়ি হইতে চাল, চিঁড়া, শাক-তরকারি সব নামাইয়া রাখিতেছে। ঠাকুর একটা রুইমাছ হাতে করিয়া আন্দাজ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে সেটার ওজন কত। যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর চেয়ে ছোট মাছ ছিল না? এটা ত অন্ততঃ চার পাঁচ সের হবে। এত মাছ কে খাবে এক দিনে?"

চাকর হারু উত্তর দিল, "কোথায় মাছ মা-ঠাকরুণ? মাত্তর চাট্টিখানিক জিনিষ এসেছে হাটে। জলে সব ক্ষেতখামার ভেসে গেল মানুষের, কেই বা জিনিষ আনছে আর কেইবা কিনছে? মাছ এই রকম দুটো এসেছিল, একটা আমি নিলাম, আর একটা ঐ ডোমপাড়ার ছোক্‌রা বাবুরা নিতে যাচ্ছিল তা নায়েববাবু হাঁ হাঁ ক'রে এসে জেলের হাত থেকে মাছ কেড়ে নিলেন। বাবুরা আজ ফেনভাত খাবেন এখন—বাবুমশায় নাকি হাটের সব লোককে বারণ ক'রে দিয়েছেন তাদের জিনিষ বেচতে। প্রজা ক্ষ্যাপানোর মজা বুঝুন এখন কলকাতার বাবুরা।"

যামিনী ধমক দিয়া বলিলেন, "বাজে বকতে হবে না, যা করছিস্ তা কর্।" স্বামীর কীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহার ত চক্ষু স্থির হইবার যোগাড় হইয়াছিল।

পিছন হইতে হঠাৎ ধরাগলায় মমতা বলিয়া উঠিল, "দূর ক'রে ফে'লে দাও ও মাছ মা, চাই না আমরা খেতে। আমরাও নুনভাত খাব।"

ঝি-চাকর সকলে হাঁ করিয়া তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া যামিনী তাড়াতাড়ি মেয়েকে টানিয়া লইয়া খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঝিটা পিছন পিছন আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "যা, জলটল ঠিক ক'রে দে, খুকীর কাপড় তোয়ালে সব গুছিয়ে রেখে আয়।"

মমতার দুই চোখ তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। ঠোঁট কাঁপিতেছে; পাছে মায়ের কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। যামিনী মেয়ের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "অল্পেতে অত ঘাবড়ে যেয়ো না মা, মেয়েমানুষের জীবন ভরা কত পরীক্ষা। এত দিন মায়ের কোলের শিশু ছিলে, কিছু বোঝ নি, এখন ক্রমে অনেক দেখতে হবে, অনেক বুঝতে, সহ্য করতে হবে।"

মমতা বলিল, "আমি পারি না মা! এত অন্যায়, এত [illegible]চার আমার সহ্য হয় না। আমি সত্যি আজ নুনভাত ছাড়া কিছু খাব না।"

যামিনী বলিলেন, "আচ্ছা, আগে স্নান ত ক'রে এস, [illegible]পর দেখা যাবে। ওরা এক দিন নুনভাত খেলেও মারা যাবে না। মা[illegible] একেবারে না খেয়েও অনেক দিন বেঁচে থাকে।"

মমতা স্নান করিতে চলিয়া গেল। যামিনী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে কি করা যায়। সুরেশ্বর ক্রমেই পাগলের মত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য যামিনী ত প্রায় নীরবে তাঁহার বহু উৎপাত অনেক বৎসর ধরিয়াই সহ্য করিয়া আসিতেছেন, এটাও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু মমতা ত সহ্য করিবে না? ঝোঁকের মাথায় এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে, যাতে বাপে মেয়েতে চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে। সে সংসারজ্ঞানহীনা বালিকা মাত্র, সুরেশ্বরের রোষানল হইতে যামিনী কেমন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন?

মমতা স্নান করিয়া আসিলে পর তিনি নিজে স্নান করিয়া আসিলেন। দুই জনে খাইতে বসিলেন, কিন্তু খাওয়া কাহারও হইল না। মমতা নুন মাখিয়া দুই গ্রাস ভাত মুখে দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। মেয়ের রকম দেখিয়া যামিনীও নামে মাত্র আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৃত্যের দল গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মাছ তরকারি যেমন সব আনিয়া রাখিয়াছিল, তেমনই সব উঠাইয়া লইয়া গেল। সব-কিছু তাহাদেরই ভোগে আসিবে, ইহাতে তাহাদের মনে মনে যে আনন্দ না হইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আনা এত বড় তাজা মাছটা কি কারণে গৃহিণী এবং দিদিমণি দুজনেরই অপছন্দ হইয়া গেল, তাহা তাহারা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিল না।

যামিনী দুপুরে ঘণ্টাখানিক শুইয়া থাকেন, রোজই যে ঘুম হয় তাহা নয়, তবে বিশ্রাম করেন। মমতার কলেজে যাওয়ার অভ্যাস, দুপুরে সে শুইতে পারে না, বই হাতে করিয়া, শুইয়া বসিয়া, ঘোরাঘুরি করিয়াই বেলাটা কাটাইয়া দেয়। ঝি-চাকরের দল ঘণ্টাখানিক ধরিয়া কাছারীর উদ্যানসংলগ্ন বড় পুকুরটায় স্নান করে, তাহার পর পেট পুরিয়া খাইয়া, ঘুমাইয়া বাকী দুপুরটা কাটাইয়া দেয়।

যামিনী নিয়ম মত আজও একখানা বই হাতে করিয়া শুইয়াছিলেন। খানিক পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ একটা গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। নিধু ঝি পাশে দাঁড়াইয়া বক্‌বক্‌ করিতেছে, তাহার গোটাকয়েক কথা কানে যাইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিস্ কি তুই? পাগল হয়েছিস্?"

নিধুর তখন প্রায় চোখের জল আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্রন্দনবিকৃত নাকী সুরে বলিল, "পাগল কেনে হব মা? পেত্যয় না যায়, আপনি উঠে

দেখুন। দিদিমণি দু-বেলার যত মাছ-তরকারি সব ঢেলে নিয়ে বাগ্‌দী বৌয়ের সঙ্গে কোথা চ'লে গিয়েছেন।"

যামিনীর তখন আতঙ্কে গলা শুকাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে কন্যার সাহসে একটু যে গর্ব্বের সঞ্চার হয় নাই তাহাও নয়। এই মেয়ে পারিবে নিজের স্বত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে।

পায়ে চটি পরিয়া, একটা ছাতা হাতে করিয়া যামিনী যেমন বেশে ছিলেন, তেমনি অবস্থায়ই বাহির হইয়া পড়িলেন। নিধুকে বলিলেন, "তুই আয় আমার সঙ্গে।"

মমতা যে কোথায় গিয়াছে তাহা আর তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইল না। নিধু চোখ মুছিতে মুছিতে তাঁহার পিছন পিছন চলিল।

হাড়িপাড়ার কাছাকাছি আসিতেই দেখিতে পাইলেন, দূরে মমতা আসিতেছে। তাহার পিছনে বাগ্‌দী-বৌ, সে কাছারী-বাড়ীর গোয়ালে কাজ করে। জমিদার-কন্যার হুকুম অমান্য করিতে সে সাহস করে নাই, প্রকাণ্ড পিতলের গামলা ভরিয়া মাছ-তরকারি সে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া মমতা বলিল, "বাবা আমায় যা বলেন বলুন মা, তুমি আমাকে আড়াল করতে যেও না।"

যামিনীর মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা সে-সব হবে এখন, তুমি বাড়ী চল ত।"

২৪

বাড়ীতে পৌঁছিয়া মা-মেয়েতে আর কোনও কথা হইল না। মমতা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, উত্তেজনার প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়া যাওয়ার পর তাহার ঝি-চাকরদের কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাহারা এ ব্যাপারটা সহজে ভুলিবে না। কোথায় এক-এক জন আধ সের করিয়া মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহার বদলে কিনা শুধু বেগুনপোড়া দিয়া ভাত খাইতে হইল? এ দুঃখ কি ভুলিবার?

মমতা মাছ-তরকারি লইয়া যখন ছেলেদের আড্ডায় উপস্থিত হইল, তখন বেশীর ভাগ ছেলেই স্নান করিতে গিয়াছিল, শুধু দুই জন পাহারায় ছিল। দুইটিই মমতার অপরিচিত, মমতাকেও তাহারা বোধ হয় চেনে না। বক দুই জন অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া মতা জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমরবাবু কি খানে নেই? আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

একজন উত্তর দিল, "তিনি স্নান করতে গিয়েছেন, এখনই আসবেন। াপনি বসুন।" আর একজন তাড়াতাড়ি চালাঘরের ভিতর হইতে কটা মোড়া বাহির করিয়া আনিল।

মমতাকে সৌভাগ্যক্রমে বেশীক্ষণ বসিতে হইল না। মিনিট পাঁচের

ভিতরেই দেখা গেল যে অমরেন্দ্র স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সে একলা নয়, সঙ্গে আরও কয়েক জন যুবক আছে।

মমতাকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল। মমতা একবার তাহার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, অমরের চোখের দৃষ্টিতে শুধু বিস্ময় নয়, আরও কিছু আছে। বুঝিল, সে ভুল করে নাই।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "এত রোদে এত দূর হেঁটে এসেছেন? আমাকে ডেকে পাঠালে ত আমিই যেতাম।"

মমতা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনাকে ডাকব কি ক'রে? আমার বাবা যা ব্যবহার করেছেন আপনাদের সঙ্গে, তাতে আমি আর মা বড় লজ্জা পেয়েছি। আজ নাকি হাটে আপনারা কিছু জিনিষ কিনতে পান নি?"

অমরের সঙ্গীরাও অত্যন্ত অবাক্ হইয়া খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের চোখের সম্মুখে মমতাকে বসাইয়া রাখিতে অমরেরও অস্বস্তি লাগিতেছিল, কিন্তু উপায়ই বা কি? এটা ক্যাম্প্ মাত্র, অমরের বাড়ী নয় যে সে নিজের ইচ্ছা মত ব্যবস্থা করিবে।

মমতার কথার উত্তরে সে বলিল, "তা পাই নি বটে, তবে তাতে আমাদের এমন কিছু অসুবিধা হয় নি। চাল ত আমাদের মজুতই আছে? আর এখানে ত কষ্ট করতেই আসা।"

মমতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কিছু মাছ আর তরকারি এনেছি, আপনারা খাবেন। কালও পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করব।"

অমর মুগ্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ মমতার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মা পাঠিয়েছেন?"

মমতার গলা যেন বুজিয়া আসিতেছিল। অমর নিশ্চয়ই তাহাকে

অসম্ভব রকম বেহায়া মনে করিতেছে। কিন্তু উপায় কি? নিজের কৃ
কর্ম্মের দায় মমতাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের উপর তা
চাপাইবার ইচ্ছা তাহার নাই।

গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, "না, আমিই এনেছি, মা জানেন ন
গিয়ে মাকে বলব।" আর তাহার দাঁড়াইতে ভরসা হইল ন
বাগদীবৌকে তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া সে চলিতে আর
করিল।

অমর তাহার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহ
পর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আমি তা হ'লে এ
আর এগোব না, ওরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে। বিকেলে য
একবার।"

মমতা কোনও মতে তাহার নমস্কারের উত্তরে প্রতি-নমস্কার করি
অগ্রসর হইয়া চলিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইবার একটা উগ্র ইচ্ছাে
প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। প
যামিনীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

যামিনী সারা দুপুর কত যে চিন্তা করিলেন তাহার ঠিক ঠিকানা নাই
মেয়েকে অমরের হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহার অনিচ্ছা নাই! সে ভ
ঘরের ছেলে, সুস্থ সবল, লেখাপড়াও শিখিয়াছে। রোজগারের চেষ্টায়
ঘুরিয়া যখন এমন করিয়া দেশের কাজে লাগিতে পারিয়াছে, তখন ঘ
হয়ত মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে। তাই ঢের।

কিন্তু অমরের মন তিনি জানিবেন কিরূপে? মমতা যে তাহা
হৃদয়দান করিয়া বসিয়া আছে, তাহা কি সে জানে? জানিলে
নিজের মনে তাহার কি কোনও প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে? সুরেশ্বর প্র

থাকিতে এ বিবাহে মত দিবেন না, তাঁহার শত্রুতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও কি সে আগ্রহ করিয়া মমতাকে গ্রহণ করিবে? যে-আশায় তিনি দরিদ্রের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহার পূর্ণ হইবে ত? ইহার চেয়ে শতগুণ বেশী দরিদ্র প্রতাপকে এক দিন যামিনী নিজে আকুল আগ্রহে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেও প্রতাপের প্রাণঢালা ভালবাসার গুণেই। অতখানি ভালবাসা কি অমর তাঁহার কন্যাকে দিতে পারিবে?

কে এ কথার উত্তর দিবে? মমতা নিজে কিছু জানে না। যামিনীকেই সন্ধান লইতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সুরেশ্বর এখানে নাই, না হইলে মমতার কাণ্ড দেখিয়া কি প্রলয় যে তিনি বাধাইয়া বসিতেন, তাহার ঠিকানা নাই। যামিনীকে এই দুই-তিন দিনের অবসরে মমতার সমস্ত জীবনের আর নিজের অবশিষ্ট জীবনেরও ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। মমতার বিবাহ হইয়া গেলে সুরেশ্বরের গৃহে যামিনীর আর স্থান হইবে না, তাহা এক রকম ধরিয়া লওয়া যায়।

রোদে পড়িতে আরম্ভ করিল। নিজেই বেড়াইবার ছলে বাহির হইয়া হাড়িপাড়ার দিকে যাইবেন, না দরোয়ানকে দিয়া অমরকেই ডাকাইয়া পাঠাইবেন, যামিনী তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় একজন চাকর আসিয়া খবর দিল যে কলিকাতার সেই ছোকরাবাবুদের দলের এক জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

যামিনী বিস্মিত হইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। অমরই দাঁড়াইয়া আছে। যামিনীকে সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। যামিনী বলিলেন, "ও আপনি? ওঁর কাছে কি এসেছিলেন? উনি ত এখানে নেই?"

অমর বলিল, "না মা, আমি আপনারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সুজিতের ঘরটা খালি ছিল, যামিনী অমরকে লইয়া সেখানেই বসাইলেন। চাকরদের চায়ের যোগাড় করিতে বলিয়া দিলেন।

অমর বলিল, "আপনার মেয়ে আজ আমাদের অনেক মাছ-তরকারি সব দিয়ে এসেছেন। কালও পাঠাবেন বলছিলেন। কিন্তু এ নিয়ে যদি সুরেশ্বরবাবুর সঙ্গে রাগারাগি বেধে যায়, সেটা বড় খারাপ হবে। আমাদের চ'লেই যাবে এক রকম ক'রে, এতটুকু অসুবিধাতে আমরা কাজ ফে'লে পালাব না। আপনারা আমাদের জন্যে ভাববেন না।"

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি না ভাবলেও মমতা ভাববেই। তার এই গরিব উৎপীড়িত প্রজাদের উপর বড় মায়া। উনি তাদের জন্যে কিছু করছেন না, এতে সে বড় দুঃখ পাচ্ছে। আপনারা তাদের জন্যে এত করছেন, এ জন্যে আপনাদের প্রতিও তার খুব শ্রদ্ধা। আপনাদের কষ্ট সে দেখতে পারে না।"

অমর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবু বারণই করবেন। বেশী কিছু গণ্ডগোল এ নিয়ে হ'লে, বড় দুঃখের বিষয় হবে, না কি?"

যামিনী বলিলেন, "সংসারে থাকলে সব গণ্ডগোল ত এড়িয়ে চলা যায় না? আপনাকে ত আমি সবে চিনলাম, কিন্তু তবু অনেক দিনের পরিচিতই মনে হচ্ছে।"

অমর বলিল, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না, মা।"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "তাহা না-হয় নাই বললাম। মমতাকে আমি বললে ত শুনবে না সে, তুমিই বুঝিয়ে বল। তার জন্যে আমার ভাবনার অন্ত নেই। ওকে শেষ অবধি একটা গোলমাল থেকে বাঁচাতে

পারব কিনা জানি না। কিন্তু ভয় দেখিয়ে ওকে কোনও লাভ নেই, ভয়ে ও দমে না।"

অমর বলিল, "না-হয় অন্য রকমে আমাদের সাহায্য করুন তিনি। খোলাখুলি বাপের বিরুদ্ধাচরণ নাই করলেন ?"

যামিনী বলিলেন, "বাবা, তোমাকে তা হ'লে সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে হয়। ওঁর কেন জানি না ধারণা হয়েছে, তোমরা এখানে এসে প্রজাদের তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছ, খাজনা দিতে বারণ করছ, এই জন্যে তাঁর ভয়ানক রাগ তোমাদের উপর। যে-কোনও উপায়ে তোমাদের এখান থেকে তাড়াতে তিনি একেবারে উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। এখন যে-ভাবেই মমতা তোমাদের সাহায্য করতে যাবে, তাতেই ওঁর বিষদৃষ্টিতে পড়বে। আমি যে কি করব, তা ভেবেও পাচ্ছি না।"

অমর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি কি কিছু করতে পারি ?"

যামিনী বলিলেন, "তোমাকে হয়ত অনেক কিছু করতে হবে। সে আমার সময় মত বলব। আজ মমতাকে একটু ব'লে যাও, সে যেন এ নিয়ে জেদ্ ক'রে বাড়াবাড়ি না করে। উনি অতি রাগী মানুষ, রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকে না।"

চাকর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "চা কি এই ঘরে দেব মা ?"

যামিনী বলিলেন, "না, খাবার-ঘরেই দাও, আর দিদিমণিকে খবর দাও।"

মমতা মায়ের ডাকে উঠিয়া মুখ ধুইয়া, খাইবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে ঢুকিয়াই সে দাঁড়াইয়া গেল, পা যেন তাহার আর চলিতে চায় না।

অমর বিকালে আসিবে বলিয়াছিল, কিন্তু সত্যই যে সে আসিবে, তাহা মমতা আশা করে নাই।

যামিনী বলিলেন, "আয়, চা খেয়ে নে। সারাটা দিন ত তোর উপোস ক'রেই কাটল।"

মমতা আস্তে আস্তে আসিয়া চেয়ারে বসিল। অমর একবার তাহার দিকে তাকাইয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহাও যেন অন্য দিকে চাহিয়া। এই মেয়েটি কেন এমন করিয়া তাহাদের জন্য বিপদ্ বরণ করিতেছে? শুধু প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই কি?

যামিনী প্লেটে করিয়া খাবার সাজাইয়া অমরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় চা দি? চা খাও ত?"

অমর বলিল, "চা খাই বটে, তবে এখানে আসার পর বিশেষ আর জোটে না। এত খাবার আমায় কেন দিচ্ছেন? আজ দুপুরে একটু অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেছে, এখনই আর খেতে পারব না।"

যামিনী মমতাকে খাবার দিতে দিতে বলিলেন, "কি আর বেশী, সামান্যই ত দিয়েছি।"

অমর প্লেটটা টানিয়া নিজের সামনে রাখিল বটে, কিন্তু এখনই খাইতে আরম্ভ করিল না। মমতার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন, আমাদের কষ্ট করা অভ্যাস আছে, খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা আমরা স্বচ্ছন্দে সয়ে যেতে পারব। কিন্তু এ নিয়ে যদি আপনাকে কোনও রকম শক্ত কথা শুনতে হয়, তা হ'লে সেটা সহ্য করা ঢের বেশী শক্ত হবে। আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের জন্যে বিন্দুমাত্রও ভাববেন না।"

যামিনী দেখিলেন তাঁহার মেয়ের চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িবার যোগাড় হইয়াছে। কিন্তু যেমন করিয়া হউক মমতার কথা এখন মমতাকেই

বলিতে হইবে। যামিনী ত তাহার হইয়া সকল জায়গায়ই কথা বলিতে পারেন না?

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াই মমতা বলিল, "আমি যা উচিত মনে করি, তা একটু শক্ত কথার ভয়ে করব না কেন? আমি কি এতই অপদার্থ?"

অমর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি একেবারেই তা মনে ক'রে কথাটা বলি নি। কিন্তু আপনাকে কোনও ভাবে আমাদের জন্যে দুঃখ পেতে হচ্ছে, এটা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই বলছি।"

যামিনী একটা ছুতা করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। ইহাদের যাহা কিছু বলিবার আছে, বলিতে দেওয়া ভাল। তিনি থাকিলে মিথ্যা সঙ্কোচে হয়ত তাহারা বাধা পাইবে।

মমতা হয়ত মায়ের চলিয়া যাওয়ার অর্থ বুঝিতে পারিল। এবার অমরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনাদের কষ্ট সহ্য করতে দেওয়াও যে আমার পক্ষে ততখানিই শক্ত।"

অমর ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। বলিবার কথা ত তাহার জিহ্বায় ভীড় করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সবই কি বলা যায়? মমতা কি করুণা করিয়াই এতটা করিতেছে, না আরও কিছু আছে ইহার মধ্যে?

দুই জনের নীরবতা ক্রমে দু-জনেরই পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। মমতা ভাবিল, মা ফিরিয়া আসিলে বাঁচা যায়। অমর ভাবিতে লাগিল উঠিয়া পড়িবে কিনা, কিন্তু চলিয়া যাইতেও যে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

অবশেষে বলিল, "আমার অনুরোধ ব'লেই কিছু যদি না করেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই আপনি তাই চান?"

অমর বলিল, "তাই চাই। আপনি যদি স্বাধীন হতেন তা হ'লে

আমাদের কাজে আপনার সাহায্য পেলে যত আনন্দ আমার হ'ত, তা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আপনার বাবা আপনার অভিভাবক এখনও, তাঁর বিরুদ্ধে গেলে অনেক কষ্ট পেতে হবে। সেটা আমি চাই না।"

মমতা কথার উত্তর দিল না। অমর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, মমতার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার যাতে অশান্তি না হয়, তারই জন্যে একথা আমি বলছি।"

মমতা গাঢ়স্বরে বলিল, "আপনাদের কোনও উপায়েই যে আমি সাহায্য করতে পারব না, এর চেয়ে বড় অশান্তি আমার আর কিছুতেই হবে না।"

অমর বলিল, "তা হলে আপনার যা করতে ইচ্ছা হলে তাই করবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই।"

যামিনী এই সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। অমর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনার মেয়েকে আমি বোঝাতে পারলাম না। তাঁকে আপনিও আর বাধা দেবেন না। কিন্তু আমাকে ডাকবেন, যখনই আপনার দরকার হবে। প্রাণ দিয়েও যদি কোনও সাহায্য আপনাদের করতে পারি ত আমি করব।" নত হইয়া যামিনীকে প্রণাম করিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

যামিনী বলিলেন, "দেখলে ছেলের রকম? একটু কিছু মুখে না দিয়েই চ'লে গেল!"

মমতাও না খাইয়া টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। দুই চোখের জল গোপন করিবার জন্যই যেন ছাদে পলায়ন করিল।

পর দিন সকালে যামিনীই লোক দিয়া অমরদের ক্যাম্পে তরিতরকারী

পাঠাইয়া দিলেন। সুরেশ্বর যদি জানিতে পারেন যে এ ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাহা হইলে কন্যাকে বাদ দিয়া স্ত্রীর শাস্তিবিধান করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। ইহাই তাঁহার চিরদিনের নিয়ম। মমতা সারাটা দিন তাঁহাকে এড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

কর্ম্মচারীর দল গৃহিণী ও জমিদার-দুহিতার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বাংলা দেশের মেয়ের এত বুকের পাটা! এত সাহস যে তাহাদের হইতে পারে, তাহাই এ মানুষগুলির জানা ছিল না। খুব পল্লবিত ভাবে সকল সংবাদ বহন করিয়া, শীঘ্রই একখানা পত্র সুরেশ্বরের ঠিকানায় চলিয়া গেল।

সুরেশ্বর ত রাগে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেলেন। অপরাধিনীরা সামনে থাকিলে তখনই একটা খুনোখুনি কাণ্ড হইয়া যাইত। কাছে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই বকিয়া, গাল দিয়া, এবং চাকর-বাকরকে চড় লাথি মারিয়া তিনি গায়ের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া বলিলেন, "আপনি যদি এত বাড়াবাড়ি করেন, তা হ'লে কন্সিকোয়েন্সের জন্যে আমি দায়ী হব না।"

সুরেশ্বর পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, দে'খে তার পর কথা বল," বলিয়া চিঠিখানা তাঁহার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

ডাক্তার চিঠিখানা পড়িয়া, মুড়িয়া আবার খামের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তাঁরা যদি আপনার অমতে কিছু একটু ক'রেই থাকেন, ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেই হবে। এত উত্তেজিত হবার কি হয়েছে?"

াগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন।
ম কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের আধিক্য হওয়াতেই না স্ত্রীলোকদের
বাড়িয়া গিয়াছে ?

ফিরিয়া যাইবেন, না যে-কাজে আসিয়াছেন তাহা সারিয়া
হা ভাবিয়া স্থির করিতেই তাঁহার সারা দুপুর কাটিয়া গেল।
জ সারিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এখানে তাঁহার
জারা কিছু ঢিট্ হইয়াছে বোধ হইতেছিল। হঠাৎ চলিয়া
ও হইতে পারে।

ক যথাসম্ভব কড়া করিয়া তিনি একখানা চিঠি লিখিয়া
ফিরিয়া গিয়া কন্যা এবং স্ত্রী কাহাকেও যে তিনি রেয়াৎ
তাহা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন। অবিলম্বে কলিকাতায়
ধীনচেতা কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ
রবেন। দেবেশ যে বিলাত যাইবার আগেই
াজী, তাহা পূর্ব্বে তিনি স্ত্রীকে জানান নাই,
।

না আসিয়া পৌঁছিল যামিনী যখন স্নান করিতে যাইতেছেন।
মানসূচক ভাষায় একবার তাঁহার মুখটা লাল হইয়া উঠিল,
চিঠিখানা দেরাজে বন্ধ করিয়া, তিনি যেমন স্নান করিতে
ন, তেমনই চলিয়া গেলেন।

ম স্নানাহার হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন। তাহার
শুইবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া
লিয়ে দেখ।"

িয়া মমতার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল, দীপ্ত চোখে

মায়ের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "বাবা যদি আমাকে
তা হ'লেও দেবেশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারবেন ?"

যামিনী বলিলেন, "তা পারবেন না জানি, কিন্তু উ
করবেন। একটা উপায় আছে, যদি রাজি হ'স্।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা ?"

যামিনী বলিলেন, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে কালই আ
তোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। তুই রাজী আছিস্ ?"

মমতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু
হবেন ?"

যামিনী বলিলেন, "হবে বলেই ত মনে হয়। সেটা
জেনে নিচ্ছি। কিন্তু এটা জেন, ধনী বাপের মেয়ে হ
সুখ-সুবিধা সব থেকে তুমি চিরদিনের মত বঞ্চিত হবে।
ী, কোনও দিন এ ব্যাপার ভুলবেন ব'লে মনে হয় না।

মমতা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি সে-সব সুখ-
চাই না মা। বাবা অন্যায় ক'রে রাগ করেন ত কি করব?
তোমার উপর বড় অত্যাচার করবেন মা।"

যামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা করেন ক
আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তোমাকে যদি যথার্থই সুখ
সব আমার সইবে। কিন্তু খুব ভাল ক'রে বুঝে দেখ
ভালবাসা ছাড়া এ বিয়েতে আর কিছু তুমি পাবে না।"

মমতা বলিল, "সেই ঢের মা। তার চেয়ে বেশী আ
বা পাবার ?"

সন্ধ্যার সময় বাগ্দী-বৌয়ের হাতে একটা চিঠি দিয়া যা